প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক
প্রকাশন বিভাগ
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা.) লি.
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লি
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
শ্রী গোপালচন্দ্র দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫/১এ কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

মা বাবার

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম সংস্করণে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের

ভূমিকা

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নমুনা বলিয়া চর্যাপদগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। এইজন্য এই পদগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক পণ্ডিতই এ-বিষয়ে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দে, এম্. এ. মহাশয় পূর্বসূরিগণকে অনুসরণ করিয়া এই বিষয়ে নূতন করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার ভিতরে তিনি চর্যাপদের ভাষা, দার্শনিকতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, সাহিত্যিক মূল্য সব দিক হইতেই একটি সর্বাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থখানি হইতে ছাত্র-সমাজ এবং সাধারণ পাঠক-সমাজ চর্যাপদগুলি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করিতে পারিবেন। লেখক নিজে যাহা বুঝিয়াছেন তাহাকে যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের দ্বারা কোথাও বিষয়বস্তুকে আরও জটিল করিয়া তোলেন নাই। বইখানি ছাত্র-সমাজে এবং সাধারণ পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সংকেত-বিবৃতি

অধি—অধিকরণ কারক
অপ—অপভ্রংশ
অসমা—অসমাপিকা
তু°—তুলনীয়
দ্র. দ্রষ্টব্য
নী. সেন—নীলরতন সেন
পুং—পুংলিঙ্গ
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ
সু. সেন—সুকুমার সেন

Ety. Dic.—Etymological Dictionary of Bengali
J D L.—Journal of the Department of Letters
ODBL—The Origin and Development of the Bengali Language
MIA—Middle Indo Aryan
OIA—Old Indo Aryan

সূচীপত্র

১. রচনা ও রচয়িতা

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপালে গিয়া রাজদরবারের পুথিশালা অনুসন্ধান করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের পুথিখানি আবিষ্কার করেন এবং ৯ বৎসর পর নেপালে প্রাপ্ত অন্য তিনখানি পুথির সহিত একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। ইহার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে একটি খণ্ডিত ধারণা পোষণের হাত হইতে বাঁচাইয়া তিনি বাঙালীর শুধুমাত্র অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইযাছেন তাহা নহে, আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শনের সন্ধান দিয়া তিনি বাঙালীকে বিপুল গৌরবের অধিকারীও করিযাছেন।

বৌদ্ধগান ও দোহার মুখবন্ধে শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছিলেন, "১৯০৭ সালে আবার নেপাল গিয়া আমি কয়েকখানি পুথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্য্যাচর্যাবিনিশ্চয', উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহাও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম সরোজবজ্র, টীকাটি সংস্কৃতে, টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। আরও একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নামও দোহাকোষ, গ্রন্থকারের নাম কৃষ্ণাচার্য্য, উহারও একটি সংস্কৃত টীকা আছে।" ('হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' পৃঃ ৪-৫ ; ২য় সং)। ইহা ছাড়াও বৌদ্ধগান ও দোহাতে আর একখানি পুথি আছে তাহার নাম 'ডাকার্ণব'। এখানি নেপাল হইতে পূর্বে প্রাপ্ত। যদিও ডাকার্ণবের অন্তর্গত গানগুলির ভাষা সম্পর্কে শাস্ত্রীমহাশযের কিছু সন্দেহ ছিল তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি মন্তব্য করেন, "তাহারও শেষ দোহাগুলি আমার বাংলা বলিয়া মনে হয়" (পৃঃ ৩৫) এবং সবগুলি পুথির গান ও দোহার ভাষা বাংলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া একত্রে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের সিদ্ধান্তগুলি ছিল নিম্নরূপ—

(১) পুথিগুলি মূলত গানের বা দোহার, টীকা বা ব্যাখ্যা আনুষঙ্গিক।

(২ক) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় নামক পুথিটিও গীতি-সংগ্রহের। ইহাতে সংগৃহীত গানগুলির নাম 'চর্য্যাপদ'।

(২) চারিখানি পুথিরই মূল গান বা দোহা অংশের ভাষা বাংলা।

(৩) পুথিগুলির বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মসম্পর্কিত, ইত্যাদি।

তিব্বতী অনুবাদ

পরবর্তী কালে নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় শাস্ত্রীমহাশয়ের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং কিছু কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তিতও হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই প্রথমে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে, পূর্বোক্ত চারিখানি পুথির মধ্যে কেবলমাত্র চর্যাগীতিগুলির ভাষাই বাংলা, অন্যগুলির নহে। (১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত হয়, এ বিষয়ে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।) প্রসঙ্গত তিনি চর্য্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান দেন। শাস্ত্রীমহাশয়ও তিব্বতী অনুবাদের কথা জানিতেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী অনুসন্ধান করিয়া সেই তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং ১৯৩৮ সালে Journal of the Department of Letters-এ তাহা প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে এই তিব্বতী অনুবাদের পুথিখানি প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর যুগ্ম-সম্পাদনায় বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (নভেঃ ১৯৫৬)। এই তিব্বতী অনুবাদ হইতেই প্রথম জানা গেল, (১) শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত চর্যার পুথিটি মূলত গীতিসংগ্রহের নহে—টীকার পুথি। টীকার প্রয়োজনেই গীতিগুলি গ্রন্থে সংযোজিত।[১] (২) টীকা-রচয়িতার নাম মুনিদত্ত। যে তিব্বতী অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে তাহা মুনিদত্ত-কৃত সংস্কৃত টীকা ও মূল চর্যাগীতিগুলির। শাস্ত্রী-আবিষ্কৃত পুথিটি খণ্ডিত ছিল বলিয়া মুনিদত্তের নাম জানা সম্ভব হয় নাই, কারণ নাম থাকিলে শেষ পৃষ্ঠাতেই ছিল। (৩) তিব্বতী অনুবাদকের নাম 'মহাপণ্ডিত' কীর্তিচন্দ্র (চন্দ্রকীর্তি নামেও পরিচিত)। (৪) নেপালের স্বয়ম্ভু নামক শহরে অনুবাদ কার্য সম্পাদিত। (৫) তিব্বতী অনুবাদ হইতে ইহাও জানা যায় যে মূল গীতিসংগ্রহের পুথিখানিতে ১০০টি গীতি ছিল, মুনিদত্ত তাহা হইতে ৫০টি বাছিয়া

১. অবশ্য তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কৃত না হইলেও এই তথ্যটি জানা সম্ভব ছিল। কিন্তু পুথিগুলি পাইয়া যে-কোন কারণেই হউক শাস্ত্রীমহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল, তিনি গান ও দোহার পুথিই পাইয়াছেন, টীকা আনুষঙ্গিক। সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়' মুদ্রণের সময় ইহাতে সামান্য পরিবর্তন সাধন করেন। পুথির আরম্ভ যদিও—"নমঃ শ্রীবজ্রযোগিন্যৈ ॥ / শ্রীমৎসৎগুরুবক্ত্রপঙ্কজরসাস্বাদ স্ফুরদধ্নীদয়ো / নত্বা শ্রীকুলিশেশসদ্বয়ধিয়ং শ্রদ্ধাপ্রসন্নাননঃ। / শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে / সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্মলগিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটম্ ॥"—এই শ্লোক দ্বারা; শাস্ত্রীমহাশয় কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে শ্লোকটিকে পরে স্থান দিয়াছেন। বস্তুত কেবল চর্যাগীতির গ্রন্থ নহে, দোহাকোষের গ্রন্থ দুটিও মূলত টীকারই গ্রন্থ; এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই গীতিগুলি সংযোজিত। গ্রন্থগুলির সূত্রপাতে এবং / অথবা শেষে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। ডাকার্ণব এতই খণ্ডিত যে তাহার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলাই দুরূহ।

লইয়া টীকা রচনা করেন। তিব্বতী অনুবাদ হইতে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যই সন্দেহাতীত নহে। তবুও চর্যাগীতির পাঠনির্ণয়, নষ্ট গীতিগুলির পুনরুদ্ধার ইত্যাদি প্রসঙ্গে ইহার সাহায্য রীতিমত মূল্যবান।

পুঁথির নাম

শাস্ত্রীমহাশয় চর্যার যে সটীক পুথিখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ' বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও পুথির ভিতর কোথাও বা নেপালের অভিলেখালয়ের রেকর্ডে বর্তমানে এই নামটির সন্ধান পাওয়া যায় না, তবুও মনে হয়, নামটি শাস্ত্রীর স্বকপোলকল্পিত বা ভুল পাঠ-জনিত নহে। পরবর্তী কালে অনেকে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন নাম কল্পনা করিয়াছেন। ড. বাগচী তিব্বতী অনুবাদের সহায়তায় ধারণা করিয়াছিলেন, টীকার পুথির শুদ্ধ নাম 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়', শাস্ত্রীমহাশয় হয়ত ভুল করিয়া 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' পাঠ করিয়াছেন। ড বাগচী অবশ্য নেপাল রাজদরবারে রক্ষিত পুথিতে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি আছে বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ড সুকুমার সেনের অনুমান—মূল নাম 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়', লিপিকর-প্রমাদে হইয়াছে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'। মূল পুথির নাম যে 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' ছিল ইহার কোন প্রমাণ নাই। মুনিদত্তের গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকে উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য চর্য্যাচয়ে'র মধ্যেকার আশ্চর্য শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া অথবা চর্যার আশ্চর্যবিনিশ্চয় অর্থাৎ অপূর্ব অর্থ-নির্ধারণ, এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়' নামকরণ কাল্পনিক। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি শাস্ত্রী-প্রদত্ত, এ অনুমানও ভিত্তিহীন। কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল পুথিটি বাংলা গীতি-সংগ্রহের, টীকা আনুষঙ্গিক। অথচ 'বিনিশ্চয়ঃ' শব্দের মধ্যে টীকার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বিসর্গযুক্ত সংস্কৃত নাম টীকার সংস্কৃতভাষার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। এ বিষয়গুলি শাস্ত্রীমহাশয়ের মূল ধারণার পরিপোষক নহে। শাস্ত্রীমহাশয় নাম দিলে গীতিসংগ্রহ-বোধক কোন নামই দিতেন।

শাস্ত্রীমহাশয় যে রূপেই দেখুন, টীকা-গ্রন্থটির মূল নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' ছিল বলিয়া মনে হয় না। P. Cordier-কৃত তেঙ্গুর গ্রন্থাবলীর তালিকা হইতে জানা যায়, মুনিদত্ত-রচিত গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি'। কীর্তিচন্দ্রও চর্য্যাগীতি-কোষবৃত্তির তিব্বতী অনুবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং মুনিদত্তের গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি'—এ অনুমান সঙ্গত। মনে হয়, পুথিশালার অধ্যক্ষ খণ্ডিত পুথিটি পাইবার পর তাহাতে পুথির নামের কোনো নির্দেশ না পাইয়া এবং পুথিটি চর্যার টীকার বলিয়া 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ' নামটি পুথির আবরণে লিখিয়া দেন। সম্ভবত 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামটি তাঁহার জানা ছিল না, অথবা জানা

থাকিলেও প্রাপ্ত পুথিখানি যে মুনিদত্তের 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি'র সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই—কারণ পুথিতে মুনিদত্তের নাম নাই। অবশ্য বর্তমানে নেপালের জাতীয় অভিলেখালয়ে (National Archives-এ) রক্ষিত পুথির বাহিরের পাতায় অর্বাচীন নাগরী হরফে 'চর্য্যাচর্য্যটীকা' নামটি লেখা আছে। সহজেই অনুমেয়, এটি আধুনিক সংযোজন। এমন স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইত না। যাহা হউক, যে উৎস হইতে চর্যাগীতিগুলি পাওয়া গিযাছে তাহাতে যখন চর্যাচর্যবিনিশ্চয নাম আছে এবং আবিষ্কারক ঐ নামেই উহা প্রকাশ করিযাছেন তখন নামকরণ ঠিক না হইলেও, কাহারও ইচ্ছামত নাম পরিবর্তন সমীচীন নহে। তাহা ছাড়া, নামটি একেবারে অযৌক্তিকও নহে। মনে হয়, ড বাগচীও পরবর্তী কালে তাঁহার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর সহিত যুগ্মসম্পাদনায প্রকাশিত তাঁহার চর্য্যাগীতিকোষ নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে শান্তিভিক্ষু 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয' নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিযাছেন।[১] বস্তুত কোনো প্রামাণ্য তথ্যাদি না পাওযা পর্যন্ত 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয' নামই চলিবে। তবে প্রারম্ভিক শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া নাম পরিবর্তন যদি একান্তই অপরিহার্য হয়, তবে শেষ চরণের 'নির্মলগিরা' শব্দটি এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

শাস্ত্রীমহাশযের ধারণা ছিল আবিষ্কৃত পুথিটি গীতিসংগ্রহের, তাই তিনি লিখিযাছিলেন, গীতিসংগ্রহের নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চযঃ'। পরে জানা গেল পুথিটি টীকার—সুতরাং নামটি গীতিসংগ্রহের নহে, টীকার। তাহা হইলে প্রশ্ন, মূল গীতিসংগ্রহের নাম কি ছিল ? Cordier-এর তালিকা এবং তিব্বতী অনুবাদ হইতে অনুমান করা চলে, টীকার নাম যদি 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি' হয়, মূলের নাম নিশ্চযই 'চর্য্যাগীতিকোষ' ছিল। এ অনুমান যুক্তিপ্রতিষ্ঠ। বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় মুনিদত্তের পুথির প্রারম্ভিক শ্লোকের 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয' শব্দগুলিব উপর নির্ভর করিযা গীতিসংগ্রহের নাম 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয' হইতে পারে বলিয়া যে অনুমান করিযাছিলেন তাহা কাল্পনিক। শব্দগুলি স্পষ্টত বর্ণনামূলক, নামবাচক নহে।

---

১. "Shastriji published the text under the caption Carya.carya-viniścaya. That was the title found on the Nepalese Manuscript. ......I see no justification to invent a new name when the old one conveys the better meaning, that is, viniścaya 'determination' of carya 'that to be practised' and acarya 'that not to be practised"—CARYAGITIKOSA, Ed. Prabodhchandra Bagchi and Santi Bhiksu Sastri. Preface PIX

পুথি-পরিচয়

শাস্ত্রীমহাশয চর্যাগীতির পুথি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, পুথিটি নেপাল রাজদরবারের। পুথি ছাপা হইবার পর তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের অনুমতি লইয়া অনেকগুলি ফটো করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেগুলি তিনি মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থে তিনি পুথির পৃষ্ঠাঙ্ক এমনভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে পুথির কোন্ পৃষ্ঠায় কতদূর পর্যন্ত ছিল তাহা বোঝা যায়। পরবর্তী কালে ড নীলরতন সেন পুথির ফটোমুদ্রণ প্রকাশ করিয়া পুথির প্রকৃতরূপ কেমন ছিল তাহা সর্বসাধারণের গোচরে আনিয়াছেন।

তালপাতার পুথির প্রতি পাতার মাপ মোটামুটি ৩৩ সে.মি × ৪১/২ সে.মি. (১২৩/৪"×১৩/৮)। পুথির নামপত্রে মাপ লেখা আছে ২৩/৪"×১৩/৮"। মূল পুথিতে সম্ভবত ৭০টি পাতা ছিল। বর্তমানে খণ্ডিত পুথির মাঝের কয়েকটি পাতা (৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬) এবং সম্ভবত শেষ পাতাটি পাওয়া যায় নাই। প্রতি পাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা এবং পাতার ভিতর পিঠে পত্রসংখ্যা একবার উল্লিখিত। পুথির প্রতি পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তি করিয়া লিখিত, কেবল ব্যতিক্রম ৬৫ ক পৃষ্ঠা। সেখানে ছাড যাওয়া কিছু অংশ উপরে আর একটি পূর্ণ পংক্তি ধরিয়া লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠার ১ম ও ৫ম পংক্তি পুরোপুরি লেখা। মাঝের তিনটি পংক্তি পাতার মাঝখানের সূত্রপ্রবেশ-ছিদ্রের জন্য ১ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান ফাঁক দিয়া দুভাগে লিখিত। নষ্ট পাতাগুলিতে তিনটি সম্পূর্ণ গীতি এবং আর একটি গীতির শেষাংশ ছিল সেই হিসাবে প্রাপ্ত গীতির সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। তিব্বতী অনুবাদ হইতে নষ্ট গীতিগুলির সম্ভাব্য রূপ অনুমান করা চলে।

পুথির লিপি নিঃসন্দেহে বাংলা তবে কদাচিৎ নেওয়ারী লিপির কিছু নিদর্শনও দেখা যায়। সম্ভবত লিপিকর নেওয়ারী লিপিতে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁহার অসতর্কতায় কদাচিৎ এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। পুথিতে নাগরী লিপিতে কোথাও কোথাও সংশোধনের পরবর্তী প্রচেষ্টার চিহ্ন বিদ্যমান। পুথির বয়স অন্যূন তিন শত বৎসর—এ বিষয়টি অনুমান করা চলে নামপত্রে লিখিত ৭৪১ সংবৎ এই তারিখ হইতে। তারিখটি সম্ভবত পুথির রাজদরবার গ্রন্থাগারে অন্তর্ভুক্তির সূচক। যাহাই হউক, পুথি এত পুরাতন হওয়া সত্বেও লেখা এখনও মোটামুটি স্পষ্ট—কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাড়া। সেস্থানগুলির পাঠোদ্ধার রীতিমত দুরূহ। লিপিকর একাধিক হওয়াই সম্ভব। এক বা একাধিক যাহাই হউক লিপি সর্বত্র সুছাঁদ নহে। অসতর্কতা ও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন শেষ দিকে বেশি। (লিপি ও পাঠোদ্ধার সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা মূলগীতি অংশের সূচনায় দ্রষ্টব্য।)

সাধারণত টীকার পুথিতে মূল গীতিগুলি সম্পূর্ণত উদ্ধৃত হয় না। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া টীকাকার পূর্ণ পদের ব্যাখ্যা করেন। মুনিদত্তের টীকাতেও সেই

রীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। অধিকন্তু, টীকারম্ভের পূর্বে সম্পূর্ণ গীতিটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই রীতি কিন্তু অভিনব। এখন প্রশ্ন, কে এই মূলগীতিগুলি সংযোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? মুনিদত্ত নিজেই ইহা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে প্রত্যেকটি গীতির টীকারম্ভের প্রথম বাক্যটি পড়িয়া মনে হয়, মুনিদত্ত নিজেই মূলগীতিগুলি লিখিয়া পরে টীকা রচনা করিয়াছেন। ঐ বাক্যটিতে গীতিটির মূলকথা ও গীতিকারের নাম উল্লেখ করিয়া, 'তমেবার্থং প্রতিপাদয়ন্তি' জাতীয় যে কথা বলা হইয়াছে তাহা, মূলগীতিটি পূর্বে উদ্ধৃত না থাকিলে যেন অর্থহীন হইয়া পড়ে। তিব্বতী অনুবাদের আপাতসাক্ষ্যও এই অনুমানের সমর্থক। তিব্বতী অনুবাদ হইতে জানা যায় মুনিদত্তের গ্রন্থের নাম 'চর্য্যাগীতিকোষবৃত্তি'। ইহার অর্থ, চর্য্যাগীতিকোষ ও বৃত্তি, এইভাবে করা চলে। Cordier-এর তালিকা হইতে জানা যায়, কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কীর্তিচন্দ্র-কৃত তিব্বতী অনুবাদে মূলগীতি এবং টীকা দুই-ই আছে, সুতরাং মুনিদত্তের গ্রন্থেও ঐরূপ ছিল অনুমান করা চলে। অবশ্য এই অনুমানের বিপক্ষের যুক্তিও প্রণিধানযোগ্য। মূলগীতিগুলির পাঠ এবং টীকায় উদ্ধৃত অংশগুলির পাঠে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মূলগীতি ও টীকায় আর একটি পার্থক্য ধ্রুবপদ প্রসঙ্গে। মূল গীতিতে সব পদই ধ্রুবপদ; কিন্তু টীকায় দ্বিতীয় পদ অর্থাৎ. ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি ধ্রুবপদ (২৮, ৪৩ এই দুটি গীতি ব্যতীত)। [এ সম্পর্কে ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য।] মূলগীতি-সংযোগ ও টীকারচনা একই ব্যক্তির হইলে এরূপ পাঠভেদ সম্ভব হইত না। হয়ত পরবর্তী কালে অন্য কেহ, যে-কোন কারণেই হউক, গীতিগুলি টীকার উপর জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং এই সংযোগ-সাধনের সময় গীতিসংগ্রহের ও টীকার দুখানি স্বতন্ত্র পুথি ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাই পাঠভেদ দেখা দিয়াছে। গীতিগুলি যে পরবর্তী কালে অন্য পুথি হইতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি প্রমাণ প্রাপ্ত পুথিখানির মধ্যেই আছে। ১০ম চর্যার পর লেখা আছে, "নাড়ীডোম্বী-পাদানাম্ স্ননেত্যাদি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।" (পুথি ১৮ক পৃঃ দ্রঃ)। শাস্ত্রীমহাশয় উক্তিটি টীকাকারের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত তাহা নহে। যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন তিনিই ব্যাখ্যা নাস্তি বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন, তাহা স্বাভাবিক নহে। অন্যদিকে এই জাতীয় মন্তব্য একজন সাধারণ অনুলিপি-কারকের, তাহাও সঙ্গত মনে হয় না। উক্তিটি, যিনি মূল গীতিগুলি সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার। টীকার পুথিতে ব্যাখ্যা ছিল না, অথচ মূল গীতিসংগ্রহে গীতিটি ছিল. তাই তিনি ঐ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত আলোচনায়, সুতরাং, এ অনুমান অসঙ্গত নয়, মুনিদত্তের টীকা পরবর্তী কালে কাহারও দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল। ঐ সংস্কারকই অন্য কোন গীতিসংগ্রহ হইতে মূল গীতিগুলি সংযুক্ত করিয়াছিলেন। টীকারম্ভের প্রথম বাক্যটির

রচনা এবং সম্ভবত গীতারম্ভে কবির ও রাগরাগিণীর নাম তাঁহারই বসানো। দশম চর্যার পর "নাড়ীডোম্বী পাদানাম্ ·" ইত্যাদি মন্তব্যও তাঁহার। পুথির শেষ পাতাটি পাওয়া গেলে হয়ত এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইত। যাহা হউক, টীকার পুথিতে মূল গীতিগুলি যিনিই সংযুক্ত করুন, আমাদের সৌভাগ্য, ঐভাবে সংযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেল।

মুনিদত্ত

টীকাকার মুনিদত্তের ব্যক্তিজীবনের পরিচয় এতাবৎ জানা যায় নাই। অনুমান, চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেই তিনি চর্যাগীতির টীকা রচনা করেন। তাঁহার টীকা যে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা ইহার তিব্বতী অনুবাদ হইতে অনুমান করা যায়। অনেকে মুনিদত্তের টীকা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তান্ত্রিকতার প্রতি অকারণ ঝোঁকে তাঁহার বক্তব্য জটিল হইয়াছে—এই তাঁহাদের অভিযোগ। স্থানবিশেষে এই অভিযোগ সত্য হইলেও মুনিদত্তের টীকার গুরুত্ব তাহাতে কিছুমাত্র কমে না। [এই টীকা ব্যতীত গীতিগুলির সঠিক পাঠনির্ণয়, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ-নির্ণয় প্রায় অসম্ভব হইত। যাঁহারা মুনিদত্তের টীকা অপেক্ষা তিব্বতী অনুবাদের গুরুত্বের কথা বলেন তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া যান, তিব্বতী অনুবাদের মূলেও মুনিদত্তের টীকা।] মূল অপেক্ষা অনুবাদের মূল্য বেশি নয়। তবে, যেহেতু বিষয় এবং ভাষা খুবই জটিল, এবং গীতি-অংশের ন্যায় টীকার পাঠও সর্বত্র ঠিকভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, তাই টীকাটি দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় এবং মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি বিচার করিলে সঠিক পাঠ ও অর্থ-নির্ণয় সহজ হয়। যাহা হউক, মুনিদত্তের ধর্মমত ইত্যাদি কি ছিল জানি না। তবে তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এ পরিচয় টীকার মধ্যে বিদ্যমান। টীকায় তিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলা বহু উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের সহিত পরিচিতির নিদর্শনও আছে টীকার মধ্যে। এমন কি, 'পরদর্শন', 'বহিশাস্ত্র' বলিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাহিরে শৈব ও নাথ-দর্শন ইত্যাদির বাণীও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অজ্ঞাত-পরিচয় এই টীকাকারের বহুশ্রুততা ও উদারতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

চর্যার অর্থ

চর্যা শব্দটির একাধিক অর্থ প্রচলিত থাকিলেও মূল অর্থ আচার-আচরণ। অ-পারিভাষিক ও সাধারণ আচরণ অর্থে ইহা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় কালেই প্রচলিত। পারিভাষিক অর্থেও চর্যার প্রতিশব্দ আচরণ; তবে সাধারণ আচরণ নহে, যোগসাধনপদ্ধতি-সম্পর্কিত আচরণ। চর্যাগীতির টীকায় এই অর্থে শব্দটি

বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকাতে উদ্ধৃত 'মহারাগ নয়চর্য্যা', 'কপাল চর্য্যা' অথবা কাপালিকের প্রতিশব্দ হিসাবে 'চর্য্যাধর' শব্দের উল্লেখে এর প্রমাণ মেলে। কবিতাগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়াদের আচরণীয় বিধিনিষেধ ইত্যাদির আলোচনা আছে, তাই এগুলির নাম চর্যা। এই শব্দটির অন্য অর্থ study অর্থাৎ অধ্যয়ন বা সমীক্ষা। তন্ত্রের শ্রেণীবিশেষের নামও চর্যা। ব্যক্তিবিশেষের নামও যে 'চর্য্যা' হইতে পারে তাহার প্রমাণ মুনিদত্ত কর্তৃক টীকায় 'চর্য্যাপাদে'র উক্তি উদ্ধার। (বৌদ্ধগান ও দোহা, ২য় সং পৃঃ ৩২)। চর্যাগীতি আলোচনা প্রসঙ্গে এসব অর্থ উদ্দিষ্ট নহে বলিয়া মনে হয়। তবে গীতিগুলি বুঝাইতে চর্যা শব্দটির ব্যবহার মূলগান ও টীকা উভয়তই আছে। 'অইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইউ' (২) অথবা টীকায় 'চর্য্যান্তরং' বলিয়া চর্যায় ব্যবহৃত পংক্তির উদ্ধৃতি হইতে চর্যা বলিতে যে মূল গানগুলি উদ্দিষ্ট, তাহা বোঝা যায়। অধ্যাত্মগীতি ও ছড়া অর্থে চর্যা শব্দটি দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল।[১]

শাস্ত্রীমহাশয় চর্যা বলিতে প্রাচীনকালের কীর্তনের গানকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। চর্যাগুলি ঠিক কীর্তনের রীতিতে গীত হইত কিনা সে আলোচনা স্বতন্ত্র পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) -তবে প্রাচীনকালে একটি বিশেষ গীত-রীতির নাম ছিল চর্যা— এ কথার উল্লেখ সঙ্গীতশাস্ত্রে আছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, চর্যাশব্দের অর্থ—এক বিশেষ প্রকার গীত-রীতি। এই ধারণা ঠিক নহে। চর্যাগীতিগুলির জনপ্রিয়তার জন্যই সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাদের জন্য বিশেষ একটি শ্রেণীর নির্দেশ আছে। আগে গান, পরে গীত-রীতি। আচরণ অর্থেই চর্যাশব্দের ব্যবহার বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর আছে। সুতরাং চর্যাকে সেই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে চর্যার অর্থ দাঁড়াইতেছে—প্রথমত আচরণ, পরে আচরণীয় বিধি ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা এবং তাহার পরে সেই কবিতাগুলিকে গান করিবার রীতি। চর্যার এই বিভিন্ন অর্থান্তর হইতে ইহাও অনুমান করা চলে যে, চর্যা তখনকার দিনে বিশেষ পরিচিত একপ্রকার গীতিকবিতা ছিল। যে ৫০।৫১টি চর্যার অথবা কিছু কিছু চর্যার ভগ্নাংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা নামমাত্র। এরূপ পদাবলী আরও অনেক ছিল। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চর্যাগীতি, কঙ্কনের চর্যাদোহাকোষ-গীতিকা ইত্যাদি। এই সমস্ত গীতিকার একাধিক টীকাও প্রচলিত ছিল; Cordier-এর তালিকাতে বেশ কয়েকখানি টীকার উল্লেখ আছে। অনুসন্ধান করিলে আধুনিক কালেও আরও চর্যাগীতি পাওয়া যাইতে পারে। এখনও চর্যাগীতি নেপালের লোকমুখে প্রচলিত। এ তথ্য জানা যায় রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও আর্নল্ড বাকে কর্তৃক পরবর্তী কালে সংগৃহীত গীতিগুলি হইতে। নেপালে প্রচলিত চর্যাগীতির আধুনিক নাম চর্যাগীতি।

১. চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ৪।

ভণিতা, কবিনামাবলী ও কবি-পরিচয়

চর্যাগীতিতে ভণিতা করিবার রীতি ছিল। ৪৬টি গীতির মধ্যে ২৮টিতে স্পষ্ট ভণিতা বিদ্যমান। 'ভণই' শব্দটির ব্যবহারই সর্বাধিক। 'ভণঅ', ভণতি', 'গাইউ' শব্দের ব্যবহারও আছে। 'ঢেণ্ঢন পাএর গীত'—গীতিতে ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দাবলীও ভণিতার সমার্থক। কয়েকটি গীতে ভণিতাবাচক শব্দটি গৌরবে বহুবচনে ব্যবহৃত—ভণন্তি, ভণথি, বুলথেউ। ১৮টি গীতিতে কোন ভণিতা নাই, তবে পদমধ্যে কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে যাহাতে পদকর্তার নাম অনুমান করা চলে, যেমন, ৫ম চর্যাতে চাটিল নামটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে—'ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই', এবং পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী'। এগুলি হইতে পদকর্তার নাম 'চাটিল' তাহা অনুমান করা চলে। এই অনুমানের সমর্থন মুনিদত্তের টীকাতে মেলে। মুনিদত্ত টীকায় প্রত্যেক কবির নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[1] মুনিদত্ত কর্তৃক নামোল্লেখ সত্ত্বেও কোন কোন গীতিতে কবির নাম সম্পর্কিত অনুমান ঠিক না হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যেমন সপ্তদশ সংখ্যক গীতিতে বীণা শব্দটির উল্লেখ আছে— কিন্তু তাহা কাহারও নাম নহে।[2] মুনিদত্ত পদকর্তা হিসাবে বীণাপাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বীণাপাদ নামক পদকর্তার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায়। সুতরাং মুনিদত্তের সাক্ষ্যকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

চর্যাগীতিতে ভণিতা থাকিলেও ভণিতা ব্যবহারের কোন সুনির্দিষ্ট রীতি নাই। মধ্যযুগের কবিতায় সাধারণত শেষ পদেই ভণিতা ব্যবহৃত হয়। এ রীতি

১ পুঁথিতে নামোল্লেখের রীতিতে কিছু কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গানের মাথায় ভুসুকুপাদানাম চাটিল্লপাদানাম্, ইত্যাদি লেখা আছে এবং টীকার প্রথম বাক্যটিতেও কবির নাম উল্লিখিত। কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম আছে। যেমন ১, ২ ও ১০ সং গীতিতে গানের মাথায় কবির নাম নাই। ১৩ সং গীতিতে টীকারম্ভে কবির নাম নাই, তবে টীকার মধ্যে একাধিকবার কৃষ্ণাচার্যের নাম আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে গানের মাথায় উল্লিখিত কবিনাম এবং টীকায় লিখিত কবিনামের বানানে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন ৪ সং গীতিতে মাথায় এবং টীকারম্ভে গুণ্ডরী কিন্তু টীকার মধ্যে গুড্ডরী এবং গানের মধ্যে গুডরী। এ ছাড়াও ৩ সং গীতিতে গানের মাথায় বিরুবা, কিন্তু টীকারম্ভে বিরুআ; ৪৪ সং গীতিতে গানের মাথায় কৌঙ্কন, কিন্তু টীকারম্ভে কঙ্কন। ৩৫ সং গীতিতে গানের মাথায় ভাদেপাদ, কিন্তু টীকারম্ভে ভদ্রপাদ। কাহ্নুর নাম সম্পর্কেও অনুরূপ পার্থক্য আছে—গানের মাথায় কাহ্নুপাদ, কিন্তু টীকারম্ভে কৃষ্ণাচার্য্যপাদ। ১৬ সং গীতিতে গানের মাথায় এবং টীকারম্ভে মহীধরপাদ, কিন্তু গানে মহিত্তা। ৪৭ সং গীতিতে গীতারম্ভে গুঞ্জরীপাদানাম্, কিন্তু টীকারম্ভে ধামপাদ। এটিও শাস্ত্রীমহাশয় লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, গুণ্ডরী ও ধামপাদ, একই ব্যক্তি। আসলে মনে হয় লিপিকর [রাগ] গুঞ্জরী [ধাম] পাদানাম্ লিখিতে রাগ এবং ধাম শব্দ দুটি বাদ দিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ঐরূপ বিভিন্নতা দেখা দিয়াছে।

২. চর্যাগীতি পদাবলী, ড সুকুমার সেন।

চর্যাগীতিতেও আছে। তবে চর্যায় অনেক স্থানে একাধিকবার ভণিতা দেখা যায়। চর্যায় (২৬ সং) তিনবার ভণিতা আছে—৪র্থ, ৮ম ও ১০ম পংক্তিতে। প্রথম দুবার ভণই, শেষবার বোলথি। যেসব গীতে দুবার ভণিতা আছে সেখানে তাহা সাধারণত ধ্রুবপদে ৪র্থ পংক্তিতে এবং শেষপদে ৯ম/১০ম পংক্তিতে। ৪র্থ পংক্তির পরিবর্তে ৫ম/৬ষ্ঠ পংক্তিতেও ভণিতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেসব চর্যায় সুস্পষ্ট ভণিতা নাই সেখানেও কবির নাম পূর্বোক্ত চরণগুলিতেই সাধারণত পাওয়া যায়।

ভণিতা অথবা মুনিদত্তের উল্লেখ মিলাইয়া ৫০টি চর্যাগীতির ২৩জন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। নিম্নে পদকর্তাদের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা, মোট পদসংখ্যা এবং পদের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করা হইল—

	পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	পদের ক্রমিক সংখ্যা
১।	আজদেব	১	৩১
২।	কঙ্কণ	১	৪৪
৩।	কামলি	১	৮
৪।	কাহ্নুপাদ	১৩	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯ * ২৪, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫
৫।	কুক্কুরীপাদ	৩	২, ২০, * ৪৮
৬।	গুণ্ডরী	১	৪
৭।	চাটিল	১	৫
৮।	জয়নন্দী	১	৪৬
৯।	ডোম্বী	১	১৪
১০।	ঢেণ্ঢণ	১	৩৩
১১।	তান্তি	১	* ২৫
১২।	তাড়ক	১	৩৭
১৩।	দারিক	১	৩৪
১৪।	ধাম	১	৪৭
১৫।	বিরুঅ	১	৩
১৬।	বীণা	১	১৭
১৭।	ভাদে	১	৩৫
১৮।	ভুসুকু	৮	৬, ২১, * ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯
১৯।	মহিণ্ডা	১	১৬
২০।	লুই	২	১, ২৯
২১।	শবর	২	২৮, ৫০

	পদকর্তা	মোট পদসংখ্যা	পদের ক্রমিক সংখ্যা
২২।	শান্তি	২	১৫, ২৬
২৩।	সরহ	৪	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯

[* চিহ্নিত গীতিগুলি পূর্ণত বা অংশত, মূল পুথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায়, তিব্বতী অনুবাদ হইতে অনুমিত।]

উল্লিখিত নামগুলির অনেক ক্ষেত্রেই পাঠভেদ আছে, কাহারও বা একাধিক নাম আছে। গীতি এবং টীকাতেও এক কবির একাধিক নামের উল্লেখ আছে। কাহ্নুর নামেই সর্বাধিক চর্যার সন্ধান পাওয়া যায়। কাহ্নুপাদ—কাহ্নু, কাহ্নিল, কৃষ্ণাচার্যপাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লিখিত আছেন। অনেকে একাধিক কাহ্নুপাদের কল্পনা করেন। এ সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিরুআ, কাহ্নের নামান্তর বলিয়াও অনুমান করা হয়। কাহ্নের একটি গীতিতে 'কেহ কেহ তোরে বিরুআ বোলই' (১৮) এই উক্তিতে 'বিরুআ' নামবাচকও হইতে পারে। 'মহিআর' পাঠভেদ মহিত্তা বা মহিণ্ডা বা মহীধর। গুণ্ডরীর পাঠভেদ আছে গুড্ডরী ও গুঞ্জরী। মনে হয়, 'গুঞ্জরী' এই নামের কল্পনা ভুলপাঠ-জনিত। ৪৭ সংখ্যক ধাম-রচিত চর্যাটির প্রারম্ভে লিপিকর রাগ কথাটি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—কেবলমাত্র গুঞ্জরী (রাগের নাম) লিখিয়াছিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে পদটির উপরে কোন রাগের নাম নাই। কবিতাটির মধ্যে এবং টীকায় পদকর্তা হিসাবে ধামের নাম আছে। শাস্ত্রীমহাশয় গুঞ্জরী-কে পদকর্তার নাম হিসাবে ধরিয়া পদটির উপরে 'গুঞ্জরীপাদানাং' বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন এবং ভূমিকাংশে পদকর্তার পরিচয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, "ধামপাদের আর এক নাম গুণ্ডরীপাদ। মূল গানে ধামপাদ থাকিলেও পুথিতে তাঁহার গানের মাথায় তাঁহাকে গুণ্ডরীপাদ বলা হইয়াছে।" (পৃঃ ২৫)। গুড্ডরীপাদের কোন পরিচয় শাস্ত্রীমহাশয়ের গ্রন্থে নাই। বস্তুত, ধামপাদ ও গুড্ডরী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। গুড্ডরী ও গুণ্ডরী একই নামের পাঠভেদ। পদকর্তাদের মধ্যে তান্তির নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয় পুথিতে নাই। তান্তির চর্যাটি (২৫) নষ্ট গীতিগুলির অন্যতম। নামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তিব্বতী অনুবাদ হইতে। তবে এরূপ অন্যান্য চর্যাগুলির পদকর্তাদের (অর্থাৎ সরহ, কাহ্নু, কুক্কুরীপাদ) অন্য চর্যাও আছে। তান্তির কিন্তু একটি ভিন্ন অন্য চর্যা নাই। লাড়ীডোম্বীপাদ বলিয়া আর একজন পদকর্তার উল্লেখ আছে—কিন্তু পদটি নাই। কয়েকজন পদকর্তার নামের যাথার্থ্য সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বীণা, শবর প্রভৃতি শব্দকে পদকর্তার নাম হিসাবে গ্রহণে তাঁহার আপত্তি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এ সম্পর্কে মুনিদত্তের সাক্ষ্যর উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কতকগুলি নামকে ছদ্মনাম বলিয়াও তিনি অনুমান করেন—যেমন কাঙ্কন, তাড়ক ইত্যাদি। অন্যদিকে তান্তি, ডোম্বী ইত্যাদি ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, জাতিবাচক বলিয়া তাঁহার ধারণা। এ সম্পর্কে

নিশ্চিত করিয়া বলার মত কোন প্রামাণ্য উপাদান নাই। তবে, এ সমস্ত অনুমান একেবারে অযৌক্তিক নাও হইতে পারে।

কয়েকটি ভণিতার নামে শ্রদ্ধাবাচক পা (পাদ) যুক্ত থাকায় এবং/অথবা ভণিতা-সূচক ক্রিয়াপদটির গৌরবে বহুবচনে প্রয়োগ থাকায় ড. সুকুমার সেন সেই গীতিগুলিকে কবিদের ভক্ত শিষ্যের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।[১] সাধক-কবিরা নিজেদের নামোল্লেখে যেখানে সাধারণত দীনতাই প্রকাশ করেন সেখানে গৌরবসূচক নামোল্লেখ রীতি-বহির্ভূত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে-কবির নামে কবিতাটি চিহ্নিত তিনি সত্যকার রচয়িতা নহেন, তাহার কোন ভক্ত শিষ্য আসল রচয়িতা, এ অনুমান তর্কাতীত নহে। ভণিতায় গৌরবে বহুবচন কবির নিজেরই প্রয়োগ, না গায়কের মুখে বা লিপিকর-প্রমাদে ঐ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অন্তত একটি ক্ষেত্রে বেশ গোলমাল আছে। শান্তিপাদ-রচিত ২৬ সংখ্যক গাতে ভণিতা আছে তিনবার। দু'বার আছে 'শান্তি ভণই' (একবচন, ও স্বাভাবিক ভণিতা), তৃতীয় বার আছে 'বোলথি শান্তি' (গৌরবে বহুবচন)। একই কবিতায় এই ধরনের বিভিন্নতা বিভ্রান্তিকর। 'বোলথি'র উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চয়ই এখানে পদটি শান্তির নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অনুরূপ বহুবচন প্রয়োগ 'বুলথেউ' (১৫)। এই গীতিটিও শান্তির নামাঙ্কিত। তবে এখানে ভণিতা একবারই আছে। যেসমস্ত গীতিতে ভণন্তি (৩, ১৬) অথবা ভণথি আছে (২০) সেখানে ভণই বা ভণতি ব্যবহার করিলে অর্থ বা ছন্দের কোন অসঙ্গতি ঘটে না। সুতরাং পরিবর্তন যে গায়কের মুখে ঘটে নাই, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে গানে ভণন্তি, কিন্তু টীকায় ভণই আছে (৩৯ সং চর্যা)। সুতরাং ভণন্তি যে লিপিকরপ্রমাদ বা গায়কের মুখের পরিবর্তন, এই সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়। অন্যদিকে, পা-যুক্ত কবিনাম ছন্দের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নহে। তাহা ছাড়াও প্রথা-বিরুদ্ধ হইলেও নিজের সম্পর্কে গৌরবসূচক উল্লেখের নিদর্শন নাই তাহা নহে। 'পাথি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ' (৩৬), এই পংক্তিতে পদকর্তা নিজেকেই পণ্ডিতাচার্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মুনিদত্ত কবিদের নামোল্লেখের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের ইঙ্গিত দেন নাই, যদিও গীতিগুলির রচনার অল্প ব্যবধানে রচিত টীকায় ঐ ধরনের ইঙ্গিত একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না।

---

১. চর্যাগীতি পদাবলী, ড. সুকুমার সেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার The old Bengali Language and Text এবং চর্যাগীতি নামক গ্রন্থ-দুটিতে এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। (দ্রঃ গ্রন্থ-দুটির পৃঃ যথাক্রমে ১০ ও ২৬)।

২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা O.D.B.L. পৃঃ ১২১-১২২ দ্রঃ।

রচয়িতাদের অনেকেই ৮৪ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। ইঁহাদের সম্পর্কে নির্ভুল কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তারানাথের কাহিনী বা অন্যান্য তিব্বতী-নেপালী ঐতিহ্য হইতে ইঁহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা সংগ্রহ করা যায় বটে, তবে তাহার ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি সম্পর্কে জোর করিযা কিছু বলা যায় না। সিদ্ধাচার্যদের নামের সহিত মিলই যে আবাব সর্বক্ষেত্রে পদকর্তা ও সিদ্ধাচার্যদের অভিন্নতা প্রমাণ করে তাহাও নহে। তাবানাথের কাহিনীতে একই নামের বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেথ আছে। তারানাথের বর্ণনা আবার সুম্‌পা-রচিত পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাঙ্‌ গ্রন্থের সহিত মেলে না। কিম্বদন্তীতে প্রাপ্ত তথ্য আবও বিস্ময়কব। সেখানে কাহারও-বা জন্ম আবার ডাকিনীর গর্ভে। সুতরাং কল্পনা বাস্তবের আলো-আঁধাবি সেই বিস্তীর্ণ বনভূমিতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা পদে পদে। আপাতত সেখানে পদচাবণার বিশেষ প্রযোজনও নাই। ইঁহাদেব সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওযা যায় তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেথ করা হইতেছে।

লুইপাদকে পদরচযিতাদের মধ্যে প্রাচীনতম মনে কবা হয। তাঁহার একটি পদ দিযা চর্যাগীতি-সংগ্রহটিব সূচনা, ইহা হয়ত নিবর্থক নহে। লুইপাদেব অন্য তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়; একখানিতে হযত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাহায্যও ছিল। অথবা দীপঙ্কর ইহার টীকা রচনা কবিযাছিলেন। সেখানির নাম, অভি-সময-বিভঙ্গ।

কুক্কুরীপা আগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহাব নামেও অনেক গ্রন্থের সন্ধান পাওযা যায়। চর্যাগীতিতে এঁর দুটি কবিতাই নারীর উক্তি, তাই, ড. সুকুমার সেন ইঁহাকে (অথবা পদদুটির রচযিতাকে) নারী বলিয়া অনুমান কবিয়াছেন।

বজ্রযানী বৌদ্ধ-সাধনার ক্ষেত্রে শান্তিদেব বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু ঐ শান্তিদেব ও পদকর্তা শান্তি একই ব্যক্তি নহেন। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে শান্তির অপর নাম ভুসুকু, তিনিই আবার রাউতু। পদকর্তা শান্তির সহিত ভুসুকু-রাউতুর যোগাযোগ থাকিতে পারে, এমনকি তাঁহারা অভিন্নও হইতে পারেন। তবে পূর্বোক্ত বিখ্যাত শান্তিদেব ও ভুসুকুর মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। রাউতু শব্দটি ভুসুকুর বিশেষণবাচক, রাজপুত্র বা রাজসেবী অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

শবর নামে যে পদকর্তার সন্ধান পাওযা যায, তিনি এবং সিদ্ধাচার্য শবর বা শবরীপাদ এক ব্যক্তি না হইবার সম্ভাবনাই বেশি। শবর নামাঙ্কিত পদ-দুটিতেই শবর জীবনের বর্ণনা আছে এবং সিদ্ধাচার্য শবর শবর-জাতীয় ছিলেন—এই তথ্য-দুটি কোন বিশেষ তাৎপর্যবহ কিনা কে জানে?

পদকর্তা দারিক লুই-পার শিষ্য বলিয়া পরিচিত; এর সমর্থন দারিকের চর্যার মধ্যেও আছে। তারানাথের মতে বিরূআ কৃষ্ণপাদের নামান্তর। গুড্ডরী, চাটিল, জয়নন্দী ও তাড়ক, এই চারিটি নাম তিব্বতী ঐতিহ্যে নাই। গুণ্ডরী সম্ভবত

বৃত্তিবাচক (গুণ্ডরিক = গুঁড়াকারী)। চাটিল চট্টগ্রামবাসী হইতে পারেন। তাড়ক সম্ভবত ছদ্মনাম বা উপাধি। জয়নন্দীর কোন পরিচয় জানা যায় না। পদকর্তা কামলি ও সিদ্ধাচার্য কম্বলাম্বরপাদ বোধ হয় একই ব্যক্তি। কঙ্কণ কামলির বংশধর বলিয়া পরিচিত। ডোম্বী ত্রিপুরার রাজা (শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে মগধের রাজা)। ইনি বিরূআর শিষ্য। বীণাপাদ ডোম্বীর সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমিত। বীণাপাদ বিরূআর বংশধর। মহিআ কাহ্নের শিষ্য। তিব্বতী ঐতিহ্যমতে আজদেব তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার একখানি হয়ত চর্যার টীকা (চর্য্যামেলায়নপ্রদীপ)। ঢেণ্ঢন তিব্বতী উচ্চারণে হন ধেতন। ধেতনকে তিব্বতী ঐতিহ্যে কাহ্নের বংশধর বলা হইযাছে। ভাদে ছিলেন জনৈক আচার্য। ইঁহার নামান্তর ভাণ্ডারিন বা ভদ্রদত্ত বা ভদ্রচন্দ্র-জাতীয় কিছু হওয়া সম্ভব।

সরহের পরিচয় সম্পর্কে কিছু ভাল তথ্য পাওয়া যায়। ইঁহার দোহাও পাওযা যায়। সরহের জীবৎকাল সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ তথ্য পাওয়া যায় ইঁহার দোহাগুলির অনুলিপির তারিখ হইতে (রচনাকাল অধ্যায় দ্রঃ)। পদকর্তা শবরের নামান্তর ছিল সরহ। কিন্তু সেই সরহ এবং এই আচার্য এবং চর্যা ও দোহা-কার সরহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। তারানাথ দুজন সরহের উল্লেখ করিয়াছেন।

কাহ্নের পদসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নাই। কাহ্ন যে একাধিক ছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। তারানাথ দুজন কাহ্নের (কৃষ্ণাচার্যের) উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষা, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিচার করিয়া অন্তত দুজন কাহ্নের অনুমান সমর্থনযোগ্য। একজন কাহ্ন গোবিন্দপাল-দেবের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। হেবজ্রতন্ত্র নামক গ্রন্থের যোগরত্নমালা নামক টীকার পুথিতে এ কথার উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, এই ধরনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন তথ্য হইতে ধারাবাহিক কোন কাহিনী গঠন সম্ভব নহে। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে ইঁহাদের রচিত কিছু কিছু অন্যান্য গ্রন্থাদির সন্ধান পাওয়া যায়, অথবা কে কাহার বংশধর বা শিষ্য তাহার কিছু পরিচয় মেলে, এইমাত্র।

২. চর্যাগীতির রচনাকাল

চর্যাগীতিগুলি বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, কিন্তু ঠিক কবে যে এগুলি রচিত হইয়াছিল তাহা সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। যদি রচয়িতাদের জীবৎকাল সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি লাভ করা যাইত তবে চর্যাগীতির রচনাকালও সন্দেহাতীতভাবে জানা যাইত। সেই উপাদানের অভাবে চর্যাগীতিগুলির ভাষায় যুগলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য, পুথির বয়স ও লিপিকাল, কবিদের জীবৎকালের সম্ভাব্য যুগ এবং অন্যান্য কিছু কিছু বাহ্য-আভ্যন্তর যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহাদের রচনাকাল সম্পর্কে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করা যায়। অবশ্য আনুমানিক হইলেও সে সিদ্ধান্ত কবি-কল্পনা নহে— ঐতিহাসিক অনুমান।

অন্য সুনির্দিষ্ট উপাদানের অভাবে চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল বিষয়ে ভাষার প্রমাণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি। অপভ্রংশের খোলস ছাড়াইয়া যখন ভারতীয় ভাষাগুলি আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করিতেছিল সেই সময়কার ভাষার নিদর্শন চর্যাগুলির মধ্যে বিদ্যমান। কালের দিক দিয়া তাই চর্যাগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভাষাচার্য ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। (The period 950—1200 A D would thus seem to be a reasonable date to give to these poems—O, D. B L, P -123) তাঁহার গবেষণাই প্রমাণ করিয়াছে যে, চর্যাগুলির ভাষা প্রাচীনতম বাংলা, অপভ্রংশও নহে, হিন্দী-ওড়িশীও নহে। সুতরাং বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কালের ব্যাপ্তিই চর্যাগুলির রচনাকালের উভয় দিকের সীমা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া আলোচনার সূত্রপাতে ড চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন—what is the date of the caryas ? Judging from the language one would be inclined to place them at least 150 years before the 'Śrī Kṛṣṇa-Kīrtana which belongs to the last quarter of the 14th century (Ibid p 118)। ড. সুকুমার সেন ভাষালক্ষণে চর্যাগীতিগুলি যে প্রাচীনতম বাংলা ভাষাস্তরের—এই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন 'ভাষার ইতিবৃত্তে'। (দ্রঃ ভাষার ইতিবৃত্ত, একাদশ সং, পৃ ১৬৩ ও ঐ পৃ ২নং পাদটীকা এবং ১৬৫ পৃ)। চর্যাগীতির ভাষার মধ্যে প্রাচীন বাংলার কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী প্রত্নবাংলা স্তরের সামান্য কিছু নিদর্শনের অস্তিত্ব ড চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সেন উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন —কিন্তু তাই বলিয়া চর্যাগীতির রচনাকালকে আরও পূর্ববর্তী স্তরে সরাইয়া লইতে তাঁহাদের আপত্তি। সুতরাং ভাষার যুগ লক্ষণ বিচার করিয়া মূল চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত।

ভাষার লক্ষণ ধরিয়া গীতিগুলির রচনাকাল-নির্ণয়ে দু-একটি সমস্যার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, চর্যাগীতির যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহা কবিদের স্বহস্ত-রচিত নহে, এমনকি টীকাকারের স্বহস্ত-রচিত পুথিও পাওয়া যায় নাই। মূলগীতিগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মুনিদত্তের টীকা রচিত হয় নাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, পুথিমধ্যস্থ মূলগীতিগুলির পাঠভেদ হইতে। মূলগীতিরচনার যুগ হইতে টীকা বা অনুলিপি-রচনার যুগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালে এই জনপ্রিয় গীতিগুলি নিশ্চয়ই গায়কদের মুখে মুখে এবং / অথবা লিপিকরদের অনুলিপির মাধ্যমে প্রচারিত ছিল। সুতরাং মূল রচনার সময়কার রূপ হইতে চর্যাগীতিগুলির ভাষা পরিবর্তিত হওয়াই স্বাভাবিক, যেমনভাবে মধ্যযুগের অনেক জনপ্রিয সাহিত্য-কৃতির ভাষা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষা, যে কোন কারণেই হউক, সেভাবে পরিবর্তিত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, চর্যাগীতিগুলি ঠিক সমসাময়িক যুগের কয়েকজন কবি দ্বারা রচিত নহে। কবিদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু তাঁহারা যে একজন অন্য জনের শিষ্য বা বংশধর ছিলেন এসব উক্তি একেবারে মিথ্যা না-ও হইতে পারে। সুতরাং একজন কবি হইতে আর একজন কবির নিশ্চয়ই কিছু ব্যবধান ছিল। ব্যবধান থাকিলে ভাষায় তাহার প্রতিফলন স্বাভাবিক—বিশেষত ভাষার সেই গঠনযুগে, যখন পরিবর্তন ছিল অতি দ্রুত। কিন্তু চর্যাগীতির ভাষায় সেই পরিবর্তনের চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট নহে। সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও মোটামুটি একটি বিশিষ্ট রীতিই যে ভাষাগুলির মধ্যে ব্যবহৃত তাহা লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এ অনুমান স্বাভাবিক, খুব দরাজ কল্পনাতেও বিভিন্ন কবির সময়সীমার ব্যবধান দুইশত বৎসরের অধিক নহে। ইহা অপেক্ষা অধিক হইলে কবিরা একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, এ অনুমান অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ভাষার লক্ষণ বিচার করিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা ইহার বিরুদ্ধেই মন্তব্য করিয়াছেন। (O D.B.L. P-118)। যাহা হউক, ভাষাগত এ সমস্ত সমস্যার কথা স্মরণ রাখিয়াও বলা চলে, চর্যায় ১০ম-১২শ শতাব্দীর ভাষা লক্ষণ প্রাপ্তব্য।[১]

প্রাপ্ত পুথিখানির লিপি বিচার করিয়াও চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। পুথিখানির লিপি প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির মতবাদ নিম্নোক্তরূপ—

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির

---

১. অধ্যায়শেষে পা. টী. দ্র.

লিপিকাল পঞ্চদশ শতকের পরে নহে, সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। প্রসঙ্গত তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, চর্যাগীতির পুথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি অপেক্ষা অর্বাচীন। সুতরাং ইহার লিপিকাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক।

৩। ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাখালদাসের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া চর্যাগীতির পুথি সম্পর্কে 'Post 14th Century' বলিয়া উল্লেখ কবিযাছেন।

৪। ড সুকুমাব সেন মহাশযেব মতে চর্যাব পুথিব 'লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী ধবিলে মাবাত্মক ভুল হইবে না'।

৫। ড তারাপদ মুখোপাধ্যায চর্যাব পুথিব লিপি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'চর্যাগীতি' নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'চর্যার পুথির লিপিকাল দ্বাদশ শতকের শেষার্ধ।' (পৃঃ ৯৬)। অন্যত্র অবশ্য তিনি বলিযাছেন, The Commentary of Munıdatta was written probably ın the 14th century and the ms of CV in all probabılıty was copied between 14th to 16th century. (The Old Bengali Language and Text, pp. 7-8)

সমালোচকদেব পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে ঐকমত্য নাই। তবে এই সমস্ত আলোচনা হইতে দুই দিকের যে সময-সীমা পাওয়া গেল তাহা দ্বাদশ ও ষোড়শ শতক। মুনিদত্ত ঠিক কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন বা টীকা রচনা কবিয়াছিলেন তাহা জানা যায না। তবে সবদিক বিবেচনা করিযা সকলেই তাঁহাকে চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থাপনের পক্ষপাতী। সুতরাং টীকা রচনা অথবা টীকার পুথির অনুলিপি চতুদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। মূল গীতিগুলি তাহা হইলে অবশ্য ইহাব পূর্ববর্তী। ঠিক কতকালের পূর্ববর্তী তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। তবে বেশ কিছুকাল পূর্বের, এ অনুমান মিথ্যা নহে। এইসব বিবেচনা করিযা মূল গীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিযা যদি ধরা হয তাহা হইলে বোধ হয ভুল হইবে না।

তিব্বতী অনুবাদেব উপর ভিত্তি করিযাও রচনাকাল সম্পর্কে কিছু অনুমান কবা চলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয বলিয়াছেন, ৭ হইতে ১৩ শতকের মধ্যে তিব্বতীরা ভারতের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাদি অনুবাদ করিত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাযও লিখিযাছেন, "This sufficiently demonstrates that the vernacular and Apabhraṁśa literature of the period 800-1200 AC., or later, was to a large extent translated into Tıbetan, (ODBL. p. 119 footnote)। মুনিদত্তের বৃত্তির তিব্বতী অনুবাদ ঠিক কবে হইয়াছিল জানা যায় না। তবে তাহা চতুর্দশ শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে

বলিয়াই মনে হয়। এই পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া মূল গীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতকের পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করা চলে।

এ সমস্ত ছাড়াও, এই গীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আরও অনেক বাহ্য-আভ্যন্তর প্রমাণ আছে। চর্যাগীতিগুলির বিষয়বস্তু সহজিয়া বৌদ্ধ সাধনপদ্ধতি সম্পর্কিত। বাংলা দেশের এই সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়, চর্যাপদগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত। পাল যুগ পর্যন্তই বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা দেশে রাজানুকূল্য লাভ করিয়াছিল এবং এই যুগের মধ্যেই তাহা তান্ত্রিকতার স্পর্শে পরিবর্তিতও হইয়া গিয়াছিল। সেন-বর্মন যুগে বৌদ্ধ ধর্ম রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় নানা ভাবে নিগৃহীতও হয়। চর্যাপদে ধর্ম-বিষয়ক যে তথ্য ও সমাজচিত্র পাওয়া যায় তাহাও নির্ভুলভাবে পাল পর্বের পতন ও সেন-বর্মন পর্বের অভ্যুদয় ও রাজত্বকালের দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং এই বিষয়বস্তু ও সমাজচিত্রের আভ্যন্তর যুক্তি হইতেও প্রমাণিত হয় চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই।

আলোচ্য গীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যাইত রচয়িতাদের জন্মকাল নিশ্চিতভাবে জানা গেলে। কিন্তু পদকর্তাদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উক্তি কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের পরিচয় সূত্রে নানা প্রসঙ্গে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা অনেক সময়ই পরস্পর-বিরোধী। এই সমস্ত উক্তির মধ্য হইতে আমরা কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই গ্রহণ করিব যেটুকু সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করিব।

সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে সাধারণত চর্যার পদকর্তাদের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া ধরা হয়। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে লুইপাদ 'অভি-সময়-বিভঙ্গ' নামে একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ১০৩৮ খ্রী. অঃ তিব্বতে গমন করেন। লুইপাদ দীপঙ্করের বর্ষীয়ান সমসাময়িক। সুতরাং লুইপাদের জীবৎকাল একাদশ শতকের প্রথমার্ধেই ধরিতে হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমান এতদিন পর্যন্ত নিঃসন্দেহেই গৃহীত হইয়া আসিতেছিল এবং ড. চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ড. সুকুমার সেন ও ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে নূতন তথ্য সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় লুইপাদের সময় আরও পূর্ববর্তী। ড. বাগচী কর্তৃক **Journal of the Department of Letters vol. XXVIII.** ১৯৩৫-এ প্রকাশিত নেপাল-দরবারের পুথির বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ২২১ নেপাল সংবৎ অর্থাৎ ১১০১ খ্রী. অঃ শ্রীদিবাকর চন্দ্র সরহের দোহাগুলি বিনষ্ট-প্রণষ্ট হইতে দেখিয়া একটি পুথিতে তাহা সংকলিত

করেন। ড সুকুমার সেন মহাশয় সেই সংগ্রহ-গ্রন্থের পুষ্পিকাটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"সমন্তো জহালব্ধা দোহাকোসো এসো সংগহিত্ত...পণ্ডিত-সিরি দিবাকর চন্দেণেত্তি। সম্বৎ ২২১ শ্রাবণ শুক্লপূর্ণমাস্যাং।..."

সুতরাং নিঃসন্দেহে দেখা যাইতেছে যে, সরহের দোহাকোষ ১১০১ (২২১ নেপাল সংবৎ)-এ অনুলিখিত। পদগুলি অনুলিখিত হইয়াছিল বিনষ্ট-প্রণষ্ট ('বিণট্‌ঠা-পণট্‌ঠা-পউ') হইতেছিল বলিয়া। নষ্ট হইতে অন্তত ৫০ বৎসর কাল লাগে ধরিলেও—সরহের মূল দোহাগুলি লিখিত হইয়াছিল একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সরহের জীবৎকাল ঐ সময়ে। তাহা হইলে লুই ও সরহ সমসাময়িক হইয়া যান। কিন্তু নানা কারণে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, লুই সরহ অপেক্ষা প্রাচীনতর।[১] সরহের সময়-সম্পর্কিত সদ্যোক্ত তথ্যটি নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে লুইপাদকে ধরিতে হয় দশম শতাব্দীর শেষ পাদে, অন্তত একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে কিছুতেই নহে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইপাদের 'অভি-সময-বিভঙ্গ' সাহায্য করিয়াছিলেন—ইহা কিরূপে সম্ভব? ড. সুকুমার সেন মহাশয় এখানে অনুমান করেন যে, শ্রীজ্ঞান লুইপাদকে গ্রন্থ-রচনায় প্রত্যক্ষ সাহায্য করিয়াছিলেন—এ কিংবদন্তী সত্য নাও হইতে পারে। হয়ত, লুই পূর্বেই 'অভিসময়' নামে মূল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীজ্ঞান পরে 'বিভঙ্গ' নামে তাহার পরিশিষ্ট বা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, লুই দশম শতাব্দীর লোক এবং সরহ তাঁহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের অর্থাৎ একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। আর এই অনুমান যদি মিথ্যা হয় অর্থাৎ লুই এবং শ্রীজ্ঞান-সম্পর্কিত তিব্বতী কিংবদন্তী যদি সত্যই হয়, তবে সিদ্ধান্ত এই হয় যে, লুই সরহের বয়োযান এবং প্রবীণতর সমসাময়িক। মোটের উপর একথা ঠিক যে, লুই অথবা সরহ কাহারও জীবৎকালের সীমা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এ দিকে নহে।

ভুসুকু-সম্পর্কে অনুরূপ একটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাঁহার 'চতুরাভরণ' নামক গ্রন্থের পুথি হইতে। পুথিখানি নকল করা হয় ৪১৫ নেপাল সংবৎ-এ অর্থাৎ ১২৯৫ খ্রী. অঃ। সুতরাং ভুসুকুর জীবৎকাল ইহার পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমান করা চলে।

শৈব সিদ্ধা ও বৌদ্ধ সিদ্ধাদের যোগাযোগ এবং ইহাদের অনেকের একত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সারা ভারতে প্রচলিত নানা কিংবদন্তী আছে। এই সমস্ত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া গুরু-পারম্পর্য বিচার করিয়াও ইহাদের রচনাকাল

১. অবশ্য বিরুদ্ধ মতও আছে। অধ্যায় শেষে পা. টী. দ্র.

সম্পর্কে কিছু তথ্য দাঁড় করান যায়। কিন্তু যেহেতু তাহার পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের সুনির্দিষ্ট সমর্থন নাই, সেজন্য তাহা হইতে বিরত থাকাই ভাল।

চর্যাগীতিগুলির রচনাকাল সম্পর্কে আর একটি বাহ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আলোচ্য-প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। চর্যাগীতিগুলি সুরতাল-সংযোগে গীত হইত। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ গীতিগুলিতেই আছে। সুতরাং সমসাময়িক যুগের সঙ্গীতগ্রন্থে চর্যাগীতির উল্লেখ সন্ধান করা উচিত। প্রাচীন বাঙলার দুইখানি সঙ্গীতগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী' এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর'। সঙ্গীতরত্নাকরের রচনাকাল ১২১০-৪৭ খ্রী. অঃ, রাগতরঙ্গিণী আরও প্রাচীন। রাগতরঙ্গিণীতে চর্যাগীতির উল্লেখ নাই। সঙ্গীত-রত্নাকরে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এই 'চর্য্যা' যে আমাদের আলোচ্য চর্যাগীতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে লিখিত গ্রন্থে চর্যাপদের যখন বিস্তৃত উল্লেখ আছে তখন ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, চর্যাগীতিগুলি তাহার বহুপূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, এবং বেশ পরিচিতই ছিল। এগুলি এতদূর পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল যে সঙ্গীত-শাস্ত্রে একটি বিশেষ রীতি হিসাবেই চর্যাগীতির স্থান হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই প্রমাণ হইতেও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে যে, চর্যাগীতিগুলি দ্বাদশ শতকের মধ্যেই রচিত ও প্রচারিত।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত মানসোল্লাস নামক সংস্কৃত কোষ গ্রন্থে চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনায় বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অর্থ ও পদান্তমিলযুক্ত, পূর্ব ও উত্তরার্ধ মিলাইয়া মোট ১০/১২ টি চরণ লইয়া চর্যা গঠিত।[১] এই চর্যা ও আমাদের আলোচ্য চর্যা অভিন্ন। মানসোল্লাসের এই উল্লেখ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেই চর্যার অস্তিত্ব সূচিত করে।

পূর্বোক্ত আলোচনার বিভিন্ন সূত্র হইতে, সুতরাং, আমরা চর্যাগীতিগুলির রচনার নির্দিষ্ট সন-তারিখ কিছু উল্লেখ করিতে না পারিলেও, এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ঐ গীতিগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল।[২]

---

১. মানসোল্লাসের শ্লোকটির জন্য দ্র. চর্যাগীতি পদাবলী পৃঃ ১৫৭।

২. কয়েকটি গ্রন্থে প্রাপ্ত তিব্বতী ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া মুঃ শহীদুল্লাহ্, রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুরুশিষ্য পারম্পর্যের যে তালিকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সরহপা→শবরপা→লুইপা ইত্যাদিক্রমে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পর্যন্ত ১৪টি নামের একটি নামাবলী পাওয়া যায়। শেষতম আচার্য দীপঙ্কর একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। শ্রীজ্ঞানের গুরু, তাঁহার গুরু ইত্যাদিক্রমে সরহপা পর্যন্ত পশ্চাৎগমন করিলে ৮ম শতাব্দীতে উপনীত হইতে হয়। অর্থাৎ লুই সরহ প্রভৃতি চর্যাকারদের জীবৎকাল ৮ম শতাব্দীর কাছাকাছি। তিব্বতী ঐতিহ্য ছাড়াও এই বিষয়ে অন্য কিছু সমর্থক প্রমাণও আছে। এগুলি সত্য হইলে চর্যার মূল রচনা ৮ম শতাব্দী বলিতে হয়। কিন্তু তখন বাংলাভাষার উদ্ভব হয় নাই।

৩. চর্যাগীতির ভাষা

চর্যাগীতিগুলির আলোচনার দুইটি দিক—একটি ইহার ধর্মীয়-দার্শনিক দিক, অন্যটি ইহার ভাষাতাত্ত্বিক দিক। বস্তুত, ভাষার আলোচনায় ইহার মূল্য অপরিসীম। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রথম চর্যাগীতির ভাষা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং 'We have in these Caryas some of the oldest documents in any NIA language, documents of prime importance for NIA. philology' (ODBL. p 118)—বলিয়া চর্যাগীতির ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করান। চর্যার ভাষা-বিষয়ে সুনীতিকুমারের বিচার নানাদিকে বিশেষ মূল্যবান;—একদিকে ইহা চর্যাপদের উপর অন্য ভাষার দাবিকে নিরস্ত করিয়াছে, অন্যদিকে ইহা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটির নির্ভুল সন্ধান দিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস-গঠনের উপাদান যোগাইয়াছে।

সুনীতিকুমারই প্রথম বিশেষ বিচারে চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু যেহেতু ইহা প্রাচীনতম বাংলা সেইজন্যই ইহাতে এমন কিছু কিছু রূপ আছে যাহা অপভ্রংশ বা অপভ্রংশ-গন্ধী—সে অপভ্রংশ—মাগধী, কখনও বা অর্ধমাগধী বা শৌরসেনী। ইহার কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, চর্যাগীতির মধ্যেই সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলার প্রথম ব্যবহার। বাংলা ভাষার ব্যবহার তখন সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং রূপগুলি কি হইবে সে বিষয়ে পদকর্তারা নিশ্চিত নন। তাই তাঁহারা ভাষাদর্শের জন্য সাহিত্যিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নিকটতম প্রতিবেশী শৌরসেনী অপভ্রংশের দিকে তাকাইয়াছেন। শৌরসেনী অপভ্রংশ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অভিজাত মহলে প্রচলিত ভাষা। পদকর্তারা সেই ভাষা জানিতেন। তাহা ছাড়া, লিপিকরেরা তো প্রাচীন বাংলা অপেক্ষা শৌরসেনী অপভ্রংশই বেশি জানিতেন। সুতরাং লিপিকর-

---

তাই এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে চর্যাগুলি মূলত অপভ্রংশ অবহট্‌ঠে রচিত হইয়াছিল এবং পরে তাহার ভাষা গায়েনদের মুখে অথবা অনুবাদ মারফৎ প্রাচীন বাংলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। (দ্র. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় এবং পরেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা ভাষা পরিক্রমা, ১ম খণ্ড)। এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও 'বাংলা' চর্যার 'রচনাকাল' ১০ম-১২শ শতাব্দী বলিতে কোন বাধা নাই। মূল চর্যাগুলির রচনাকাল যদি ৮ম শতাব্দী হয় তবে তাহা ছিল অবহট্‌ঠ চর্যা। আমাদের বিবেচ্য রূপান্তরিত (?) বাংলা চর্যা। সেই রূপান্তর রচনা ঘটিয়াছিল ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে।

প্রমাদেও স্থান-বিশেষে কিছু কিছু শৌরসেনী থাকা অসম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও, ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, চর্যাগীতির বিষয়বস্তু ঠিক আধুনিক কালের ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ বাঙলার নহে। আর তখনকার দিনে বাঙলা দেশ বলিতে বর্তমানের বাঙলাকে বুঝাইত না; তখনকার বাঙলার সীমা ছিল আরও বিস্তৃত। সুতরাং তখনকার দিনের লিখিত সাহিত্যে আধুনিক বাঙলার সীমানার বাহিরের অন্যান্য প্রদেশের দুই-চারিটি শব্দের প্রাচীন রূপ দেখিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু এই সামান্য দুই-চারিটি সন্দেহজনক শব্দ-নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া চর্যাগীতিগুলিকে বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া দাবি করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন ওড়িয়া বলিয়া মনে করেন, [দ্রঃ **History of Bengali Language by B C. Majumdar, Lecture XIII**]। আবার কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন বিহারী বলিযা মনে করেন। [হিন্দী পত্রিকা 'গঙ্গা'তে শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়নের প্রবন্ধ অনুসরণ করিয়া শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল 'অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স', সপ্তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন]। অসমীয়া ও ওড়িয়ার দাবি প্রসঙ্গে বলা চলে স্বতন্ত্র ভাষারূপে তাহাদের প্রতিষ্ঠা চর্যা রচনার পরবর্তী যুগে। চর্যার যুগে ইহারা বাংলা ভাষার মধ্যেই নিহিত ছিল। ঐতিহ্য বা ভাষার পূর্বরূপ হিসাবে দাবি করিলে ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষার দাবির যৌক্তিকথা কিছুটা স্বীকার্য। অন্যভাষার দাবি প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন আধুনিক ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির মধ্যে পারস্পরিক কিছু সাদৃশ্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য চিহ্নও সেযুগে বিদ্যমান ছিল এবং সেইসব চিহ্ন বিচার করিয়া চর্যার ভাষার জাতি নির্ণয় সম্ভব।

চর্যার ভাষা যে প্রাচীনতম বাংলা তাহার প্রমাণ হিসাবে নিম্নলিখিত নির্ভুল যুক্তিগুলির উল্লেখ করা চলে—

(ক) শব্দরূপে বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট বিভক্তি— যথা তৃতীয়াতে তেঁ (তে) [সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই—১]; চতুর্থীতে —রে (রঁ) [সো করউ রস রসানেরে কংখা—২২]; ষষ্ঠীতে এর (র) [করণক পাটের আস—১ হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী—৬]; সপ্তমীতে—ত, এ ইত্যাদি—[সাঙ্কমত চড়িলে —৫ দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায়—৩৩]

(খ) মাঝেঁ, অন্তরে, দিআঁ, সাঙ্গে—ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার— কোড়ি মাঝেঁ একু—২; তোহোর অন্তরে—১০; চারিবাসে গড়িলারে দিআঁ চঞ্চালী—৫০: দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই —৩২।

(গ) ধাতুরূপের বিশিষ্ট বিভক্তি—
ভবিষ্যৎকালে 'ইব'—জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী—৫
কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস—৭
অতীতকালে 'ইল'—কানেট চৌরি নিল অধরাতি—২
সসুরা নিদ গেল—২
অসমাপিকায ইআ, ইলে—মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী—১১
সাঙ্কমত চড়িলে—৫

(ঘ) থাকা অর্থে (Substantive) আছ্ এবং থাক্ ধাতু—জইসনে অছিলেস তইসন অচ্ছ (যেমন ছিলে তেমনি থাক)—৩৭
গুরুবঅণ বিহাবেঁ বে থাকিব তই ঘুণ্ড কইসে—৩৯

(ঙ) বিভিন্ন বাগ্‌বিধির ব্যবহাব—
যুক্ত ক্রিযাপদেব ব্যবহাব—কহন ন জাই—২০, পার করেই —১৪, অহাব কএলা—৩৫, নিদ গেলা—২; ইত্যাদি।
প্রবচন-জাতীয শব্দসমষ্টি—অপণা মাংসে হরিণা বৈবী—৬
হাথেবে কাঙ্কাণ মা লেউ দাপণ—৩২
বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ বলন্দেঁ—৩৯
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী—৩৩

চর্যাগীতিব ভাষার 'বাংলাত্বেব' এই নির্ভুল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শৌরসেনী অপভ্রংশেব যে দুই-চাবিটি উদাহরণ গোল বাধাইয়াছিল তাহাদেব উল্লেখ প্রয়োজন। কতকগুলি নিষ্ঠান্ত অতীতকাল (Past participle)-এব রূপ, যেমন—কিউ, বিআপিউ, গউ, অহাবিউ, বিকসিউ, থাকিউ, বহিউ, (অর্থাৎ ক্ত প্রত্যয়ান্ত কিঅ, বিআপিঅ, গঅ ইত্যাদি রূপ না হইযা—ইউ, বা উ প্রত্যয়ান্ত রূপ হওয়া); সর্বনামে—জো, সো, জইস, তইস, জসু, তসু, [অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার যে, কে, যা (হ), তা (হ) ইত্যাদি], সর্বনামীয ক্রিয়া-বিশেষণ—জিম, তিম, এবং সর্বনামীয় বিশেষণ—জৈসন, তৈসন, জৈসো ইত্যাদি। খুব কম ব্যবহৃত হইলেও এগুলিই ড. চট্টোপাধ্যাযেব মতে, শৌরসেনী অপভ্রংশের উদাহরণ। অবশ্য, পরবর্তী কালে এগুলির জাতি-স্বরূপ লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জৈসনেঁ, তৈসনে আছে—সুতরাং এই দুটিকে এই তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়। অন্যান্য উদাহরণগুলিকে খাঁটি শৌরসেনী অপভ্রংশ না বলিয়া ইহার বিকৃতি—অবহট্‌ঠের রূপ বলিতে হয। ইহা ছাড়া, মৈথিলেরও দুই-একটি উদাহরণ আছে—যেমন ভণথি, বোলথি; ইহা যদি ভণন্তি বোলন্তি হইতে আগত না হয়, তবে নিতান্তই লিপিকর-প্রমাদ, কারণ চর্যাপদগুলির অনুলিপি হইয়াছিল নেপালে, সেখানে মৈথিল ভাষার ব্যবহার ও চর্চা ছিল। সুতরাং এইরূপ দুই-একটি মিশ্রণ

খুবই স্বাভাবিক। (চর্যার ভাষায় অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের নিদর্শনের আলোচনা পরে দ্র.)।

যাহা হউক, প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক সীমা, বিভিন্ন অপভ্রংশের পরস্পর সাদৃশ্য, শৌরসেনীর আভিজাত্য ও প্রচারবাহুল্য, নেপালে গীতিগুলির অনুলিখন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চর্যাগীতির ভাষায় অন্যান্য অপভ্রংশের কিছু কিছু প্রভাব স্বীকার করিলেও, এই ভাষা যে বাংলা নয়,—এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা চলে না। অথবা এ সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না যে, চর্যার ভাষা ব্রজবুলির ন্যায় কোন মিশ্রিত কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা (দ্র. 'হাজার বছরের পুরাণো বাংলা ও বাঙ্গালী'—ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বিশ্বভারতী : ১৩৫৪)। কারণ সামান্য কিছু অন্য অপভ্রংশের প্রভাব বা মিশ্রণ থাকিলেও এ ভাষায় এমন কিছু নাই যাহা বাংলা ব্যাকরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। সামান্য শৌরসেনী থাকার জন্য যদি এই ভাষাকে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলিতে হয় তবে প্রচুর দেশী-বিদেশী শব্দ-মিশ্রিত আধুনিক বাংলা ভাষাকেও কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বলা উচিত।

চর্যাগীতির ভাষার ব্যাকরণগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিবিষয়ক

(i) প্রাকৃতের সমীভূত যুক্তব্যঞ্জন সরল হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়াছে। পূর্বস্বরের দীর্ঘত্ব অবশ্য মাঝে মাঝে লেখায় দেখান হয় নাই। যেমন মঝে = মাঝেঁ < মঝ.ঝেন < মধ্যেন। এগুলি লিপিকর-প্রমাদ অথবা অক্ষর-পরিবৃঢ়িতে দুই প্রকার শ্বাসাঘাতের রীতির জন্যও হইতে পারে। (পরে vi অনুচ্ছেদ দ্র.)। যুক্তব্যঞ্জনে প্রথমটি নাসিক্য থাকিলে পূর্বস্বর সানুনাসিক হইয়াছে। লেখায় কিন্তু মাঝে মাঝে নাসিক্য-ধ্বনি বজায় আছে অথবা পূর্বোক্ত সমীভূত যুক্তব্যঞ্জনই ব্যবহৃত হইয়াছে, সরলীকৃত একক ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন মন্তে, তন্তে, তান্তী ইত্যাদি অথবা সুজ্জ পাশাপাশি সুজ ইত্যাদি।

(ii) পদান্তের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইত, তবে অনেক সময়—ইঅ (-ইআ) এই যুক্তস্বর -ই (-ঈ)তে পরিণত হইয়াছে। ভণতি > ভণই, জলিত > জলিঅ ; আবার পুস্তিকা > পোত্থিআ > পোথী ; বুঝিঅ > বুঝি ; ভবিত > ভইঅ > ভই। পদান্ত 'ই' অনেকস্থলে লিপিতে 'অ' বা 'য়' হইয়াছে ; যেমন খাই = খাঅ, খায় ; জাই = জাঅ। এই ই/অ বিপর্যয় সম্ভবত তৎকালীন বাস্তব উচ্চারণের প্রতিফলন, কেবলমাত্র লিপিকর-প্রমাদ নহে।

(iii) প্রাকৃত ইত্যাদির মত দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন অনেক সময় উচ্চারিত হইত না। সকল > সঅল ; ভণতি > ভণই ইত্যাদি।

(iv) য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ; যেমন, নিকটে > নিয়ড্ডি (= নিঅড্ডি) ; আয়াতি > আবই (= আআই) ইত্যাদি।

(v) উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ-স্বর, তিন 'স', দুই 'ন' এবং 'জ' ও 'য' ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। যেমন এখনও নাই। লিপিতে একটির স্থানে অন্যটির ব্যবহার হইত, ইহা অনুমান করা চলে।

(vi) চর্যার যুগে অক্ষর পরিবৃঢ়িতে (accent system-এ) আদি এবং আদি-ভিন্ন অন্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত—এই উভয় রীতিই পাশাপাশি চলিত। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের উদাহরণ—সাঙ্কম, চান্দকান্তি, জালন্ধাবি, পণ্ডিআচাএ ইত্যাদি। আদি ভিন্ন অন্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত -অহারিউ, বপা, পতবাল, হথা, সমাঅ। একই শব্দেব দুই প্রকার বানান—সঙ্গ/সাঙ্গ, পঞ্চ/পাঞ্চ, মঝেঁ/মাঝেঁ, সমাঅ/ষামাঅ ইত্যাদি হইতেও উভয় বীতির শ্বাসাঘাতের যুগপৎ উপস্থিতি অনুমান করা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতেব জন্য অসুখ>আসুখ, অনুমান>আনুমান হইযাছে, অনুরূপ উদাহরণ কদাচিৎ চর্যাগীতিতেও মেলে—আদঅ = অদঅ, আইস = অইস।

(খ) রূপগত

(i) চর্যাগীতিতে ক্লীবলিঙ্গ নাই; তবে লিঙ্গ-সামঞ্জস্য বিষযে কডাকড়ি আধুনিক ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অতীতকালেব ক্রিযা প্রাযই স্ত্রীলিঙ্গ হইত—লাগেলি আগি। সম্বন্ধ-পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত এবং প্রযোজন মত স্ত্রীলিঙ্গ হইত—কাহেরি শঙ্কা, হাডেবি মালী। স্ত্রীলিঙ্গের সাধারণ বিশেষণ তো স্ত্রীলিঙ্গ হইতই, যেমন -নিশি অন্ধারী ইত্যাদি। শব্দ-রূপের ক্ষেত্রে একমাত্র ষষ্ঠী বিভক্তি ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। স্ত্রীলিঙ্গ-প্রত্যয হিসাবে ই (ঈ)-এর ব্যবহার ছিল বেশি। কদাচিৎ 'নি'-ও ব্যবহৃত হইত—শুণ্ডিনি।

(ii) দ্বিবচনের ব্যবহার নাই; একবচন ও বহুবচনে শব্দরূপে কোন পার্থক্য নাই। বহুত্ব বুঝাইবাব জন্য সকল, সব, জন, লোঅ, জাল অথবা কোন সংখ্যা-বাচক শব্দের প্রযোগ হইত—সকল সমাহিঅ, বিদুজনলোঅ, জোইনিজাল। শব্দদ্বৈত দ্বারাও বহুবচন করা হইত—উচা উঁচা পাবত; কেহো কেহো তোরে ইত্যাদি।

(iii) বিভিন্ন কারকের জন্য বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ব্যবহৃত হইত। প্রথমায় ও দ্বিতীযায় সাধারণত কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হইত না। তৃতীযায় এন>এঁ অথবা অন্ত>ত+এঁ = তেঁ, তে, এতে ইত্যাদি। চতুর্থীতে কে (<কৃত শব্দ-জাত 'ক'+এ) বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; যেমন বাহবকে = বাহিবার জন্য (অবশ্য বাহবকে-র নির্ভুল পাঠ 'বাহব কে' যদি হয়, তবে চতুর্থীতে কে বিভক্তির ব্যবহারের উদাহরণ নাই)। ২য়া/৪র্থীতে 'রে' 'রেঁ' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়—করিনিরে (৯), রসানেরে (২২)। কখনও 'এ', কখনও

বিনা বিভক্তিতে ২য়া/চতুর্থীর পদ গঠিত হইত। ৫মীতে অনেক সময় ৭মীর বিভক্তি ব্যবহৃত হইত—জামে কাম কি কামে জাম। ৬ষ্ঠীতে এর, অর, র বিভক্তি ব্যবহৃত হইত। ষষ্ঠীতে 'ক' বিভক্তির ব্যবহারও ছিল। ৭মীতে ই<এ, এ< অকে; হি<ধি, ত<অন্ত (ত্র?) এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার ছিল। ৭মীর বিভক্তি তৃতীয়ার সহিত একাকার হইয়া সানুনাসিক রূপ লইত (এঁ, তেঁ)। ৭মীর বিভক্তিগুলির ব্যবহার ছিল সর্বাধিক। কর্তৃ-ব্যতিরিক্তি বিভিন্ন কারকে এগুলি ব্যবহৃত হইত।

(iv) সর্বনামের রূপেও সাধারণত বিশেষ্যের বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইত। আহ্মে ও তুহ্মে বহুবচন-জাত হওয়া সত্ত্বেও একবচনে ব্যবহৃত হইত। মো (মম শব্দ-জাত) এবং মই ও তই (মযেন এবং ত্বযেন অর্থাৎ ময়া ও ত্বয়া শব্দজাত) কর্তৃকারকেও ব্যবহৃত হইত।

(v) বিভিন্ন কারক-বিভক্তি ছাড়াও বিনা, অন্তরে, মাঝ, দিআ, সম, সঙ্গ (সাঙ্গ) ইত্যাদি কারক-বাচী অনুসর্গের ব্যবহার ছিল। এগুলি আধুনিক কালের মত বিশেষ্য বা সর্বনামের অব্যবহিত পরে বসে যেমন ষিহে সম, তোএ সম, তোহোর অন্তরে।

(vi) নিম্নলিখিত সংখ্যা-শব্দগুলির ব্যবহার চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়—এক, একু, দুই, দু, দো, বেণি, তিণি, তিনি, তিনা, তিঅ, সংযোগে তি (তিহুঅণ, তিশবণ); চারি, সংযোগে চউ (চউদিশ). পঞ্চ/পাঞ্চ, ছয, অট, অঠ, নঅ, দশ, দহ, বতিশ, চউশঠী. চৌষট্‌ঠী, চউষঠ.ঠী, কোড়ি। পূরণবাচক সংখ্যা-শব্দ পহিল, দশমী, দ্বাদশ। সংখ্যা-শব্দগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভযরূপেই ব্যবহৃত হইত। বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে কদাচিৎ বিশেষ্যের কারক-বিভক্তিও সংখ্যা-শব্দে প্রযুক্ত হইত—একে শরসন্ধানে (৩যা); তিনিএ পাটে (৩য়া)। [কদাচিৎ অন্য বিশেষণেও এইরূপ প্রযোগ পাওযা যায—তোহোরে দোষেঁ (৩৯)]।

(vii) পুরুষ অনুসারে ক্রিয়া-রূপের পার্থক্য বজায় ছিল। বর্তমান কালের জন্য উত্তম পুরুষে মি এবং অহম্‌-জাত হুঁ যোগ করা হইত; মধ্যম পুরুষে সি অথবা অনুজ্ঞায -অ, -হ, -হু, -তু ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। প্রথম পুরুষে ক্রিয়া-বিভক্তি ছিল -ই<-তি এবং গৌরবে বহুবচন হইলে-ন্তি<-অন্তি এবং কদাচিৎ মৈথিলের প্রভাবে—থি। বোলথি, ভণথি।

ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে তব্য-জাত -ইব, মধ্যম পুরুষে স্যসি-জাত -হসি (মারিহসি, হোহিসি) এবং প্রথম পুরুষে স্যতি-জাত -হই>হ যুক্ত হইত।

শুধু 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত করিয়া অথবা তাহার সহিত -ইল (-এল) যোগ করিয়া অতীত কালের রূপ গঠিত হইত। লেখায় অনেক সময় 'ইআ'-যুক্ত অতীত অর্থাৎ শুধু 'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত রূপ দেখা গেলেও ছন্দের খাতিরে ও বৃত্তি অনুসারে অনেক ক্ষেত্রেই 'ইল' প্রত্যয়ান্ত রূপই প্রত্যাশিত। যেমন ফুলিআ = ফুলিলা (৫০)।

(viii) বর্তমান ছাড়া অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে প্রায়ই ক্রিয়াপদের কর্মভাববাচ্যে প্রয়োগ হইত। কর্তায় কখনও তৃতীয়া বিভক্তি, কখনও প্রথমা বিভক্তি ব্যবহৃত হইত। এই ধরনের ক্রিয়াপদ কর্তার বিশেষণ হিসাবে গণ্য হইত এবং প্রয়োজনমত স্ত্রী-প্রত্যয় যুক্ত হইত। আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা, চলিল কাহ্ন ; মই ভাইব ; লাগেলি আগি ইত্যাদি।

কর্মভাব-বাচ্যের (i) প্রত্যয়-নিষ্পন্ন এবং (ii) বিশ্লেষণাত্মক—উভয়বিধ রূপই চর্যাগীতিতে লক্ষণীয়। যেমন- (i) সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই, খুর ন দীসই, হরিণা হরিণীর নিলঅ ণ জাণী, পাবিঅই ; ছুহিএ, ছিজ্জউ (ii) ধরণ ণ জাই ; লেপ ন জাঅ ; ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাএ ইত্যাদি।

(ix) অসমাপিকার ব্যবহার ছিল তিন প্রকার (i) -ই এবং -ইঅ; -ইয়া -যুক্ত। যথা—করি, পুচ্ছি চড়ি, লইআ, ধরিঅ, মারিয়া ইত্যাদি। (ii) -ইলে-যুক্ত। যথা—চড়িলে, ভইলে, বুঝিলে, এবং (iii) -অন্তে-যুক্ত—পড়ন্তে, চাহন্তে, ইত্যাদি।

(x) সন্ধি, সমাস ও প্রত্যয়াদির দ্বারা পদগঠন-রীতির যে সমস্ত নিদর্শন চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় তাহা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হইতে আগত এবং প্রায়শ বাংলার আধুনিক রীতির মত। তবে চর্যাগীতিতে এগুলির প্রয়োগ খুব স্বল্পই। সন্ধির উদাহরণঃ ধামার্থে, অজরামর, ভাবাভাব, বালাগ (বালাগ্র) ইত্যাদি। সমাসের উদাহরণঃ দ্বন্দ্ব—রবিশশি, কমলকুলিশ, চান্দসুজ্জ, ঘণ্টানেউর, গন্ধপরসরস, দ্বিগু—তিশরণ, তিঅস, তিহুবণ, পঞ্চনালে ; কর্মধারয়—মহাতরু, মহাসুখ, ভাগতরঙ্গ, খররবি, তৎপুরুষ—নলিনীবণ, কমলরস, রবিকিরণ ; বহুব্রীহি—খমণভতারি ; রূপক—কাযাতরুবর, ভবণই, ভবজলধি, কাঅনাবড়ি, করুণামেহ, ইত্যাদি। রূপকের প্রয়োগই সর্বাধিক। কয়েকটি তদ্ধিত-প্রত্যয়ের প্রয়োগের উদাহরণও পাওয়া যায়। যথা, আ—(গরুআ, সরুয়া) ; আলি—(শববালি, ভাভরিআলী) ; আলু (নিদালু), ই, ইল, ইলা, উ—কাহ্নি, কাহ্নিল, কাহ্নিলা কাহ্নু) ; পণ—(ঘরপণ), বালী (বালি)—(অঙ্ক-বালী) ; ড়ি—(বাপুড়ী, বহুড়ী, নাবড়ী) ইত্যাদি। কৃদন্ত পদের উদাহরণও অনেক : পইঠ, দিঠা, জাণী, কিঅ, গউ, চলিঅ, ভাইব, হোইব, জীবন্তে, মঅলেঁ, ভান্তো, ইত্যাদি।

(গ) বাক্য-রীতি

চর্যাগুলি লিখিত নিদর্শন। সে যুগের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ঠিক কি ধরনের ছিল তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিখিত নিদর্শন হইতে পাওয়া সম্ভব নহে। অথচ বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির পরস্পর-অন্বয় ইত্যাদি ঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য স্বর (intonation) একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়। তাছাড়া, চর্যাগুলি কবিতা। কবিতায় ছন্দের খাতিরে অনেক সময় সাধারণ পদবিন্যাস-রীতির কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটানো হয়। পূর্বোক্ত এই দুটি কারণে চর্যার ভাষা হইতে সেযুগের

ভাষার পদবিন্যাস-রীতির সুস্পষ্ট ধারণা করার কিছু অসুবিধা আছে। তবুও যেটুকু অনুমান করা যায় তাহাতে চর্যার ভাষার বাক্যগঠন-রীতি যে নির্ভুল ভাবে বাংলার তাহা লক্ষ্য করা যায়। বাক্যের গঠন ও বাগ্‌বিধিগুলির ব্যবহারে আধুনিক বাংলার ধারা যে চর্যার ভাষার রূপ হইতে আগত তাহা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য প্রাচীন কর্ম-ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেই পরিবর্তন ভাষার ধারাবাহিকতার সূত্রে স্বাভাবিক। চর্যার যে-কোন পংক্তিকে গদ্যে পরিণত করিলে আধুনিক কালের পদবিন্যাস-রীতি হইতে তাহার কোন পার্থক্যই লক্ষিত হইবে না। যেমন - হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী = হরিণ হরিণীর নিলয় না জানে (জানে না), অথবা হরিণী বোলঅ হরিণা সুন হরিআ তো = হরিণী বলে হরিণকে, শুন হরিআ তুমি (= হরিণী বলে হরিণকে, শুন তুমি হরণকারী)।

চর্যায় ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক অন্বয় লক্ষ্য করিলে বাংলা ভাষার সাধারণ রীতির সহিত সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। নিম্নে কয়েকটি পদান্বয় রীতি আলোচিত হইল :

(i) বিশেষ্য-বিশেষণ অন্বয়—বাংলা ভাষার সাধারণ রীতি অনুযায়ী বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে। কদাচিৎ ছন্দানুবোধে বা অন্য কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। চর্যাতেও অনুরূপ রীতি লক্ষণীয়। যথা, চঞ্চল চীএ (১), নিঅড জিণউর (১২), পরম মোখ (১২) ; কিন্তু নিশি অন্ধারী (২১) ; কাহ্ন আসব-মাতা (৯)। কৃদন্ত, সর্বনামীয় এবং সংখ্যাবাচক বিশেষণের ক্ষেত্রেও বিশেষণ সর্বদাই পূর্বে অবস্থিত। এই জাতীয় বিশেষণগুলির পরনিপাতের উদাহরণ চর্যায় নাই। যথা বেটিল হাক (৬), দুহিল দুধু (৩৩), গেলী জাম ; অইসন চর্যা (২), বতিস তান্তি (১৭) ইত্যাদি।

(ii) সম্বন্ধপদের অন্বয়ও সাধারণ বাংলা রীতি অনুসারী। এক্ষেত্রেও কচিৎ ব্যতিক্রম ছন্দের প্রয়োজনে সম্ভব। যথা, রুখের তেন্তলি (২) ; পাটের আস (১), তো মুহ (৪), মো হিঅহি (৭)। কিন্তু ব্যতিক্রম, বাষনা তোরা (৪১) ; মেরি...বাড়ী (৫০)।

(iii) নঙ অর্থক অব্যয় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত পরে বসে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষার সাধারণ রীতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। যেমন কাহ্ন নাহি (৪২), ভাত নাহী (৩৩), সো...নাহি (২০)। কিন্তু ব্যতিক্রম নাহি বিশেষ (৪৯), নাহি বিছণালী (১৮), নাহি পড়বেষী (৩৩)। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি নঙ্‌ অর্থক অব্যয়ের পূর্ব নিপাত—ন জাণী (৬), ন ছাড়অ (৬), ন চ্ছুপই (৬), ন দীসঅ (৬) ; মা হোহী (৫) ; মা কর (২৮), ম জাহী (৫)। বলা বাহুল্য ইহা বাংলা ভাষার আধুনিক প্রচলিত রীতি নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এরূপ রীতি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ব্যতিক্রমের উদাহরণ চর্যাতেও আছে,—পিবই ন (৬)।

(ঘ) শব্দাবলী

চর্যার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চর্যায় যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হইযাছে তাহা তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম—এই তিন শ্রেণীর। তবে বানানে নানা প্রকাব শৈথিল্য লক্ষ্য কবা যায। তৎসম শব্দের বানানেও এই শৈথিল্য অনুপস্থিত নহে। একই শব্দের বানানেও নানা প্রকার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায। বানানের এই বৈচিত্র্যের জন্য নানা কারণ অনুমান করা চলে। ২৬ সংখ্যক চর্যায 'সান্তি' ও 'শান্তি' দুই প্রকার বানানই লক্ষ্য করা যায। সহজেই অনুমেয়, এই জাতীয় বিভিন্নতা লিপিকর-প্রমাদজনিত। তবে পঞ্চ/পাঞ্চ, অইস/আইস, মঝ/মাঝ, কবালী/কাবালী, ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণ অক্ষরপরিবৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করা উচিত। পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি (ক/vi) শ্বাসাঘাতের দুই প্রকার রীতিই চর্যার যুগে প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর বানান-বিভিন্নতায সেই রীতি-দ্বিধার প্রতিফলন। কতকগুলি বানানে সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জন অথবা সরলীকৃত রূপ—দুইই দেখা যায। যেমন—নিযড্ডি/নিযড়ি, বিমুক্কা/বিমুক ; সুজ্জ/সুজ, বিহুন্নে/বিহুনে, ইত্যাদি। এই জাতীয বিভিন্নতা সম্ভবত ভাষার মধ্যে পরিবর্তন-যুগের সাক্ষ্যবহ। হযত মুখের ভাষায় যুগ্ম-ব্যঞ্জনের সরলীকৃত রূপ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু লেখায মাঝে মাঝে প্রাচীনতার প্রবণতা দেখা দেওযার ফলে যুগ্মব্যঞ্জন রহিয়া গিয়াছে।

চর্যাগীতির ভাষা কোন্ উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত ?

চর্যার ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার কযেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিযা, সম্ভবত ইহা পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিযা সুনীতিকুমার মন্তব্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) গৌণকর্মে 'রে' অপেক্ষা 'কে' ব্যবহারের প্রাচুর্য। 'রে' কেবলমাত্র দুবার ব্যবহৃত।

(খ) 'সাথ' অনুসর্গের পরিবর্তে 'সাঙ্গ' বা 'সম' অনুসর্গেব ব্যবহার।

(গ) পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে দুটি উক্তি যাহা খুব শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নহে।[১]

এই বৈশিষ্ট্যগুলির যাথার্থ্য বিচার করিবার পূর্বে উপভাষা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রযোজন। একথা স্বীকার্য মধ্য ও আধুনিকযুগের প্রায়

---

১. The language of the Caryās seems to be based on a West-Bengal dialect. Some of its forms belong rather to West Bengal than to East Bengal : e g. the use of the-K-affix for the dative rather than-r-, the latter occuring in two instances only ; the employ of the post position (Sãnga) and (sama) rather than (satha) which would be preferred in East Bengal. There are two remarks on the people of East Bengal which do not show any admiration for them ;—
ODBL p 117

সমস্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ভাষা পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভাষার আদিযুগ এবং কিছু পরিমাণে মধ্যযুগ সম্পর্কেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। উপভাষা বিভাগ ব্যাপারটি আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য—উপভাষা বৈচিত্র্য ভাষার আধুনিক যুগের লক্ষণ। সুনীতিকুমার নিজেই বলেছেন: A classification of the Bengali dialects is to be, in the first instance, from the stand point of Modern Bengali. (ODBL p 136)। মধ্যযুগের স্তর পর্যন্ত সাহিত্যে আঞ্চলিক ভাষাধর্ম বলিয়া কিছু গড়িয়া উঠে নাই। ইহাতে ছিল সমগ্র বাঙালির সাধারণ সম্পদ অর্থাৎ ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল আঞ্চলিক লক্ষণাবলীর সমবায়ে গঠিত। সুতরাং বাংলাভাষার প্রাচীনযুগে উপভাষাগত পার্থক্যানুসন্ধান খুব সার্থক হইতে পারে না—ড. চট্টোপাধ্যায় নিজেই অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন (দ্র. ODBL p 136)। সুতরাং চর্যার ভাষা পশ্চিম অথবা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিচার খুব প্রয়োজনীয় নহে। অবশ্য ড. চট্টোপাধ্যায়ও 'seems to be' বলিয়া তাঁহার বক্তব্যকে অনুমানের পর্যায়ে রাখিয়াছেন। যাহা হউক, এবার ড. চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করা যাক।

আধুনিক উপভাষা লক্ষণের দিক দিয়া বিচার করিলে 'সঙ্গে' এবং 'সাথে' এই দুটি অনুসর্গের মধ্যে বঙ্গালীতে 'সাথে'-র ব্যবহারই সুলভ, 'সঙ্গে'র নহে। 'সম' রাঢ়ী, বঙ্গালী কোন উপভাষাতেই কথ্য রূপে প্রচলিত নাই—কেবল কবিতায় চলে। চর্যায় 'সম' উপসর্গের ব্যবহার আছে দুবার (১০, ৩৩)। সঙ্গ, সাঙ্গ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চর্যায় বার পাঁচেক। এগুলির মধ্যে কয়েকটি শব্দ হিসাবে (অনুসর্গরূপে নহে) ব্যবহৃত। অর্থ– সাঙ্গা (স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস, সঙ্গম, সঙ্গ (Company) ইত্যাদি। সুস্পষ্ট অনুসর্গরূপে শব্দটির ব্যবহার একবার কি দুবার। সংখ্যা যাহাই হউক, একথা স্বীকার্য সাথের ব্যবহার চর্যায় একবারও নাই। কিন্তু আধুনিক কালেও সাথে ও সঙ্গে কি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষায় জল-অচল বিভাগে বিচ্ছিন্ন? দিয়া, করিয়া, মাঝে, পাশে, কাছে প্রভৃতি কোন অনুসর্গই কি আঞ্চলিক? নাকি সমগ্র বাংলার বৈশিষ্ট্য যাহা মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। (দ্র. বাঙলা ভাষা পরিক্রমা, পরেশচন্দ্র মজুমদার পৃঃ ১৪২)।

এবার 'ক' বিভক্তি সম্পর্কিত ড. চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য আলোচনা করা যাক। একথা ঠিক, আধুনিক কালে বঙ্গালীতে 'কে' বিভক্তির পরিবর্তে 'রে' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চর্যাগীতিতে কোথাও দ্বিতীয়া-চতুর্থীতে 'ক' বা 'কে' ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 'ক'-যুক্ত প্রত্যেকটি প্রয়োগই [ছন্দক (১), করণক (১), ঠাকুরক (১২), নাশক (২১), পথক (৩৭)] ষষ্ঠীর। অবশ্য ঠাকুরক (১২) এবং নাশক (২১)-কে ২য়া ও ৪র্থীর বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়। 'অঠকমারী'র

(১৩) নির্ভুল পাঠ সন্দেহাতীত নহে। টীকা অনুসারে পাঠ 'অঠ কুমারী'। 'কুঁ'-যুক্ত মকুঁও ষষ্ঠী বিভক্তির পদ। কে-যুক্ত মহিকে (৮) এবং বাহবকে (৮) প্রভৃতির নির্ভুল পাঠ সম্পর্কে মতভেদ আছে। 'মহিকে' পাঠ ধরিলে অর্থসঙ্গতির জন্য পদটি ষষ্ঠ্যন্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যদি 'বাহবকে' পাঠ ধরিয়া 'বাহিরের নিমিত্ত' এই অর্থ করা হয়, তাহা হইলে ৪র্থীতে কে বিভক্তির ব্যবহারের নিদর্শন একবার পাওয়া গেল। অর্থাৎ সন্দেহজনক পাঠগুলি হিসাবের মধ্যে ধরিলেও 'ক' এবং 'কে' মিলাইয়া তিনবার প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যদিকে 'রে' বিভক্তির ব্যবহার বিশেষ্য পদেই তিনবার—কবিণিরে (৯), বিষযরে (১৬), বসানেরে (২২)। এগুলির মধ্যে বিষযরে ও বসানেরে প্রসঙ্গ অনুসারে ষষ্ঠ্যন্ত রূপেও ব্যাখ্যা করা চলে। তবে সর্বনামগুলিতে ২য়া/৪র্থীতে সর্বত্রই 'রে' ব্যবহৃত হইয়াছে। একবারও 'কে' ব্যবহৃত হয় নাই। প্রয়োগের সংখ্যা ৪ বারের কম নহে। ড. চট্টোপাধ্যায় সর্বনাম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। যাহা হউক প্রয়োগ-সংখ্যার দিক দিয়া 'রে'-র পাল্লাই বেশি ভারী। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন গৌণকর্মের কে/রে বিভক্তির আঞ্চলিক বিভাজন আধুনিক কালের। মূলত এগুলি ছিল 'pan Bengali' বৈশিষ্ট্য। ড. চট্টোপাধ্যায়ের নিজের ভাষায়: The Bengali dialects can not be referred to a single primitive Bengali speech, but they are derived from various local forms of late Māgadhi Apabhranśa which developed some common characteristics that may be called pan Bengali eg...-ke, -re for the dative these pan Bengali features link the dialects together as members of a single group, and enabled them to be attached to a composite literary language as a matter of course (ODBL p 139) অন্যদিকে ৭মীতে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের উপভাষায় অচল। অথচ চর্যায় 'এ' বিভক্তির পাশাপাশি বেশ কয়েকবার 'ত' ব্যবহৃত হইয়াছে—সাঙ্কমত (৫), বাটত (৮।৩৮), মাঙ্গত (৮), দুআরত (৩) গীবত (২৮) গঅণত (২৮,৫) টালত (৩৩), হাড়ীত (৩৩) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া 'ধরণ ণ জাই' (ধরণ যায় না) কহন ণ জাই (কহন যায় না) জাতীয় উক্তি নিঃসন্দেহে আধুনিক বঙ্গালীর।[১] সুতরাং চর্যাগীতিতে বঙ্গালী উপভাষার নিদর্শনও প্রচুর।[২]

১. In Modern Standard Bengali the construction [অন্+যা] is falling into disuse, but it is fully preserved in the East Bengali dialect.—(ODBL p 129.)

২. বস্তুত ভাষার আঞ্চলিক লক্ষণ হিসাবে ২য়া/৪র্থীতে কে অথবা রে, কিম্বা ৭মীতে ত বা এ, অথবা বহুভাষিত কর্মভাব বাচ্য চর্যা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখন পর্যন্ত ঐগুলি পাশাপাশি চলিত।

চর্যাগীতির দুই স্থানে (গীতিসংখ্যা ৩৯।৪৯) পূর্ববঙ্গীয় লোকদের সম্পর্কে কিছু উল্লেখ আছে। উক্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় নহে। ড. চট্টোপাধ্যায় বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন। গীতি-দুটি পশ্চিমবঙ্গীয় কোন কবি দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। তবে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। কারণ পদকর্তা সরহ ও ভুসুকুর বাড়ী কোথায় ছিল জানা যায় না। একটি 'বঙ্গালে'র পাঠান্তর দঙ্গালে (৪৯।২)। অন্যটি সম্পর্কে বলা যায়, উক্তিটি ঠিক অশ্রদ্ধার নাও হইতে পারে। অন্যত্র 'বঙ্গাল' রাগ হিসাবে উল্লিখিত আছে। তাহা ছাড়া, আপাত-অর্থের অন্তরালে উদ্দিষ্ট অর্থ অন্য প্রকার হওয়াই চর্যাগীতির পক্ষে স্বাভাবিক। আর বিষয়বস্তু বিচার করিয়া ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ও খুব সমীচীন নহে। সেদিক দিয়াও পূর্ববঙ্গের দাবি খুব কম নহে। পউআ-খালের বিশেষ উল্লেখ, খাল-বিখাল নদী মাতৃকতা, আসাম-সীমান্তে হাতী ধরার বিষয় ইত্যাদিতে পূর্ববঙ্গীয় জীবন-যাত্রার নির্ভুল ইঙ্গিত। (দ্র. চর্যাগীতির সমাজ-পরিবেশ অধ্যায়।) কয়েকজন পদকর্তাও নিশ্চিতভাবে পূর্ববঙ্গীয়। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গে কম ছিল না। সুতরাং চর্যাগীতির উপর পূর্ববঙ্গীয় প্রভাবের দাবিও খুব কম নহে।

বস্তুত গঠনযুগের সেই ভাষায় উপভাষাগত পার্থক্য খুবই কম ছিল। কিন্তু যেটুকু ছিল তাহার পরিচয় চর্যাগীতিতে মেলে এবং চর্যাগীতিতে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শন বিদ্যমান। পরবর্তী কালে ড. সুকুমার সেন ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিকেরা চর্যাগীতিতে বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনের উপস্থিতির কথা স্বীকার করিয়াছেন।[১]

সন্ধ্যাভাষা/সন্ধাভাষা

শাস্ত্রীমহাশয় সহজিয়া ধর্মের তত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এই ধর্মের সব বই সন্ধ্যাভাষায় লেখা। প্রসঙ্গত তিনি সন্ধ্যাভাষার অর্থ করিয়াছিলেন, 'আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উঁচু-অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটি অন্য ভাবের ইঙ্গিত আছে।' (বৌদ্ধগান ও দোহা, মুখবন্ধ ২য় সং পৃ ৮)। সন্ধ্যাভাষার তাৎপর্য হিসাবে শাস্ত্রীমহাশয় বাহ্যিক অর্থের অন্তরালে অন্য কোন উদ্দিষ্ট অর্থের প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যা নামটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে একটি ধারণার কথাও প্রকাশ করিয়াছেন। মুনিদত্ত তাঁহার টীকায়

১. ভাষার ইতিবৃত্ত, একাদশ সংস্করণ, পৃ ১৬৫।

বহু স্থানে সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যা বচন ইত্যাদিব উল্লেখ কবিয়াছেন, স্থতরাং সন্ধ্যা-ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা প্রাসঙ্গিক। বিশেষত পববর্তী কালে, শাস্ত্রীমহাশয সন্ধ্যাভাষা সম্পর্কে যাহা বলিযাছেন তাহা যথার্থ নহে, নামের বানানটি সন্ধ্যা না হইযা সন্ধা হওয়া উচিত—এই জাতীয বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হইযাছে। স্থতরাং বিচাব কবিযা দেখা যাক সন্ধ্যা শব্দটিব প্রকৃত তাৎপর্য কি, নামেব বানানই বা কি হওযা উচিত এবং পুথিতেই বা কিভাবে শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাষাব নাম হিসাবে সন্ধ্যা শব্দটি প্রযুক্ত হইলেও, সন্ধ্যা কোন স্বতন্ত্র ভাষাব নাম নহে, একটি বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক প্রযোগবীতি মাত্র। ভাষাব কিছু কিছু বিশিষ্ট শব্দ নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থে বা পবিচিত পাবিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত না হইযা অন্য কোন প্রতীক অর্থে প্রযুক্ত হইতে পাবে। কোন্ শব্দটি কি অর্থে প্রযুক্ত হইবে তাহা সম্প্রদাযেব মধ্যে পূর্ব-নির্দিষ্ট। তান্ত্রিক ধর্মাচবণে গোপনীযতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইহাব জন্যই সম্ভবত ভাষাব এই সাঙ্কেতিক প্রযোগবীতি। বিশেষত তান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনেক সময যৌন যৌগিক আচাব অনুষ্ঠান থাকে, যাহা স্পষ্টভাষায প্রকাশ্যে বলা চলে না। সেই কাবণেও এই সন্ধ্যাবীতিব উদ্ভব হইতে পাবে। উৎপত্তিব কাবণ যাহাই হউক, সন্ধ্যাব প্রকৃত তাৎপর্য—সাঙ্কেতিকতা অর্থাৎ Code language-এব মত, শব্দেব পবিচিত অর্থেব পবিবর্তে উদ্দিষ্ট অন্য কোন অর্থে শব্দটির প্রযোগ। হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে সন্ধ্যা ভাষাব আলোচনা বা সন্ধ্যাশব্দাবলীব প্রতীক অর্থেব তালিকা থাকিলেও সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা সেখানে নাই। তবুও আলোচনা হইতে বোঝা যায বৌদ্ধতান্ত্রিকদেব মধ্যে প্রচলিত একপ্রকাব সাঙ্কেতিক বাচনবীতিব নামই সন্ধ্যা। এই সাঙ্কেতিকতা মূলত 'সময' অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধনায নবনাবীব মিলনবিষযক। অর্থাৎ সন্ধ্যা = 'সময়সঙ্কেত।' হেবজ্রতন্ত্রেব সন্ধ্যাশব্দাবলীব তালিকা বিশ্লেষণেও ইহাব সত্যতা উপলব্ধি কবা যায। হেবজ্রতন্ত্রে তাই বলা হইযাছে 'সন্ধ্যাভাষং মহৎভাষং সময়-সঙ্কেত বিস্তবম্।' সন্ধ্যা শব্দটিব তাৎপর্য সম্পর্কে শাস্ত্রীমহাশযের উক্তিতে তাই বিশেষ কোন ভুল নাই।

শব্দটিব ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয যে আলোচনা করিযাছেন তাহাতে মনে হয, দিবাবাত্রিব মিলনস্থল সন্ধ্যাব আলোআঁধাবি স্বরূপেব সাদৃশ্যে এই ভাষাব নামকবণ হইযাছে সন্ধ্যা। বিধুশেখব ভট্টাচার্য মহাশয এই ব্যাখ্যায আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহাব মতে সন্ধ্যাব অর্থ আভিপ্রাযিক বা নেযার্থ বচন, ইংবাজিতে বলা চলে, intentional language। সম্ – √ ধা + ঙ এইরূপে ব্যুৎপত্তি নির্ণয কবিযা তিনি সন্ধ্যাব পরিবর্তে সন্ধা শব্দটি ব্যবহাবেব পক্ষপাতী।[১] প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন কবিযাছেন এবং তাঁহার ধারণা, তান্ত্রিক পুথিতে সর্বত্র যে সন্ধ্যা বানান ব্যবহৃত হইযাছে তাহা লিপিকব-প্রমাদ।[২] অভীষ্ট

১ বিধুশেখরের মন্তব্য Indian Historical Quarterly 1928-দ্র.।
২ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতামত Studies in the Tantras গ্রন্থে পৃ. ২৭ দ্র.।

৩

বা আভিপ্রায়িক অর্থের মধ্যে 'আপাতলক্ষ্য নহে' এরূপ একটি ইঙ্গিত আছে। তাহা হইতে অস্পষ্টতার ভাবটি আসিয়াছে এবং তাহার প্রভাবে অর্থ-সাদৃশ্যে বানানটি সন্ধা হইতে সন্ধ্যাতে পরিবর্তিত হইয়াছে—ইহা অসম্ভব নহে। তবে 'সন্ধ্যা' বানানে শব্দটি তান্ত্রিক গ্রন্থাদিতে এত প্রচুর ব্যবহৃত হইয়াছে যে ব্যাপক লিপিকর-প্রমাদ কল্পনা করা দুরূহ। তান্ত্রিক গ্রন্থ-রচয়িতাদের সন্ধার পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। তবুও ব্যাপকভাবে সন্ধ্যাই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই মনে হয়, শাস্ত্রীমহাশয় যে আলংকারিক ব্যাখ্যায় ব্যুৎপত্তি অনুমান করিয়াছিলেন, সেভাবে যদি নাও হয়, বানানটি বোধ হয় সন্ধ্যাই হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন, সন্ধ্যা শব্দের অর্থ তো শুধু দিবারাত্রির সঙ্গম নহে, সম্যক ধ্যায়তে অস্যাম্ ইতি সন্ধ্যা। তাহা হইতে, যে অর্থ অনুধ্যান করিয়া বুঝিতে হয়, তাহাই সন্ধ্যা—এইরূপেও সন্ধ্যার ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে। প্রসঙ্গত, সন্ধ্যা ভাষা, সন্ধ্যাদেশের ভাষা (অর্থাৎ আর্যাবর্ত ও পূর্বভারতের সন্ধিস্থল বীরভূম সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমাংশের ভাষা) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কল্পনার পশ্চাতে কোন প্রামাণিকতা নাই।

চর্যাগীতির সর্বত্রই যে অস্পষ্ট হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে। কতকগুলি কবিতা আছে যাহার প্রায় সবটাই সন্ধ্যা ভাষায় রচিত। যেমন ২ ও ৩৩ সং চর্যা। অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক চর্যায় অংশবিশেষ সন্ধ্যাভাষিত অথবা কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শব্দ সন্ধ্যা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিছু কবিতা আছে যাহাতে পারিভাষিক শব্দ কিছু থাকিলেও সন্ধ্যা অর্থে প্রযুক্ত কোন শব্দই নাই। যেমন চর্যা সং ৩৫, ৪০, ৪২ ইত্যাদি। যেসমস্ত গীতিতে তান্ত্রিক পদ্ধতির আলোচনা আছে সেখানে সন্ধ্যার প্রয়োগ বেশি; আর যেগুলিতে দার্শনিকতার প্রতি ঝোঁক বেশি সন্ধ্যার প্রয়োগ সেখানে খুব কম। টীকাকার মুনিদত্ত গীতিগুলির ব্যাখ্যায় সন্ধ্যা-ভাষিত উক্তিগুলির সরলার্থ বা সম্প্রদায়গত অর্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সন্ধ্যাভাষয়া, সন্ধ্যাবচনেন, সন্ধ্যাসংকেতে, সন্ধ্যাজ্ঞানেন, বা কেবল সন্ধ্যয়া যেমন ব্যবহার করিয়াছেন তেমনি ধ্যানেন, দ্বারেণ, শব্দান্তরেন, ব্যাজেন ইত্যাদিও ব্যবহার করিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভে প্রথম বাক্যে যেমন ইহার উল্লেখ আছে তেমনি টীকার মধ্যেও কবিতার অংশবিশেষ বা বিচ্ছিন্ন কোন শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও পূর্বোক্ত শব্দাবলীর কোনটির উল্লেখ আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চর্যাগীতির ভাষার এই অস্পষ্ট হেঁয়ালিভাব শুধু এগুলিরই বৈশিষ্ট্য নহে। মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকদের সকলের কবিতাতেই ভাষার এই হেঁয়ালিভাব। কবীর, দাদু, বাংলার সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল, নাথপন্থী প্রভৃতি সকলের সঙ্গীতের ভাষাই কমবেশি একপ্রকার, উপমা উৎপ্রেক্ষাও এক, হেঁয়ালিপনাও এক।[১]

১. ৩৩ সং চর্যার টীকার উদাহরণ দ্র.।

৪ আঙ্গিক-প্রকরণ

গঠনরীতি

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' প্রকাশ করিবার সময় শাস্ত্রীমহাশয় মুখবন্ধে বলিয়াছিলেন, পুথিখানির নাম 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' আর গানের নাম 'চর্য্যাপদ'। পরে কেহ কেহ সমগ্র গীতিটি বুঝাইতে 'চর্যাপদ' বা পদ শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে 'পদ' বলিতে দুইটি চরণ বা 'Couplet'-কে বুঝায়। পুরাপুরি কবিতাকে বুঝায় না। চর্যাটীকাকারও পদ বলিতে সমগ্র কবিতাটিকে না বুঝাইয়া দুইটি চরণকেই বুঝাইয়াছেন। এ বিষয়ে প্রথমে ইঙ্গিত করেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। চর্যাগীতির ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, "Couplets in the vernacular or Apabhransa were known as<pada>in old Bengali, as we can see from the Sanskrit commentary to the Caryās" (O BL, p 288)। পরে ড সুকুমার সেন মহাশয়ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন —চর্যাগুলি পদাকারে গঠিত গীতি।

সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের দিক দিয়া কথাটি ঠিক বটে কিন্তু নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের দিক দিয়া পদ শব্দের অর্থ অন্যপ্রকার। নাট্যশাস্ত্রে পদবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

গান্ধর্বং যন্ময়া প্রোক্তং স্বরতাল পদাত্মকম্।
পদং তস্য ভবেদ্বস্তু স্বর তালানুভাবকম॥
যৎকিঞ্চিৎ অক্ষর কৃতম্ তৎ সর্বং পদসংজ্ঞিতম।
নিবদ্ধানিবদ্ধঞ্চ তৎপদং দ্বিবিধং স্মৃতম॥—৩২ অধ্যায়

অর্থাৎ অক্ষরকৃত গানের বস্তুকেই পদ বলিত। ইহা ছাড়া সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পদের একটি বিশেষ অর্থ আছে। 'প্রবন্ধ-সঙ্গীতের' (সঙ্গীতের একটি শ্রেণী) উপাদান স্বরূপ ৬টি অঙ্গের মধ্যে পদ অন্যতম। সেখানে পদ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ বলিয়াছেন 'অর্থপ্রকাশকং পদং'। ইহা হইতেই বুঝা যায় গানের 'বস্তু'ই পদ শব্দে উদ্দিষ্ট। আধুনিক সঙ্গীতের ভাষায় যাহাকে বলা যায় গানের 'বাণী', তাহাই পদ। নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রে পূর্ণাঙ্গ গীতিটি বুঝাইতে পদ শব্দ ব্যবহারের বিশেষ সার্থকতা আছে। সাধারণ কাব্য-শাস্ত্রেও পদ বলিতে পূর্বে Couplet বুঝাইলেও পরে খণ্ড কবিতা অর্থাৎ অনিবদ্ধ বা মুক্তক কবিতাকেই বুঝাইত। ইহার প্রমাণ শুধু সাধারণ লোকেদের মুখেই নহে, বহু সুধীজনের লিখিত উক্তির মধ্যেও আছে। সুতরাং সে সকল বিচার করিয়া মনে হয়, কখনও কখনও পদ বলিতে পূর্ণাঙ্গ গীতিটিও বুঝানো হয়। তবে চর্যার পুথিতে পূর্ণাঙ্গ গীতি বুঝাইতে চর্যাশব্দটির ব্যবহার থাকিলেও চর্যাপদ শব্দের

ব্যবহার নাই। চর্যার টীকার অন্য যে গ্রন্থগুলির নাম পাওয়া যায় তাহাতেও দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত মানসোল্লাস নামক গ্রন্থে চর্যার লক্ষণ উল্লিখিত আছে—

অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদদ্বিতয়শোভনঃ।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে॥

'অর্থ অধ্যাত্মবিষয়ক, মিল আছে দু-তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশেও এমনি। তাহাকে বলে চর্যা।' (সুকুমার সেনের অনুবাদ।) ইহা হইতেও চর্যার লক্ষণ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা করা চলে। তবে লক্ষণীয় এখানে উত্তরার্ধের স্বতন্ত্র উল্লেখ হইতে অনুমান করা চলে—চর্যায় দুটি ভাগ থাকিত। অধুনাপ্রাপ্ত চর্যাগুলি হইতে সেই সুস্পষ্ট বিভাগ আজ আর সম্ভব নয়। তবে ভণিতা রীতি হইতে এই ধরনের বিভাগ যে একদা ছিল তাহা অনুমেয়। ভণিতা আলোচনা প্রসঙ্গে (১ম অধ্যায়) দেখিয়াছি অনেক চর্যাতেই দুবার ভণিতা থাকিত—সাধারণত ৪র্থ চরণে (কদাচিৎ ৫ম, ৬ষ্ঠ চরণেও) এবং শেষ পদে ৯ম/১০ম চরণে। যেসব চর্যাতে সুস্পষ্ট ভণিতা থাকিত না সেসব ক্ষেত্রেও কবির নামোল্লেখ থাকিত উক্ত চরণগুলিতে। এই দুইবার ভণিতা চর্যার দেহ গঠনে দুটি বিভাগের ইঙ্গিতবহ। অর্থের দিক হইতেও কোন কোন চর্যাতে দুটি অস্পষ্ট বিভাগ অনুমেয়। যেমন ১ম চর্যায় প্রথম চার চরণে মূলতত্ত্বকথা, পরবর্তী ছটি চরণে কি করণীয় তাহার উপদেশ। বলা বাহুল্য—এ বিভাগ সর্বদা সুস্পষ্ট বা সুনিয়মিত নহে। তবুও চর্যার দেহগঠন, আলোচনায় এই পূর্বার্ধ উত্তরার্ধ বিভাগও উল্লেখ্য। স্বভাবতই সনেটের দেহগঠন অক্টেভ সেস্টেট-এর বিভাগের কথা মনে আসে। পূর্ণাঙ্গ গীতি বুঝাইতে তাই চর্যাপদ অপেক্ষা চর্যাপদাবলী বা চর্যাগীতি শব্দগুলি অধিকতর সঙ্গত, ইহা স্বীকার্য।

অনিয়মিত দৈর্ঘ্যের, অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ৮ হইতে ১৪টি পংক্তি লইয়া চর্যাগীতি-গুলি গঠিত। ১০/১২টি পংক্তি লইয়া পদাবলীর আকারে খণ্ড কবিতা রচনার রীতি বৈষ্ণব পদাবলী ইত্যাদিতেও অনুসৃত হইয়াছে। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে কাহিনীগত যে পারম্পর্য আছে চর্যা পদাবলীতে তাহা প্রত্যাশিত নহে; কিন্তু পদাকারে দেহগঠন উভয়ক্ষেত্রে এক। পংক্তি সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে, প্রাপ্ত গীতিগুলির মধ্যে ১০ পংক্তির চর্যাই সর্বাধিক। (১৪ পংক্তির তিনটি (১০, ২৮, ৫০), ১২ পংক্তির দুটি (২১, ২২) এবং ৮ পংক্তির মাত্র একটি (৪৩) ছাড়া চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে সবগুলি কবিতাই ১০ পংক্তির।) দুটি পংক্তিতে একটি পদ ধরিলে চর্যাগুলি ৪ হইতে ৭টি পদের সমষ্টি। টীকায় কিন্তু এভাবে পদসংখ্যার হিসাব করা হয় নাই। সেখানে পদসংখ্যার হিসাব হইতে ধ্রুবপদটিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি লইয়া গঠিত পদটিকে ধ্রুবপদ হিসাবে গণ্য করিয়া পদসংখ্যার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে-কোন গীতির প্রথম দুই পংক্তি

লইয়া ১ম পদ, তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিদ্বয়ে ধ্রুবপদ; অতঃপর প্রতি দুই পংক্তি লইয়া যথাক্রমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ পদ ইত্যাদি বলিয়া টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। দুটি কবিতার টীকায় ইহার ব্যতিক্রম আছে (২৮, ৪৩)। এ দুটির টীকায় স্বতন্ত্রভাবে কোন ধ্রুবপদের উল্লেখ নাই। টীকার মধ্যে লেখা আছে 'পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদ বোদ্ধব্যং' অর্থাৎ একটি পদ গীত হইবার পর পূর্বপদ ধুয়ার মত গীত হইত। ইহার ফলে প্রত্যেকটি পদই ধ্রুবপদ বলিয়া গণ্য হইত। টীকায় দুটি মাত্র গান সম্পর্কে এই রীতির উল্লেখ থাকিলেও মূলগানে প্রত্যেকটি গীতিতে সব পদই ধ্রুবপদ হিসাবে চিহ্নিত। এটি মনে হয় চর্যাগীতির গঠনভঙ্গির স্বাভাবিক রীতি নহে। কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকিলেও গানে সাধারণত একটি পদই ধ্রুবপদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই রীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গায়েন রীতিতেও দেখা যায় কীর্তন ইত্যাদিতে ধ্রুব অংশ সম্মেলক ও অন্য অংশ একক গাওয়া হয়। সব পদই ধ্রুবপদ হইলে সম্পূর্ণ গীতিটি সম্মেলক গাহিবার রীতি। তাই মনে হয়, টীকাকার-প্রদর্শিত একটি পদ ধ্রুবপদ ইহাই চর্যার সাধারণ গঠনভঙ্গি। মূলগানে সবগুলি পদ ধ্রুবপদ হিসাবে চিহ্নিত, ইহা হয় লিপিকর-প্রমাদ, না হয় গায়েন রীতির বিবর্তনসূচক।[১]

চর্যায় ভণিতা দিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। চর্যার গঠনে ভণিতা অন্যতম উপাদান। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ১ম অধ্যায়ে ভণিতা, কবিনামাবলী ও কবিপরিচয় প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে।

চর্যাগীতিগুলি তখনকার দিনে সঙ্গীত জগতেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকরে' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সঙ্গীত হিসাবে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে এবং সেখানে ইহার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা আছে। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকরে 'প্রবন্ধ' অধ্যায়ে চর্যার বর্ণনা করিয়াছেন—

> পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
> অধ্যাত্মগোচরা চর্য্যা স্যাদ্ দ্বিতীয়াদি তালতঃ॥

পদ্ধড়ী অর্থাৎ পজ্ঝটিকা প্রভৃতি ছন্দে, পাদান্ত্যানুপ্রাসযুক্ত চরণে গঠিত এবং অধ্যাত্মগোচরা অর্থাৎ অধ্যাত্ম বিষয়ক, ইহাই চর্যা। পরবর্তী কালে সঙ্গীত রত্নাকরের টীকাকারেরাও চর্যা সম্পর্কে আলোচনা বাদ দেন নাই। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে রচিত বেঙ্কটমখির চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকাতেও চর্যাগীতির আলোচনা দেখিয়া মনে হয়, চর্যা পরবর্তী কালে একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতরীতি হিসাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং তাহা হয়ত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্যত্রও

---

১ গায়েন রীতির আলোচনা দ্র.।

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য চর্যাগুলি চর্যাগীত-রীতির উদাহরণ হিসাবে রচিত হয় নাই। অধ্যাত্ম সঙ্গীত হিসাবেই প্রথমে এগুলি রচিত হয় এবং পরে ইহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া সঙ্গীতশাস্ত্র রচয়িতারা ইহার জন্য একটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়া ইহার গঠনপদ্ধতিও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া চর্যাগীতির গঠনপদ্ধতি সম্পর্কিত কিছুটা আলোচনা এখানে অবান্তর নয়। আজকালকার সঙ্গীতে যেমন অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ, এই চারিটি কলি আছে, প্রাচীনকালে তেমনি ছিল—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক ধ্রুব ও আভোগ। এই চারিটি ধাতু (কলি)-যুক্ত সঙ্গীতকে বলিত প্রবন্ধ-গীত। অবশ্য সমস্ত সঙ্গীতে যে এই চারিটি ধাতু থাকিত তাহা নহে। কদাচিৎ মেলাপক ও আভোগ কদাচিৎ শুধু মেলাপক বর্জিত হইত। ধাতুর সংখ্যা অনুসারে তখন নাম হইত—ত্রিধাতুক বা দ্বিধাতুক প্রবন্ধ। শাস্ত্র অনুসারে চর্যাগীতিগুলি ছিল মেলাপক-বর্জিত ত্রিধাতুক প্রবন্ধ-গীত।

প্রবন্ধ-গীতে আবার স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাটক এবং তাল এই ষড়ঙ্গ থাকিত। স্বর বলিতে স-র-গ-ম বোঝায়। বিরুদ অর্থ স্তুতিবাচক। পদ গানের বস্তু। তেনক মঙ্গলবাচক। পাটক বোঝায় সঙ্গত যন্ত্রের বোল ইত্যাদিকে। সব প্রবন্ধ-সঙ্গীতেই এই ষড়ঙ্গ থাকিত না। চর্যা-গীতিতে ছিল মাত্র দুইটি অঙ্গ, পদ ও তাল। তাই ইহার বিশেষ নাম 'তারাবলী'।

চর্যার দেহ-গঠন সম্পর্কেও শার্ঙ্গদেব আলোচনা করিয়াছেন। পদান্ত মিলযুক্ত, পদ্ধড়ি ছন্দে রচিত—গীতিগুলিই চর্যা। ইহার ছন্দ-রীতিতে যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল বলিয়া শার্ঙ্গদেব পূর্ণ ও অপূর্ণ এই দুইভাগে ইহাকে ভাগ করিয়াছেন। ছন্দো-শৈথিল্য না থাকিলে পূর্ণ, অন্যথায় অপূর্ণ।

পূর্বোক্ত আলোচনার সাহায্যে সঙ্গীত হিসাবে চর্যাগীতিগুলির গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে এগুলি বিশিষ্ট একটি ছন্দের ভিত্তিতে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত চরণে রচিত, মেলাপক-বর্জিত ত্রিধাতুক, তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ-সঙ্গীত।[১]

ছন্দ

চর্যাগীতিগুলির ছন্দের মধ্যে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে এগুলি একটি বিশেষ ছন্দেই রচিত। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি সেই ছন্দকে পদ্ধডি ছন্দ বলা হইয়াছে। অবশ্য অন্য ছন্দেরও যে ব্যবহার হইত তাহারও প্রমাণ আছে ঐ উক্তিটির মধ্যে—"পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দাঃ"। এই 'পদ্ধড়ী ছন্দই' সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দ। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে—

১. দ্র. বাঙলার সঙ্গীত, ১ম খণ্ড, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র।

ষোড়শ মাত্রার চরণ, ও চারি মাত্রায় একটি পাদ। ইহা এক হিসাবে পাদাকুলক ছন্দেরও বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃত পৈঙ্গলে পাদাকুলকের লক্ষণ বলিতে—হ্রস্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে নিয়মহীন ষোলো মাত্রার ছন্দকে বোঝানো হইয়াছে। [লহু গুরু একু ণিম্ম ণহি জেহা।…সোরহমত্তা পাআকুলঅং।] চর্যাগীতির ছন্দকেও সেই হিসাবে পাদাকুলকই বলা উচিত—কারণ ইহার ছন্দে মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে লঘুগুরু ভেদ নাই বলিলেই চলে। চর্যাগীতির অধিকাংশই এই ছন্দে রচিত। ষোলো মাত্রার চরণকে চারি মাত্রার চারিটি চালে (পাদে) বিভক্ত করিয়া, দ্বিতীয় পাদের পর যতি এবং শেষপাদের পর পূর্ণ যতি ব্যবহার করা হয়—

কায়া—তরুবর— / পঞ্চবি—ডাল
চঞ্চল—চীএ— / পইঠো—কাল।
অথবা সসুরা—নিদ গেল / বহুড়ী—জাগঅ
কানেঠ—চোরে নিল / কা গই—মাগঅ। ইত্যাদি।

স্বভাবতই মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে এখানে সুনির্ধারিত কোন রীতি নাই। অবশ্য তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না—কারণ এগুলি ছিল গান! গানে সুরের টানে কমকে বেশি করিয়া লওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। জয়দেবের গীতগোবিন্দও মূলত এই ছন্দে ও চালে গঠিত—

মুহুরব—লোকিত— / মণ্ডন—লীলা
মধুরিপু—রহমিতি— / ভাবন—শীলা।

লক্ষণীয়, উভয় ক্ষেত্রেই যতি পাতন (৮ মাত্রার পর) ঠিক পয়ারেরই মত।

গীতগোবিন্দ এবং চর্যাপদ এই উভয়ের ছন্দই অপভ্রংশ হইতে আগত। এই ছন্দ ঠিক পয়ার নয় ;—ইহা হইতেই আধুনিক বাঙলার পয়ার এবং পাঞ্জাব-বিহার গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের চউপাই ছন্দ আগত। যদিও মাত্রা গণনা পদ্ধতিতে বিশেষ নিয়ম নাই—তবুও চর্যাগীতির এই ছন্দ মাত্রাবৃত্তরীতিতেই গঠিত। মাত্রা গণনা পদ্ধতির এই শৈথিল্যের সহিত আবার, অনেকে মনে করেন, লৌকিক কোন ১৫ মাত্রার ছন্দের প্রভাবও যুক্ত হইয়াছিল—এবং ১৫ মাত্রার সেই লৌকিক ছন্দের যতি পাতন ছিল ৮ এবং ৭ মাত্রার পর। অন্যদিকে আবার বেশির ভাগ চর্যাগীতির চরণের শেষ পাদটি দুই 'অক্ষরে' গঠিত হইত। ফলে ষোলো মাত্রার হইলেও চর্যাগীতিগুলির বেশির ভাগ চরণই ছিল ১৪ অক্ষরে গঠিত। এই সমস্ত কিছু অর্থাৎ প্রাচীন বাঙলার মাত্রাগণনা পদ্ধতিতে শৈথিল্য, প্রতি চরণে আট মাত্রার পর প্রথম যতি পাত, চরণগুলির চৌদ্দ অক্ষরে গঠন—ইত্যাদি মিলিয়া মাত্রাবৃত্ত জাতীয় অপভ্রংশ ছন্দ ক্রমে অক্ষরবৃত্ত জাতীয় পয়ারে বিবর্তিত হইয়া গেল। চর্যাগীতির এই ছন্দ তাই অপভ্রংশ এবং পয়ারের মাঝামাঝি পাদাকুলক ভিত্তিক একটি ছন্দ। ইহারই বিবর্তন পথে পয়ারের উদ্ভব।

চর্যাপদগুলিতে 'পয়ারের পূর্বপুরুষ' জাতীয় ছন্দ ছাড়াও আরও দুই এক

প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাদাকুলকের পরই ২৪ অথবা ২৬ মাত্রার ত্রিপদীর ব্যবহারই বেশি—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী
হিএঁ কুবাড়ী। (৮+৮+৮)
অথবা সুনা পান্তর উহ ণ দীসই
ভান্তি ণ বাসসি জান্তে (৮+৮+১০)

এই ছন্দের উৎপত্তি দোহা ছন্দ হইতে। এই জাতীয় ছন্দের নানারূপ আছে। ইহার কোন কোনটিতে আবার ২৮ মাত্রাও আছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ২৮ মাত্রার ছরণের পাদবিন্যাস করিয়াছেন—৮+৮+৮+৪ এবং এগুলিকে বলিয়াছেন মরহাট্টা ছন্দ। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—

কিন্তো মন্তে। কিন্তো তন্তে। কিন্তোরে ঝাণব। থানে।

চর্যাপদের ছন্দোশৈথিল্য প্রাচীনকাল হইতেই লক্ষিত হইয়াছিল। শার্ঙ্গদেবও তাই 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' ছন্দের উপর ভিত্তি করিয়া চর্যাগীতিগুলিকে পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শিথিল-ছন্দ গীতিগুলি অপূর্ণ। পূর্বেই বলিয়াছি ছন্দের এই অপূর্ণতা গানের ক্ষেত্রে অমার্জনীয় নহে। ইহা ছাড়াও আধুনিক কালে যেভাবে চর্যাগীতিগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহাতেও ছন্দোশৈথিল্যের কারণ আছে। লিপিকর যিনি ছিলেন তাঁহার কতদূর ছন্দোজ্ঞান ছিল বলা যায় না। না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না। আবার অনুলিপি সমাধা হইয়াছিল নেপালে, বাংলায় নহে। সুতরাং ছন্দোবিভ্রাট স্বাভাবিক।

পূর্বোক্ত নানা কারণে স্থানবিশেষে শৈথিল্যের নিদর্শন সত্ত্বেও চর্যাগীতির ছন্দ কিন্তু সর্বত্র নিতান্ত অপটু রচনার নিদর্শন নহে। কবিদের উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক; সুতরাং কবিতার অন্তরঙ্গ মাধুর্য সম্পর্কে তাঁহারা কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। তবুও সঙ্গীতগুলিকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে সযত্নপ্রয়াসে ছন্দ অলংকারে মাধুর্যবৃদ্ধির নিদর্শনও স্থান বিশেষে দুর্লক্ষ্য নহে। অন্ত্যানুপ্রাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুপ্রযুক্ত। মাগা/সঙ্গা, দেবী/হোই অথবা দীসঅ/পইসই জাতীয় যে কিছুকিছু দুর্বল মিলের পরিচয় পুথিতে আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল পাঠোদ্ধা'র বা লিপিকর প্রমাদ-জনিত। বস্তুত ছন্দ ঝংকার অনেক স্থানেই পরিশীলিত নৈপুণ্যের পরিচায়ক—

বাজই আলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥ (১৭)
অথবা এক সো পদুমা চৌষঠ্‌ঠি পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী। (১০)

ইত্যাদি পদের বক্তব্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ধ্বনি মাধুর্য রীতিমত প্রশংসনীয়।

অলংকার

কবিতাগুলির বহিরঙ্গ সৌকর্য তথা অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যবিধান আলোচনা প্রসঙ্গে অলংকার প্রয়োগের প্রয়াসও স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে। টীকাকার আচার্য মুনিদত্ত এ বিষযে অবহিত ছিলেন এবং টীকায ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাজ ও উৎপ্রেক্ষা শব্দ দুটিকে তিনি সন্ধ্যার প্রায প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ছাড়াও অন্যত্র তিনি অলংকার প্রযোগের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন দ্বিতীয পদেন দৃষ্টান্তোপমাং করোতি। (৪৩ সং গীতির টীকা)।

কাব্যভাষায সর্বাপেক্ষা পরিচিত অলংকার রূপক ও উপমা। চর্যাগীতিতে এগুলির ব্যবহার অজস্র। চর্যাগীতিকোষের সূত্রপাতই একটি রূপক দ্বারা—কাযাতরুবর। রূপকের প্রযোগ প্রায প্রতিটি গীতিতেই লক্ষণীয—করুণা পিহাড়ি, চিঅগএন্দ, সুনতমাঙ্গ, সুজলাউ, সুনতান্তিধনি, মনপবন, গঅনসমুদ্দ, ইত্যাদি। রূপক অনেক সময সাঙ্গ রূপকেও পরিণত হইযাছে—

মনতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা
আসা বহল পাতাহ বাহা॥ ৪৫

অথবা কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌অক বঅণে ধব পতবাল॥ ৩৮

উপমা অলংকারের ব্যবহারেও চর্যাগীতিকারেরা সিদ্ধহস্ত। উপমাকে প্রসারিত করিযা দৃষ্টান্ত ইত্যাদি অলংকারও তাঁহারা ব্যবহার করিযাছেন—

মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর
ভাগতবঙ্গ কি সোষই সাঅর। (৪২)

অথবা মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড ণচ্ছন্তে দেখই॥ (৪২)

অতিশযোক্তি ব্যবহারের নিদর্শনও বিরল নহে—'নিসি অন্ধারী মুসঅ চারা।' উপমান মুষিকই এখানে কেবলমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে; উপমেয় চিত্ত উহ্য।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ণ জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥

অথবা বলদ বিআঅল গবীআ বাঝে—ইত্যাদি উক্তির মধ্যে বিরোধাভাস, বিভাবনা ইত্যাদি অলংকারের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

অনুপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি শব্দালংকারের প্রয়োগও চর্যাগীতিতে বিরল নহে। 'কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখাণে' অথবা 'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই'—ইত্যাদি অনুপ্রাসবহুল উদাহরণ অজস্র। অন্ত্যানুপ্রাসের স্বতন্ত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সোনে ভরিতী করুণা নাবী
রুপা থোই নাহি কে ঠাবী।

ইত্যাদি পদে স্পষ্টত শ্লেষ অলংকার প্রয়োগের নিদর্শন।

কাব্যের ভাষাকে বাচ্যার্থের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যঞ্জনার সুদূর দিগন্তে পাড়ি জমাইবার জন্য যেসমস্ত উপাদান প্রযোজন অলংকার ব্যবহার তাহার অন্যতম। চর্যাগীতি পূর্ণাঙ্গ কাব্য হউক আর নাই হউক ইহার অলংকার ব্যবহারে কোথাও চেষ্টাকৃত আড়ষ্টতার কোন লক্ষণই নাই এবং একথাও স্বীকার্য এই অলংকারাদির জন্যই নীরস সাধনতত্ত্ব অনেকখানি পরিমাণে সরসতা লাভ করিয়াছে।

রাগরাগিণী

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিযাছি চর্যাপদগুলি গীতি এবং বিশিষ্ট রীতির গীতিব গঠনপদ্ধতিতেই ইহার দেহ গঠিত। এগুলি যে গীতের উদ্দেশ্যে রচিত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রতিটি গীতির পূর্বে রাগবাগিণীর উল্লেখ। শাস্ত্রীমহাশয় ভূমিকায় এগুলিকে কীর্তন বলিয়া আখ্যা দিযাছিলেন। এগুলি ঠিক কি ভাবে গাওযা হইত তাহা নির্ণয করা যায় না। সুতরাং এগুলি ঠিক ঠিক কীর্তন কিনা তাহা শুধু মাত্র রাগরাগিণীর সাদৃশ্য দেখিযা বলা যায না। তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে বিশিষ্ট রীতির দিকে যত পার্থক্য থাকুক না কেন, অন্যদিক বাদ দিযাও, শুধুমাত্র গাযেন রীতির দিকে পরবর্তী কালেব কীর্তন বাউল ইত্যাদির সহিত ইহার ক্ষীণধারার যোগ থাকাই স্বাভাবিক।

চর্যাগীতিতে যেসমস্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে তাহাদের মোট সংখ্যা—১৬; পটমঞ্জরী, গবড়া বা গউড়া, অরু, গুঞ্জরী বা কহ্নু গুংজরী বা কাহ্নু গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ বা দেশাখ, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বলাড্ডী বা বরাড়ী, শীবরী বা শবরী মল্লারী, মালসী, মালসী-গবুড়া, বঙ্গাল, ভৈরবী। ইহাদের মধ্যে পটমঞ্জরী রাগটিই সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয় ছিল—ইহাতে গীতি আছে ১১টি। অন্যান্য রাগগুলিতে গীত সংখ্যা এক হইতে কথনও বা চারি পাঁচ পর্যন্ত আছে। রাগগুলি বেশির ভাগই হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতের; কেবল মাত্র গবড়া, অরু, মালসী-গবুড়া কাহ্নু গুর্জরী ইত্যাদি ছাড়া। কতকগুলি রাগ আছে যেগুলি হিন্দুস্থানী মার্গ-সঙ্গীতের স্বল্প সংখ্যক রাগরাগিণীর মধ্যে না পড়িলেও—সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহাদের উল্লেখ আছে। অপ্রচলিত বা নূতন যে রাগরাগিণীগুলির উল্লেখ আছে তাহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কেহ কেহ কিছু কিছু জল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু কেহই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পারা সম্ভবও নহে—কারণ রাগের নাম হিসাবে যে শব্দটির উল্লেখ আছে তাহা অভ্রান্ত কিনা কে জানে? যেমন গবুড়া বা গউড়া। সম্ভবত 'গৌড়ী' নামক কোন রাগই এখানে উদ্দিষ্ট। লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণীতে এক 'গৌরী' রাগের উল্লেখ আছে। এই গৌরী ও গৌড়ী কি এক? অরু নামক কোন রাগের উল্লেখ কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির রাগরাগিণীর সঙ্গে চর্যাগীতির রাগরাগিণীর বেশ সাদৃশ্য আছে।

চর্যাগীতি	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	গীতগোবিন্দ
গুঞ্জরী/কহ্নু গুংজরী	কহ্নুগুজরী	গুর্জরী
বরাড়ী/বলাড্ডি	দেশবরাড়ী	বরাড়ী দেশবরাড়ী
মালসী	মালবশ্রী	মালব (?), মালব গৌড় (?)
দেশাখ/দ্বেশাখ	দেশাগ	দেশাখ
রামক্রী	রামগিরি/শ্রীরামগিরি	রামকিরী
বঙ্গাল	বঙ্গাল	×
মল্লারী	মল্লার	×
ধনসী	ধানুষী	×
পটমঞ্জরী	পটমঞ্জরী	×
ভৈরবী	×	ভৈরবী

চর্যাগীতিতে গবডা/গউড়া রাগের উল্লেখ আছে। এই গবড়া ও গৌরী এক হইতে পারে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিযাছি। পাশাপাশি বঙ্গাল রাগের নাম হইতে অনুমান হয পূর্বে নামটি হযত গৌড়ীই ছিল পরে গৌরীতে পরিণত হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বসন্তরঞ্জন গৌরী রাগের উল্লেখ করিযাছেন। পুথিতে ছিল শৌরী, তিনি কাটিযা গৌরী করিয়াছেন। শৌরী স্থানে গৌরী পাঠ যদি অভ্রান্ত হয় তবে চর্যাগীতির গউড়া ও এই গৌরী এক হইতে পারে। অন্যদিকে শৌরী যদি লিপিকর-প্রমাদ না হয় অর্থাৎ রাগের নাম যদি বস্তুত শৌরীই হয তবে চর্যাগীতির শবরীর সহিত ইহা অভিন্ন হইতে পারে। শবরী>শৌরী অসম্ভব নয়।

গায়েন রীতি

চর্যাগীতিগুলি কিভাবে গাওয়া হইত তাহা নিশ্চিত করিযা জানিবার উপায় নাই। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'বাঙলার সঙ্গীত' প্রথমখণ্ডে উল্লেখ করিযাছেন যে সঙ্গীতরত্নাকরে চর্যার গায়েন রীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে। বস্তুত সে আলোচনা হইতে চর্যার গায়েনরীতি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। ড. নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—"এগুলি (চর্যাগীতিগুলি) প্রায় সমসাময়িক লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী বা কিছু পরবর্তী কালের শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরের (১২১০-৪৭) পদ্ধতি অনুযায়ী গাওয়া হইত কিনা বলা কঠিন"। (দ্র. বাঙ্গালীর ইতিহাস।) এ সন্দেহ সমীচীন। তবে চর্যাগীতির গায়েন পদ্ধতির একটি নির্ভুল ইঙ্গিত গানগুলির মধ্যেই আছে। সেটি ধ্রুবপদ সম্পর্কিত। আধুনিক গীত পদ্ধতিতে 'স্থায়ী' যেমন, চর্যাগীতির ধ্রুবপদ

তেমনি। প্রত্যেকটি পদ গাহিবার পর ধ্রুবপদ গাওয়া হইত এবং এই ধ্রুবপদটি সম্ভবত সম্মেলক গাওয়া হইত। কোন কোন গীতে ধ্রুবপদটি সম্মেলক গাওয়া হইত—কোন কোনটিতে সমস্ত গীতিটিই সম্মেলক গাওয়া হইত। এই অনুসারে শার্ঙ্গদেব চর্যাগীতির দুইটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। যেখানে সমস্ত গীতিটি সম্মেলক গাওয়া হইত তাহাকে বলিত সমধ্রুবা আর যখন কেবল মাত্র ধ্রুব অংশ সম্মেলক গাওয়া হইত—তখন তাহাকে বলিত বিষমধ্রুবা।[১] চর্যাগীতিতে সংযোজিত মূলগানগুলির প্রত্যেকটি পদের পর 'ধ্রু' লেখা আছে। তাহাতে মনে হয় সবগুলি গীতিই সমধ্রুবা। কিন্তু টীকাকারের মতে ২টি মাত্র গীতি (২৮ ও ৪৩) কেবল সমধ্রুবা শ্রেণীর বাকীগুলি বিষমধ্রুবা। গীতি ও টীকাতে ধ্রুবপদ সম্পর্কিত নির্দেশে এই পার্থক্য কি গীতিসংযোজনা ও টীকা রচনার মধ্যে কালব্যবধান তথা গায়েনরীতির বিবর্তনের নির্দেশক ?

৫. ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি

ভূমিকা : সাধারণ স্বরূপ

চর্যাগীতিগুলি একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন অন্যদিকে বিশিষ্ট একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীতও বটে। সুতরাং ধর্মতত্ত্বকে বাদ দিয়া ইহার আলোচনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদি সম্ভব নহে। অনেক সমালোচকের মতে চর্যাগীতিগুলি বিশেষ একটি যুগের ভাষার নিদর্শন, সুতরাং কেবলমাত্র ইহার ভাষাতাত্ত্বিক দিকই বিচার্য। শাস্ত্রীমহাশয়ও চর্যাপদের স্বরূপটি যে তান্ত্রিক বা সহজিয়া বৌদ্ধ একথা উল্লেখ করিয়াও মন্তব্য করিয়াছিলেন, "যাঁহারা সাধনভজন করেন তাঁহারাই সেই কথা (ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব) বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। আমরা সাহিত্যের কথা কহিতে আসিয়াছি, সাহিত্যের কথাই কহিব।" (বৌদ্ধগান ও দোহা ; মুখবন্ধ, পৃ ৮)। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে বাঙ্গালীর সাহিতসাধনা, সঙ্গীতসাধনা এবং ধর্মসাধনা চিরকাল একত্রেই চলিয়াছে। বাঙ্গালী ধর্মসাধনার জন্য সঙ্গীত রচনা করিয়াছে এবং সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া সাহিত্য-সাধনা করিয়াছে। পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ইত্যাদির মধ্য দিয়া ধর্ম, সঙ্গীত ও সাহিত্যের যে ত্রিবেণীধারার ঐতিহ্য চলিয়া আসিয়াছে তাহার সূত্রপাত এই চর্যাগীতিগুলিতে। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির বিচারে অন্তর্নিহিত ধর্মসাধনার আলোচনা অপরিহার্য। তাহা ছাড়া, চর্যার ধর্মমত সম্পর্কে

১. এই অধ্যায়ের সঙ্গীত সম্পর্কিত তথ্যগুলির বেশির ভাগই শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের 'বাঙলার সঙ্গীত' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

কিছু ধারণা না থাকিলে চর্যার অর্থবোধ সম্ভব হয় না; সুতরাং ভাষার তাৎপর্যও ঠিকভাবে ধরা পড়ে না। তাই ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনেও চর্যার ধর্মমত আলোচনা প্রয়োজনীয়।

অবশ্য চর্যার ধর্মমতের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আলোচনায় কিছু কিছু বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। অদ্বয়, নির্বাণ, অবিদ্যা ইত্যাদি শব্দ ভারতীয় ধর্মদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতীয় ধর্মসাধনায় সমন্বয়ের প্রভাব ব্যাপক হওয়াতে এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাবের চিহ্নও প্রচুর। তাই চর্যার ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে শুধু কয়েকটি শব্দের বা ভাষার আপাত বিচার নহে, মূল বিষয়বস্তুর গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ভারতীয় ধর্মসাধনায় সমন্বয়ের সুর, বিশেষ করিয়া নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের কথা[১] স্মরণ রাখিয়াও একথা আমরা আজ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে চর্যার মধ্যে প্রকাশিত ধর্মমত সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। শব্দ ও পারিভাষিকগুলি বৌদ্ধধর্মের কিন্তু তাহার আবরণে মূলত তন্ত্রের তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীই ব্যক্ত হইয়াছে। এই তান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণে চর্যার কবি-সাধকদের যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'সহজিয়া'। অন্যান্য সহজিয়া সম্প্রদায়ের সহিত চর্যার ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধনপ্রণালীর সাদৃশ্যের কারণও প্রধানত এই মনোভাবের সাদৃশ্য। সুতরাং চর্যার ধর্মমত প্রসঙ্গে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের আবরণে এবং তাহার মূলভিত্তির উপর সহজিয়া মনোভাব প্রসূত তান্ত্রিক সাধনাপদ্ধতিই এখানে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম পরিবর্তনের বিশেষ একটি পর্যায়ে তান্ত্রিকতার প্রভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয় এবং তাহারই একটি বিশিষ্ট পর্বের বিশিষ্ট ধর্মসাধনার নিদর্শন বহন করে চর্যাগীতিগুলি। চর্যার ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতায় পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা খুব অপ্রাসঙ্গিক নহে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তন

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম-দর্শনের মূল সূত্রগুলি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে রীতিমত মতভেদ দেখা দেয় এবং এই মতভেদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার ধর্মসংঘও আহ্বান করা হয়। কথিত আছে বৈশালিতে আহূত দ্বিতীয় ধর্মসংঘে ইঁহাদের মতভেদ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং প্রতিবাদীরা আর একটি মহাসংঘ আহ্বান করিয়া নিজেদের মহাসাংঘিক আখ্যা দেন। এইভাবে প্রাচীন থেরবাদী সম্প্রদায় এবং পরবর্তী প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাঁহারা দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যান এবং প্রাচীন হীনযানী এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিবাদীরা মহাযানী নামে

১. বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী; পৃ. ৫৪।

অভিহিত হন। মহাযান এই দিক দিয়া বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির একটি স্তর নির্দেশ করে।[১]

হীনযান বা প্রাচীন পন্থী বৌদ্ধধর্ম এবং মহাযান বা আধুনিক পন্থী বৌদ্ধধর্মের [হীনযান ও মহাযান বলিতে অবশ্য আক্ষরিকভাবে—ছোট শকট ও বড় শকট বোঝায়] মধ্যে মূল পার্থক্য তাহাদের ধর্মের লক্ষ্য (আশয) লইয়া। হীনযানীদের দৃষ্টি ছিল কিছুটা সংকীর্ণ, তাই বুদ্ধ প্রদর্শিত আচার-আচরণ পালন করিয়া ধর্মের পথে পুণ্য অর্জনে তাঁহারা তৎপর হইতেন কিন্তু বুদ্ধত্বলাভের দুরাশা তাঁহারা পোষণ করিতেন না। তাঁহাদিগকে বলা হইত 'শ্রাবক যান'। হীনযানীদের মধ্যে অবশ্য একদল ছিলেন· যাঁহারা বুদ্ধত্বলাভের উচ্চাশা পোষণ করিতেন বটে তবে তাহা কেবলমাত্র নিজের জন্য। তাঁহাদিগকে বলা হইত 'প্রত্যেক বুদ্ধ যান'। মহাযানীদের আদর্শ ছিল অপেক্ষাকৃত উদার। তাহারা শুধু নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভ করিবার চেষ্টাকে তুচ্ছ মনে করিতেন। বুদ্ধদেব যেমন সমস্ত বিশ্বের জন্য জন্ম-জন্মান্তরে নিজেকে উৎসর্গিত করিয়াছেন, ইঁহারাও সেইরূপ পরোপকারেব (কুশলকর্ম—missionary activities) মধ্য দিযা আত্মোৎসর্গ করিযা বোধিসত্ত্বাবস্থালাভ এবং তাহার ভিতর দিয়া বুদ্ধত্বলাভকেই আদর্শ মনে করিতেন। এই বুদ্ধত্বলাভ আবার শুধু নিজের জন্য নহে, বিশ্বের সকলের জন্য এই বুদ্ধত্বলাভের চেষ্টা। অর্থাৎ হীনযানীদের অর্হত্ত্বের আদর্শের স্থানে মহাযানীরা বুদ্ধত্বের আদর্শ স্থাপন করেন। এই বুদ্ধত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য বোধিসত্ত্বাবস্থার কল্পনাটিও লক্ষণীয়। মহাযানীরা মনে করেন জগতের প্রতিটি জীবনের মধ্যে সম্যক-সম্বুদ্ধত্বেব সম্ভাবনা বর্তমান এবং শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতায় প্রতিষ্ঠিত বোধিচিত্ত লাভের মধ্য দিয়া যে-বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভ হয় তাহার ভিতর দিয়াই প্রত্যেকে ক্রমে বুদ্ধত্বলাভ করিতে পাবেন। মহাযানীরা ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ হিসাবে বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভকেই কাম্য বলিয়া মনে করিতেন। বোধিচিত্ত লাভ করাই বোধিসত্ত্বাবস্থায উন্নীত হওয়া। জগৎ সংসারের শূন্যতা-স্বরূপের জ্ঞান (অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তুর নিজস্ব কোন ধর্ম বা স্বরূপ নাই,—প্রত্যেকেই তাহার বর্তমান স্বরূপের জন্য অন্য কোন স্বরূপের উপর নির্ভরশীল সুতরাং অস্তিত্বহীন - এই জ্ঞানই শূন্যতাজ্ঞান) এবং বিশ্বব্যাপী করুণা (অর্থাৎ শুধু নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা নয়—পরোপকার এবং তাহার মধ্য দিয়া জাগতিক সকলের মুক্তির জন্য চেষ্টা)—এই দুইয়ের অভিন্নাবস্থাই বোধিচিত্ত। (শূন্যতা করুণাভিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। এই অবস্থালাভই বোধিসত্ত্বাবস্থালাভ—ইহার মধ্য দিয়াই ক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ হয়।

বুদ্ধদেবের ত্রিকায় পরিকল্পনাও মহাযানীদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। মহাযানীরা

---

১. বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ; পৃ. ৩। আধুনিক কালে পণ্ডিতেরা অবশ্য মহাযান এবং হীনযান মতের মধ্যে কালগত পার্থক্য স্বীকার করিতে চান না। মহাযানী মতবাদগুলি প্রাচীন পালিশাস্ত্রে ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। কিন্তু তাহা সুসংবদ্ধ রূপ পায় কিছু পরবর্তী কালে, সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহাদের ত্রিকায় পরিকল্পনায় বুদ্ধ তিন প্রকার—ধর্মকায়, নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। বুদ্ধ যখন পারমার্থিক সত্তা অবলম্বন করেন তখন তিনি ধর্মকায়ে (নির্গুণ ব্রহ্মের মত); যখন তিনি বোধিসত্ত্বদের নিকট গূঢ় ধর্মার্থ ব্যক্ত করেন তখন তিনি সম্ভোগকায়ে বিচরণ করেন, আর যখন তিনি সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য সূত্রাদি দান করেন তখন তিনি নির্মাণকায়ে বিচরণ করেন।

পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি—মহাযানীরা প্রত্যেক জীবের বুদ্ধত্বের জন্য বোধিসত্ত্বাবস্থালাভকে কাম্য বলিয়া মনে করিতেন। বোধিসত্ত্বাবস্থাকে স্থায়ী করিবার জন্য মহাযান মতাবলম্বী প্রথম আচার্যেরা কতকগুলি 'পারমিতা' (পূর্ণতা প্রাপ্তি) অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী ইত্যাদি পরম গুণের অনুশীলনকেই উপায় বলিয়া মনে করিতেন। সকল জীবের মধ্যে বুদ্ধত্ব কল্পনা, সকল জীবের মুক্তির জন্য পরোপকার ও আত্মোৎসর্গ এবং পন্থা হিসাবে মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির অনুশীলন মহাযান সম্প্রদায়কে রীতিমত জনপ্রিয় করিয়া তোলে। এই জনপ্রিয়তার জন্যই মহাযান মতের মধ্যে ক্রমে নানা বিচিত্র উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং এই ভাবে তান্ত্রিকতাও প্রবেশ করে। অবশ্য মহাযান মতের জনপ্রিয়তাই তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উৎপত্তির কারণ নহে। মহাযান মতের মধ্যেই পরবর্তী কালে, পূর্বেকার 'পারমিতানয়ের' মত একটি 'মন্ত্রনয়ের' উদ্ভব হয়। পূর্বেকার আচার্যেরা যেমন মনে করিতেন পারমিতার অনুশীলনই বুদ্ধত্বলাভের উপায় ইঁহারা তেমনি মনে করিতেন মন্ত্র উপাদানই বুদ্ধত্বলাভের উপায়। এই 'মন্ত্রনয়' বা মন্ত্রযানই পরবর্তী কালে বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে এবং তখন হইতেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে তান্ত্রিকতার সূত্রপাত হয়।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কখন, এবং তাহার দ্বারা যে তান্ত্রিকতার প্রথম সূত্রপাত হয় তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। এইরূপ আর একটি মতভেদের বিষয় তন্ত্রের মূল, বৌদ্ধ কি হিন্দু, সেই প্রশ্ন লইয়া। চর্যাপদের আলোচনা প্রসঙ্গে এ আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই—কারণ প্রথমে যাহার দ্বারাই প্রচারিত হউক না কেন চর্যাপদগুলির মধ্যে তান্ত্রিকতার পরিচয় আছে কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য।[১] বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে-মন্ত্র উপাদানের প্রবেশ হইতে তান্ত্রিকতার সূত্রপাত

১. তন্ত্র মূলত বৌদ্ধও নহে হিন্দুও নহে—ইহার মূল বক্তব্য সর্বত্রই এক। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হইতেই দেশে তন্ত্রের প্রচলন ছিল, এমনকি অথর্ববেদেও তান্ত্রিক আচার লক্ষ্য করা যায়। (দ্র. তন্ত্রকথা, চিন্তাহরণ, চক্রবর্তী, পৃ. ৪) শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা ধর্মমতের সহিত মিশিয়া শৈবতন্ত্র, বৈষ্ণবতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ইহা নামাঙ্কিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে কে যে প্রথম তন্ত্রের প্রচলন করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অনেকে স্বয়ং বুদ্ধদেবকেই বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তন্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। অন্য মতে অসঙ্গই (খ্রী. চতুর্থ শতক) বৌদ্ধতন্ত্রের প্রবর্তক। কেহ কেহ আবার নাগার্জুনকে (দ্বিতীয় শতক) ইহার প্রবর্তক বলিয়া

তাহা প্রথমে 'ধারণী' (অর্থাৎ ইহার দ্বারা ধারণ করা হয়) উপাদান রূপেই প্রবেশ লাভ করে। ধারণী হইতে মন্ত্র এবং তাহার পরই মুদ্রাউপাদান ইহার মধ্যে প্রবেশলাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে তন্ত্রের অন্যান্য উপাদান—মণ্ডল, অভিক্ষেপ, এমনকি যৌনযৌগিক সাধন পদ্ধতিও প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে পূর্ণ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করে। তখন ইহার নাম হয় 'বজ্রযান'। এই বজ্রযান আবার নানা শাখায় বিভক্ত—ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র, অনুত্তরতন্ত্র। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে অবশ্য অন্য উপায়েও শ্রেণীবিভক্ত করা যায়—যথা বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান। বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হইলেও এগুলি বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম নহে, ইহারা তন্ত্রযানেরই সামান্য-পৃথক ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ মাত্র।[১]

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্মের মধ্যেই অনুসন্ধান করিলে চলিবে না। তন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান ইহার মধ্যে বিদ্যমান। তাই এ প্রসঙ্গে তন্ত্রের মূলসূত্রগুলি আলোচনা করিয়া বৌদ্ধ মহাযান মতটি, তাহার বিভিন্ন উপাদান সমেত, কিভাবে তান্ত্রিকতায় পরিবর্তিত হইয়া গেল তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

তন্ত্রের মূল বক্তব্য

ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে পরমার্থ সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে নানা প্রকার আলোচনা দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই পরমার্থ সত্যকে লাভ করিবার জন্য কোন কার্যকরী পন্থা কোন দর্শন নির্দেশ করে নাই। তন্ত্র দার্শনিকভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরমার্থ সত্যলাভের কার্যকরী পন্থা নির্দেশই তাহার লক্ষ্য। তন্ত্রে তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা কার্যকরী সাধনপদ্ধতিই অধিক। তন্ত্রের মতে পরমার্থ সত্যের দুইরূপ, নিবৃত্তিরূপ পুরুষ বা শিব, এবং প্রবৃত্তিরূপ প্রকৃতি বা শক্তি। পরমার্থ সত্য অদ্বয় স্বরূপে এই পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তির মিলিত অবস্থা। এই মিথুন বা মিলিতাবস্থাই জীবের কাম্য। শিবের সহিত মিলিতাবস্থায় শক্তিই এই বিশ্বসৃষ্টি-প্রবাহের কারণ। কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ইহাদের কাহারও কোন

মনে করেন। অসঙ্গের মহাযান সূত্রালংকারে 'পরাবৃত্তি' বলিয়া যে তান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে অসঙ্গের সময় হইতেই তান্ত্রিকতার প্রথম সূত্রপাত। অসঙ্গ তাঁহার মতকে যোগাচারবাদ বলিয়া উল্লেখ করাতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল সুতরাং বলা যাইতে পারে অসঙ্গই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রথম তান্ত্রিকতার বীজ বপন করেন। অবশ্য অসঙ্গের যোগাচার এবং পরবর্তী তন্ত্রযানগুলি কোন অর্থেই অভিন্ন নহে।

১. দ্র. Obscure Religious Cults, S. B. Dasgupta, পৃ. ২৪-২৭ এবং বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, পৃ. ৪৪-৪৯।

প্রভাব নাই। সংসার প্রবৃত্তিস্বরূপ শক্তির প্রভাবে ক্রমে প্রবৃত্তি অর্থাৎ পরিবর্তনের পথে চলিয়াছে—তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করা এবং নিবৃত্তি-স্বরূপ শিবের সহিত অদ্বয়ভাবে যুক্ত করানোই মুক্তিকামী জীবের কাজ।

তন্ত্র মতে আমাদের দেহই সকল সত্যের আধার। আমাদের এই দেহ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি ; এই দেহের মধ্যেই চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদনদী, জীব-প্রবাহ, ইহার মধ্যেই শিব-শক্তি। শিব-শক্তির যে মিলন তান্ত্রিকদের কাম্য তাহারও অনুসন্ধান করিতে হইবে এই দেহের মধ্যেই—এবং তাহাদের মিলন ঘটাইবার স্থানও এই দেহ। এই দেহকে যন্ত্র করিয়া ইহার মধ্যে শিব-শক্তির মিলন ঘটাইতে পারিলে পরম সত্যলাভ সহজ হয়। তন্ত্রে আমাদের দেহস্থিত মেরুদণ্ডটিকে মেরুপর্বত বলা হইয়াছে। এই মেরুপর্বতের সর্বনিম্নে অবস্থিত দক্ষিণ মেরুতে মূলাধার চক্রে কুণ্ডলিনী অবস্থায় শক্তি (কুলকুণ্ডলিনী) নিদ্রিতা। ইহাকে জাগ্রত করিয়া ঊর্ধ্বমুখী করিয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ইত্যাদি ক্রমে, মেরুপর্বতের উপর অবস্থিত বিভিন্ন চক্রের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া সর্বোর্ধ্বে উত্তর মেরুতে সহস্রার পদ্মে অবস্থিত নিবৃত্তিরূপী শিবের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। শক্তিকে যত ঊর্ধ্বগামিনী করা যাইবে তান্ত্রিক সাধকও ততই প্রজ্ঞা ও কল্যাণের আদর্শে উদ্ভাসিত হইবেন। এই ভাবে দেহের মধ্যেই সকল সত্য এবং তাহা উপলব্ধির উপায়ও দেহেই অবস্থিত, ইত্যাদি বলিয়া তান্ত্রিকেরা দেহের প্রাধান্য এবং কায়সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তন্ত্রে কার্যকরী পন্থা হিসাবে দেহ সাধনা বা কায়সাধনার পদ্ধতিও বর্ণিত হইয়াছে। দেহের বামদিকে অবস্থিত ইড়া এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে যথাক্রমে শক্তি ও শিব, নারী ও পুরুষ হিসাবে ধরিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাণ ও অপান বায়ুকে দেহমধ্যস্থিত নাড়ী সুষুম্না পথে পরিচালিত করিয়া সহস্রারে প্রেরণ করিতে পারিলেই অদ্বয় সত্য লাভ হয় বলিয়া হঠযোগে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই কায়-সাধনার পদ্ধতি—এই পদ্ধতিই তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত।

তান্ত্রিক সাধনার অবশ্য আর একটি দিক আছে। তন্ত্রের মতে প্রতি নারী ও পুরুষের মধ্যে শক্তি ও শিব বিদ্যমান থাকিলেও শিব-প্রাধান্যে পুরুষই শিব এবং শক্তি-প্রাধান্যে নারীই শক্তি। সুতরাং শিব-শক্তির মিলিতাবস্থা বলিতে তান্ত্রিকেরা রক্তমাংসের দেহধারী নারী-পুরুষের মিলনকে বুঝাইয়াছেন। এই মিলন কিন্তু পার্থিব প্রবৃত্তির তাড়নায় বা কাম চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। অবশ্য নারী-পুরুষের মিলনের কথা বলিলেই ক্রমে তাহার মধ্যে অবনতি অবশ্যম্ভাবী এবং কামপ্রভাবিত নারীপুরুষের মিলনের ব্যাপারই ক্রমে তন্ত্রের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য তন্ত্রের প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণের অনেক ঘৃণাও আছে এবং প্রাচীনকাল হইতে তন্ত্রকে নিন্দা ও বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তান্ত্রিক আচার বেদ-বিগর্হিত এবং নিন্দনীয়, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য এবং বেদবহিষ্কৃত

পতিত ব্যক্তিদিগের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল,—এইরূপ উক্তি বিভিন্ন পুরাণ সংহিতার মধ্যেই পাওয়া যায়।[১] তন্ত্রকারেরাও নারী-পুরুষ মিলনাদর্শের এরূপ বিকৃতির সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই খড়্গাধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কণ্ঠালিঙ্গন, সাপ ধরিয়া রাখা, প্রভৃতি কার্য হইতেও দুষ্কর[২] এই তান্ত্রিক আচার যাঁহারা পালন করিবেন তাঁহারা যদি কামুক উদ্দেশ্য লইয়া তাহা করেন তবে তাহার শাস্তি কি হইবে তাহাও তাঁহারা নির্দেশ করিয়াছিলেন।[৩]

যাহা হউক, নিজ দেহেই হউক বা নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দেহেই হউক শিব-শক্তির মিলিতাবস্থা লাভই অদ্বয় সত্য লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা এবং মিথুন, যুগনদ্ধ, যামল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন তন্ত্রে পরিচিত ঐ অদ্বয় লাভই তান্ত্রিকদের প্রধান লক্ষ্য।

মহাযানী ধ্যান-ধারণাগুলির তান্ত্রিকতায় পরিবর্তন

মহাযান ধর্মসম্প্রদায় যখন তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে আসিল অথবা অতিরিক্ত জনপ্রিয়তার জন্য যখন মহাযানের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করিল তখন ক্রমে মহাযানী ধ্যান-ধারণাগুলিও তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। পরিবর্তনের প্রথম পাদক্ষেপেই মহাযান মতের শূন্যতার ধারণাটি 'বজ্রে' পরিণত হইল। ভবসংসারের শূন্যতাস্বভাব যেন বজ্রের মতই;—শূন্যতা তাই বজ্র। বজ্রযানে আচার-অনুষ্ঠানে সমস্ত কিছুই বজ্র বা বজ্রচিহ্নিত—মূলদেবতা বজ্রসত্ত্ব। এই বজ্রসত্ত্বের কল্পনা আবার বোধিচিত্তের কল্পনার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বোধিচিত্ত শূন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থা। সহজযানে শূন্যতা এবং করুণা যথাক্রমে প্রজ্ঞা ও উপায়ে (প্রকৃতি ও পুরুষে) পরিণত হইয়াছে এবং ইহাদের মিলিতাবস্থা অর্থাৎ বোধিচিত্তের বর্ণনা করিতে যাইয়া তাহাকে পরম সুখময় অদ্বয় অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে মহাযানীদের মতে শূন্যতা এবং করুণা তাহাদের তত্ত্ব ও সাধনার মূল কথা। জগৎ সংসারের শূন্যতা-স্বভাব উপলব্ধিই পরমজ্ঞান বা প্রজ্ঞা এবং বোধিচিত্তলাভের পন্থা হিসাবে বিশ্বমৈত্রী বা করুণাই উপায়। এই প্রজ্ঞা (শূন্যতা) এবং উপায় (করুণা) ক্রমে নারী ও পুরুষ রূপে কল্পিত হইলেন।

১. কাপালং পাঞ্চরাত্রং যামলং বামমার্হতম্।
এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু ॥—কূর্ম, পূর্ব ১২।২৫৯ দ্র. তন্ত্রকথা পৃ. ১০-১৩

২. কৃপাণ ধারা গমনাদ্ ব্যাঘ্র কণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গ ধারণান্নূনমশক্যং কুলবর্ত্তনম্ ॥—কুলার্ণব ২

৩. অর্থাদ্ কামতোঘাপি সৌখ্যাদপি চ যো নরঃ।
লিঙ্গ যোনী রতো মন্ত্রী রৌরব নরকং ব্রজেৎ ॥—তন্ত্রসার, কুলাচার প্রকরণ।
(২ ও ৩ 'তন্ত্রকথা'য় উদ্ধৃত। বিস্তারিত আলোচনা উক্ত গ্রন্থে ১৮-২২ পৃ. দ্র.)

অবশ্য এখানে সাধারণ তান্ত্রিক ধারণার সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধারণার একটু পার্থক্য আছে। অন্যান্য তান্ত্রিক ধারণায় নারীই শক্তি আর বিশ্বসংসারের মূলে সেই প্রকৃতিই সক্রিয়, অন্যদিকে পুরুষ নির্গুণ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিবৃত্তিস্বরূপ। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকতায় পুরুষ বা উপায়ই সক্রিয়, অন্যদিকে পরম জ্ঞান—প্রজ্ঞা, বা প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়। সে যাহাই হউক, এই নারী এবং পুরুষ ধারণা প্রবেশ করাতেই তান্ত্রিকতাও অতি সহজে এবং সার্থকভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিল। এই প্রজ্ঞা উপায়ের মিলিতাবস্থা বোধিচিত্তও তাই শিবশক্তির মিলিতাবস্থা অদ্বয় (যুগনদ্ধ) বলিয়া পরিকল্পিত হইল।

তান্ত্রিক সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য কায়-সাধনার প্রাধান্য। ইড়া পিঙ্গলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রাণ অপান বায়ুকে সুষুম্না পথে প্রবাহিত করিয়া মস্তিকস্থ সহস্রার পদ্মে প্রেরণই তান্ত্রিক সাধকদের কাম্য। বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রজ্ঞা ও উপায় ক্রমে ইড়া এবং পিঙ্গলার সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং ললনা-রসনা, চন্দ্র-সূর্য, রবি-শশী ধমন-চমন, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হইযাছে। মধ্যনাড়ী সুষুম্না বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে অবধূতিকা—এবং ইহাব মধ্য দিযা প্রবাহিত বোধিচিত্ত, তান্ত্রিক চক্রের সাদৃশ্যে পরিকল্পিত নির্মাণচক্র হইতে উদ্ভূত হইয়া ধর্মচক্র, সম্ভোগচক্র ইত্যাদির মধ্য দিযা মস্তিষ্কস্থ মহাসুখচক্রে (পদ্মে) উন্নীত হয়। এইভাবে তন্ত্রোক্ত দেহসাধনা কিঞ্চিৎ বিকৃতি বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৌদ্ধতন্ত্রেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

তন্ত্রের অদ্বযই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার যুগনদ্ধ। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতরূপই যুগনদ্ধ। এই যুগনদ্ধকে মাঝে মাঝে আবার 'সমরস' বলিয়াও আখ্যাত করা হইয়াছে। অবশ্য সমরস বলিতে অদ্বয় অবস্থা উপলব্ধির ফল-স্বরূপ যে অনুভূতি সেই মহাসুখকেও বোঝান হইয়াছে।

বৌদ্ধদের লক্ষ্য নির্বাণ। দুঃখের ধারণা হইতেই তাহাদের ধর্মমতের উৎপত্তি। দুঃখ-নিবৃত্তি তাহাদের শেষকথা। সুতরাং তাহাদের লক্ষ্য নির্বাণ, স্বভাবতঃই, সুখময় হইবে ইহাই সাধারণের ধারণা। দার্শনিকভাবে নির্বাণ যে পরম অনুভূতি তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না, তাহা অনির্বচনীয়। কিন্তু সাধারণের নিকট এবং বহু পালি-গ্রন্থকর্তার নিকট নির্বাণ সুখময় বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। তন্ত্রের অদ্বয় অবস্থার অনুভূতিও মহাসুখের। পরবর্তী কালে এই দুই ধারণা এক হইয়া গিয়াছে। নির্বাণের সুখময় অনুভূতি,, যুগনদ্ধের সমরসরূপ সুখৈকানুভূতির সহিত এক হইয়া গিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

চর্যার ধর্মের সাধন-পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা চর্যার মধ্যে প্রকাশিত ধর্মমতের সাধারণ স্বরূপ এবং তাহার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছি। এবং ইহাও লক্ষ্য

করিয়াছি বৌদ্ধ কাঠামোর উপর তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতিগুলি নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি করিযাছে। চর্যাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে তন্ত্রের সেই কায়-সাধনা, ত্রিনাড়ী ও দেহের নানাবিধ চক্র ও পদ্ম পরিকল্পনা, দেহের মধ্যেই শিব-শক্তির মিলিত অদ্বয় অবস্থা দেহের বাহিরে সাধন সঙ্গিনীর সহিত মিলন পরিকল্পনার মধ্য দিয়া মহাসুখ লাভ—ইত্যাদি তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সাধন-পদ্ধতিগুলি—বৌদ্ধ কাঠামো ও পারিভাষিকের আবরণীতে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হইযাছে।

(চর্যাগুলিতে এই কায়-সাধনা, দেহপ্রাধান্য, ত্রিনাড়ীতত্ত্বটি কখনও বা স্পষ্ট ভাষায় কখনও বা অন্য কোন রূপক ইত্যাদির মাধ্যমে হেঁযালি ভাষায় বর্ণিত হইযাছে। কখনও নোকা বাহিবার বর্ণনা, কখনও ইঁদুরের রূপক, কখনও মত্তহস্তী, কখনও বা বাদ্যযন্ত্রের রূপকের মধ্য দিয়া ইহা বর্ণিত হইযাছে। এগুলি বিশ্লেষণ করিলে সর্বত্রই যোগ-সাধন-পদ্ধতির বর্ণনাই পাওযা যাইবে। প্রতি চিত্রই গুহ্য তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিত বহন করে।[১] প্রথম চর্যাতেই উক্ত হইযাছে—'ধমণ-চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা'—ধমন ও চমন এই যুক্ত পিড়িব উপব বসিযা। এই ধমন চমন—বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ভাষান্তরিত ইড়া পিঙ্গলা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না চর্যাপদগুলি মধ্যে বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইযাছে। তন্ত্রের পিঙ্গলা—মহাযানী বৌদ্ধদের 'উপাযই' বৌদ্ধতন্ত্রে—রসনা, সূর্য, রবি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, যমুনা, গ্রাহ্য এবং 'বং'—ইত্যাদি নামে অভিহিত হইযাছে। অন্যদিকে তন্ত্রের ইড়া, মহাযানী বৌদ্ধদের 'প্রজ্ঞা'—বৌদ্ধতন্ত্রে আসিযা ললনা, চন্দ্র, শশী, অপান, ধমন, আলি, নাদ, গঙ্গা গ্রাহক, এবং 'এ' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিযাছে। মধ্যনাড়ী সুষুম্না বৌদ্ধতন্ত্রে অবধূতী, অবধূতিকা;—ইনিই শুণ্ডিণী, ডোম্বী, চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজ-সুন্দরী ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[২] পূর্বোদ্ধৃত পংক্তিটিতেও ধমন-চমন যুক্ত পিড়ির উপর উপবেশন—ইড়া পিঙ্গলার প্রাণ অপান বায়ুকে সুষুম্না পথে পরিচালিত করিবার ইঙ্গিতই বহন করিতেছে। অনুরূপ প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাই—

'এক সে শুণ্ডিনীণি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ॥
সহজে থির করি বারুণে সান্ধে॥
জেঁ অজরামর হোই দিঢ়কান্ধঃ॥

এক শুণ্ডিনী (অবধূতিকা) দুইকে (বাম ও দক্ষিণ নাড়ীদ্বয়কে; চন্দ্রসূর্যে)

---

১. "These images imply certain yogic processes"—Studies in the Tantras. Dr. P. C. Bagchi, P. 80.

২. এই নামগুলির বিস্তারিত তাৎপর্যের জন্য ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের Introduction to Tantric Buddhism দ্র.।

বাম-দক্ষিণৌ · দ্বৌ—টীকা) ঘরে (মধ্যমায়, মধ্যনাড়ীতে) প্রবেশ করান। চিকণ (অবিদ্যা-মলশূন্য) বাকল দ্বারা (সুখপ্রমোদ স্বরূপ) বোধিচিত্তকে বন্ধন করেন। (বোধিত্তরূপ) বারুণী সহজানন্দে প্রবেশ করে—যাহার দ্বারা অজরামর হইযা দৃঢ়স্কন্ধ লাভ করে। এখানেও অবধূতিকা কর্তৃক বাম দক্ষিণ দুই নাড়ীকে মধ্য পথে পরিচালনা এবং পরে চিত্তের মহাসুখরূপ সহজানন্দ লাভের ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট।

ভবণই গহণগম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ।।
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই ।।

* * *

সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিঅড্ডী বোহি দুর ম জাহী ।। (৫)

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর দুই তীর কর্দমাক্ত—মাঝখানে থই পাওয়া যায না। ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গঠন করিল। পারগামী লোকে নির্ভয়ে তরিযা গেল। সাঁকোতে চড়িলে বাম দক্ষিণ হইও না। বোধি নিকটেই আছে, দূরে যাইও না। আপাতদৃষ্টিতে এখানে ভব-সংসারকে নদী-স্রোতের সহিত তুলনা -(স্রোত সোধবৎ) এবং মধ্য পথ অবলম্বনের নির্দেশ (মধ্যমা প্রতিপদ)—ইত্যাদিতে বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ববর্ণনাই কবিতাটির উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। বস্তুত পদটির পরিকল্পনায় বৌদ্ধদর্শনের কাঠামোটি সার্থকভাবে কার্যকরী।[১] কিন্তু ইহাকে ছাপাইয়াও ইহার মধ্যকার তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। ভবনদী এখানে দেহমধ্যস্থিত নাড়ীগুলি সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে। ভবনদীর দুই তীর কর্দমাক্ত অর্থাৎ বাম-দক্ষিণের দুই তীর বিষয়াসক্তির দিকে লইয়া যায়। মধ্যপথ গভীর—অর্থাৎ পরম সত্য গভীর। সাঁকো সংবৃতি ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের মিলন বুঝাইতেছে। যখন কেহ সাঁকোতে চড়ে অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্তকে পরিণত করিবার সাধনায় নিযুক্ত হয় তখন যেন সে বাম-দক্ষিণে না যায়—অর্থাৎ মধ্যনাড়ীর ভিতর দিয়াই পরমসত্য লাভে তৎপর থাকে।

অন্য একটি পদেও কাহ্নুপাদ বলিয়াছেন—আলি এবং কালি (ইড়া, পিঙ্গলা) পথ (মধ্যপদ—সুষুম্না—অবধূতি মার্গ) রুদ্ধ করিল; তাহা দেখিয়া কাহ্ন বিমন হইলেন—'অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা ।।' (৭) অনুরূপ আর একটি পদেও পাই—

বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা।
বাটত মিলিল মহাসুহ সঙ্গা ।। (৮)

১. বর্তমান গ্রন্থের 'দার্শনিক পটভূমি' অধ্যায় দ্র.

বাম দক্ষিণকে চাপিয়া পথের সহিত মিলিয়া মিলিয়া (বিরমানন্দের পথে যখন) চলিলাম তখন পথেই মহাসুখের সঙ্গ মিলিল। পরবর্তী পদেও আছে—

এবং কার দৃঢ় বাখোড় মোড়িউ।
বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ ॥
কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ (৯)

'এ' এবং 'বং' (চন্দ্র এবং সূর্য নাড়ী) দৃঢ় স্তম্ভ দুইটিকে মর্দিত করিয়া এবং বিবিধ বিপাকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া কাহ্নু সহজানন্দরূপ পদ্মবনে প্রবেশ করিয়া আসবমত্ত হইল। অর্থাৎ আলি-কালি বা বাম-দক্ষিণ নাড়ীদ্বয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিযা তাহাদিগকে প্রকৃতি-দোষমুক্ত করিযা আযত্তে আনিযা কৃষ্ণাচার্য মহাসুখ-কমলবনে প্রবেশ করিলেন। কাহ্নুপাদ আর একটি পদেও বলিয়াছেন—

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ আভরণে ॥ (১১)

এখানে আলি-কালি, রবি-শশী অর্থাৎ দুই দিকের দুই নাড়ীর উপর পরিপূর্ণ প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। আলি-কালিকে চরণের নুপুর এবং রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণে পরিণত করা অর্থাৎ তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার এখানে উদ্দিষ্ট।

ডোম্বীপাদ তাঁহার একটি পদের মধ্যেও এই নাড়ীদ্বয় এবং মধ্যপথে তাহাদের প্রবেশ করানোর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥

* * *

চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই বাহতু ছন্দা ॥ (১৪)

গঙ্গা-যমুনার মধ্যে (মধ্যপথে) নৌকা প্রবাহিত হয়। সেখানে নিমজ্জিত সহজানন্দ প্রমত্তাঙ্গী ডোম্বী[১] সন্তানকে অন্তপারে লইয়া যায়। চন্দ্র-সূর্য দুই চাকা; সৃষ্টি সংহারের অদ্বয় অবস্থা পুলিন্দ (মাস্তল)। বাম দক্ষিণ দুই পথ দেখা যাইতেছে না—আনন্দে বাহিয়া যাও। এখানে চন্দ্র, সূর্য, গঙ্গা, যমুনা, বাম-দক্ষিণের নাড়ীদ্বয়কেই বুঝাইতেছে।

বীণাপাদের একটি পদেও আমরা পাই—

সুজ লাউ শশি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥

* * *

১. ডোম্বীর ব্যাখ্যা পরে দ্র.।

আলি কালি বেণি সারি মুণেআ।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ॥ (১৭)

সূর্যকে লাউ এবং শশীকে তন্ত্রী করিয়া এবং অবধূতীকে দণ্ড করিয়া (বীণাপাদ একটি বীণা করিয়াছেন)। আলি-কালির যুক্ত স্বর শুনিয়া গজবর (চিত্ত) সমরসে প্রবিষ্ট হইল। এখানে সূর্য এবং চন্দ্র স্পষ্টতই বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী। সরহ-পাদও বলিয়াছেন—'বাম দাহিণ জো খাল বিখলা। সরহ ভণই বপা উজুবাট ভইলা॥' (৩২) বাম-দক্ষিণে খাল বিখাল; সহজ পথই নিরাপদ পথ।

এইরূপ বহু পদেই কায়সাধনার তত্ত্বটি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। চর্যার বহু পদে দেহপ্রাধান্যের কথাও আছে। তন্ত্রে দেহকে যেমন সকল সত্যের আধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, চর্যাপদগুলিতেও অনুরূপ উক্তি লক্ষ্য করা যায়। কাহ্নুপাদ একটি পদে বলিতেছেন—

কাহ্ন কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহনঅরী বিহরএ এ[কা]কারেঁ। (১১)

কাহ্নুপাদ কাপালিক যোগী হইয়াছেন, এবং যোগাচারে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি অদ্বয়ভাবে দেহনগরীর মধ্যেই বিহার করিতেছেন। চর্যাপদগুলির অনেক স্থানেই দেহকে নৌকা করিয়া সাধনার কথা বলা হইয়াছে। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ এই দেহনৌকাকে জগৎসংসারে বাহিয়া চলিবার কথা চর্যাকারেরা বলিয়াছেন—

কাঅ ণাবড়ি খাণ্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল॥
চীঅ থির করি ধ[রি]হুরে নাই।
অণ উপায়ে পার ণ জাই॥ (৩৮)

ভবসমুদ্রের মধ্যে কায়া হইতেছে নৌকা, খাঁটি মন দাঁড়। সদ্‌গুরুর বচনে হাল ধরিতে হইবে। চিত্ত স্থির করিয়া নৌকা ধরিতে হইবে—অন্য কোন উপায়ে পারে যাওয়া যাইবে না।[১]

বৌদ্ধতান্ত্রিক মতে পরম সত্য দেহের মধ্যেই আছেন। তিনি দেহের কোথায় কি ভাবে আছেন—কি উপায়েই বা তাঁহার উপলব্ধি হয় তাহার আলোচনাও তাঁহারা করিয়াছেন। পূর্বেই দেখিয়াছি মহাযানীরা বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে

১. এই দেহের ভিতরই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড—এই দেহেই সাধনা, এখানেই পরমসিদ্ধি—এই তত্ত্বটি তান্ত্রিক। মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনায় এই তত্ত্বটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধ দোহাগুলিতেও এই তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে স্থান পাইয়াছে—

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥
ক্ষেত্তু পীঠ উপপীঠ এথু মই ভমই পরিঠ্‌ঠও।
দেহা সরিসঅ তিত্থ মই সুহ অণ্ণ ণ দীঠ্‌ঠও॥ বৌদ্ধগান ও দোহা, পৃ. ৯২-৯৩

বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা ত্রিকায় পরিকল্পনা করিয়া বুদ্ধের তিনটি স্তরভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মহাযানী বৌদ্ধদের এই ত্রিকায় কল্পনা তন্ত্রের ষট্‌চক্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তন্ত্রে দেহের মধ্যে ছয়টি চক্রের কল্পনা করা হইয়াছে—যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা। মূলাধার চক্রে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া চক্রষটকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া মস্তিষ্কস্থিত সহস্রার পদ্মে শিবের সহিত মিলিত করাই তান্ত্রিকদের কাম্য। বৌদ্ধতন্ত্রেও দেখা যায় বোধিচিত্ত প্রথম উৎপন্ন হয় নাভিদেশে, নির্মাণচক্রে (নির্মাণ কায়ে); সেখান হইতে তাহাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রে (ধর্ম কায়ে) উন্নীত করিতে হয় এবং তৎপরে কণ্ঠে অবস্থিত সম্ভোগচক্রে (সম্ভোগ কায়ে) তাহা উপনীত হয়। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিকায় পরিকল্পনা বৌদ্ধতন্ত্রে আসিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে—কারণ নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম এই ক্রম অনুসারে হৃদয়স্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল সম্ভোগ-চক্র এবং কণ্ঠস্থিত চক্র হওয়া উচিত ছিল ধর্ম-চক্র। তাহা না হইয়া হৃদয়ে ধর্ম এবং কণ্ঠে সম্ভোগ হইয়াছে। যাহা হউক, এই তিনটি চক্রের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা সহস্রারের অনুকরণে আর একটি কায় কল্পনা করিয়া মহাসুখকায় বা মহাসুখচক্র (মহাসুখকমল) ইহার সহিত জুড়িয়াছেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের এই চারিটি কায় পরিকল্পনার সহিত মিশিয়াছে শূন্যতার চারিটি বিভাগ।[১] পরম সত্য শূন্য স্বরূপ; সেই শূন্যের চারিটি বিভাগ। পরম সত্যের অবস্থানের চারিটি স্তর বা চক্র পরে তাই চারি শূন্যের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

বোধিচিত্তের দুইটি রূপ—সংবৃতি ও পারমার্থিক। সংবৃতি বোধিচিত্তের স্বরূপ—চঞ্চল ও নিম্নগ। ইহাকে ঊর্ধ্বগ করাই সাধনা। অবধূতিকার পথে প্রজ্ঞা ও উপায়কে মিলিত করিয়া বোধিচিত্তকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে ক্রমে বিভিন্ন

এই দেহেই সুরেশ্বরী (গঙ্গা) ও যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর; এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এখানেই চন্দ্র, সূর্য, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ; ইহার চারিদিকে আমি ভ্রমণ করি। এই দেহসদৃশ তীর্থে যে সুখলাভ হয় এমন আমি কোথাও দেখি নাই।

ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই ঘরে বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়িবেশী পুচ্ছই॥ ঐ, পৃ. ১০১

অর্থাৎ পরম সত্য ঘরেই আছে, তাহাকে বাহিরে দেখিতেছ? পতিকে দেখিতেছ অথচ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?

পণ্ডিঅ সঅল সথ বক্‌খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥—ঐ, পৃ. ১০৩

পণ্ডিতেরা সত্য ব্যাখ্যা করে, কিন্তু দেহের মধ্যেই যে বুদ্ধ বসন্ত তাহা জানে না। কবীর দাদূ ইত্যাদির মধ্যেও অনুরূপ দেহতত্ত্বের সুন্দর সুন্দর পদ লক্ষ্য করা যায়।

দ্র. Obscure Religious Cults, P. 412-416; ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ৪০-৪১; ভারতীয় সাধনার ঐক্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ৩০

১. বর্তমান গ্রন্থের 'দার্শনিক পটভূমি' অধ্যায় দ্র.।

চক্রের মধ্য দিয়া সহজ চক্রে উন্নীত করিলে সেই বোধিচিত্তই হয় পারমার্থিক বোধিচিত্ত। তখন তাহা হয় পরমানন্দের কারণ, মহাসুখ স্বরূপ। নাভিদেশে নির্মাণচক্রে তিনি চণ্ডালী, শবরী, ডোম্বী (ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করা যায় না বলিয়া তিনি 'অস্পর্শা', তাই ডোম্বী)।

খেপহুঁ জোইনি লেপ ন জাঅ।
মণিকূলে বহিআ ওডিআণে সমাঅ॥ (৪)

যোগিনী স্বস্থান যোগবশতঃ মণিমূলে লিপ্ত হইতে পারে না। মণিমূল বহিয়া ঊর্ধ্বদিকে গমন করে। অর্থাৎ বোধিচিত্তের স্বস্থান—মহাসুখচক্র। এই হেতু প্রথম উৎপত্তি যদিও তাহার মণিমূলে, তবুও তাহা ঊর্ধ্বগ হইতেছে এবং মহাসুখ-কমলে প্রবেশ করিতেছে।

অধরাতিভর কমল বিকসিউ।
বতিস জোহনী তসু অঙ্গ উহ্লসিউ॥

* * *

চালিঅ ষষহর গউ নিবাণেঁ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ। (২৭)

অর্ধরাত্রি ভোর কমল বিকশিত হইল, বত্রিশ যোগিনী তাহাতে অঙ্গ উল্লসিত করিতেছে। শশধর নিবাণে গিয়া চলিল, কমলিনী কমল-প্রণালে প্রবাহিত হইল। কমল অর্থাৎ উষ্ণীষ কমল প্রজ্ঞা জ্ঞানাদি অভিষেক সময়ে বিকশিত হইল, বত্রিশ যোগিনী (ললনা রসনা ইত্যাদি বত্রিশ নাড়ী) আনন্দে উল্লসিত হইতেছে। শশধর অর্থাৎ চিত্ত-শশধর নির্বাণে অর্থাৎ বজ্রশিখরাগ্রে, বজ্রকায়ে প্রবিষ্ট হইল। কমলিনী, পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা কমলপ্রণালে (মহাসুখের পথে) প্রবাহিত হইল।

শবরী আমাদের দেহের মধ্যেই উঁচু উঁচু পর্বতে বাস করেন। 'উঁচা উঁচা পাবত তহি বসহি সবরী বালী'। দেহমধ্যস্থিত এই উঁচু পর্বতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টীকাতে তাই বলা হইয়াছে—'যোগীন্দ্রস্তম্ভকায়কঙ্কাল দণ্ডমুন্নতং সুমেরু শিখরাগ্রে মহাসুখচক্রে'। আর একটি চর্যাতেও আছে—

এক সো পদমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ (১০)

এক সে পদ্ম চৌষট্টি পাপড়ি, তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী ও বাপুড়ী। পদ্ম এখানে নির্মাণচক্র। এখানে মহারাগআনন্দসুন্দর (কৃষ্ণাচার্য) ডোম্বীর সহিত নৃত্য করিতেছেন। চর্যার অনেক স্থানেই এই দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন চক্রের (পদ্মের) কথার উল্লেখ আছে। 'সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাত্রি পোহাই।' শূন্যস্বরূপ নৈরাত্মাকে কণ্ঠে অর্থাৎ কণ্ঠস্থ সম্ভোগচক্রে লইয়া রাত্রি পোহাই। কিম্বা 'বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলই'। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তোমাকে কণ্ঠ

(সম্ভোগ চক্র) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না। অনুরূপ 'কণ্ঠে নৈরামণি বালি জগন্তে উপাড়ি'।—ইত্যাদি।

চর্যাগীতিগুলির মধ্যেকার এই শবরী, ডোম্বিনী, ডোম্বী, চণ্ডালী, যোগিনী, নৈরামণি-ই তন্ত্রোক্ত শক্তি। বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই শক্তির উদ্ভব ও উর্ধ্বে গমন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বিভিন্ন আলোচনা হইতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে অন্তত তত্ত্বের দিক দিয়া এই চণ্ডালী বা ডোম্বী, শবরী ইত্যাদি দেহধারী সাধনসঙ্গিনী নহেন—ইঁহারা দেহমধ্যস্থ শক্তিরই বিভিন্ন নাম মাত্র। প্রজ্ঞা ও উপায়কে অবধূতী মার্গে প্রথম মিলিত করিবার মুহূর্তে মণিমূলে জাগ্রত এই শক্তিই চণ্ডালী, ডোম্বী ইত্যাদি নামে অভিহিত। ইনিই আবার যখন সম্ভোগচক্রে অবস্থিত হন তখন বেশির ভাগ চর্যাতেই নৈরামণি বা নৈরাত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আবার মহাসুখ-চক্রে উন্নীত হইয়া ইনিই হইয়াছেন—সহজ-সুন্দরী। এই শক্তি তন্ত্রমতে শিবের গৃহিণী এবং বৌদ্ধতন্ত্রে এই সহজ-সুন্দরী-নৈরামণি বজ্রসত্ত্বের গৃহিণী হইলেও কাব্যের মধ্যে ইনি অনেক স্থানেই সিদ্ধিকামী তান্ত্রিকের প্রেমিকা বা সাধন-সঙ্গিনী হিসাবে কল্পিত হইয়াছেন। অবশ্য তত্ত্বের দিক দিয়া তন্ত্রের মধ্যে এরূপ প্রেমের পরিকল্পনা না থাকিলেও পরবর্তী কালে ইহার আগমন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রেমের রূপক এবং চিত্রাদির বর্ণনা হইতে অনেকে মনে করেন তন্ত্রোক্ত শক্তি 'চণ্ডালী' ক্রমে বাস্তবের সাধন-সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন।[১] বৌদ্ধতন্ত্রে (হেবজ্রতন্ত্র) মন্ত্র-উপাদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—অধিকারী ভেদে মন্ত্র বিভিন্ন ; সুতরাং মন্ত্র নিরূপণের জন্য কুল নির্ণয়ের প্রয়োজন। বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চ কুল—বজ্র, পথ, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। ইহাদের আবার অন্য নামও ছিল—ডোম্বি, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী, চণ্ডালী। কুলের এই বিভিন্ন নামকরণ সাধন-সঙ্গিনীর পর্যায়ভেদ হইতেও হওয়া অসম্ভব নহে—অথবা হয়ত এই নামগুলি কুলভেদে সাধন-সঙ্গিনী ভেদের কথাই সূচিত করে।[২] সে যাহাই হউক, পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—তন্ত্রের শক্তি-পরিকল্পনা বিকৃত হইয়া রক্ত-মাংসের দেহধারী সাধন-সঙ্গিনীতে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অসম্ভব নাও হইতে পারে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ক্ষেত্রেও অনেকের বাস্তব সাধন-সঙ্গিনী ছিল—এবং যে-সমস্ত পদের মধ্য দিয়া এই প্রেম, সুরত ইত্যাদির কথা উল্লিখিত হইয়াছে—(১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি)—সেগুলি তাহারই ছায়া বহন করে। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে—ইহা তত্ত্বের দিক দিয়া সমর্থিত ছিল না।

চর্যাপদগুলির মধ্যে 'মহাসুখের'ও সুন্দর বর্ণনা আছে। মহাসুখ আনন্দময়

---

১. চণ্ডীদাসের রজকিনী—সাধনসঙ্গিনী এবং সম্ভবত সাধনার কুলবিজ্ঞাপকও বটে।—বাঙালীর ইতিহাস, ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬৩০।

২. দ্র. চর্যাপদের ধর্মমত, ড. সুকুমার সেন। ভারত সংস্কৃতি, পৃ. ২৯৬

অবস্থা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থাতেই মহাসুখের উদ্ভব। বোধিচিত্ত যখন নির্মাণচক্রে অবস্থান করে তখন যে আনন্দলাভ হয় তাহা শুধু আনন্দ বা প্রথমানন্দ। বোধিচিত্তের ধর্মচক্রে উপস্থিতিতে যে আনন্দ তাহার নাম পরমানন্দ, সম্ভোগচক্রে উপস্থিতিতে বিরমানন্দ এবং মহাসুখচক্রে সহজানন্দ। ইহাদের বিচিত্রানন্দ, বিপাকানন্দ, বিবমানন্দ, ও সহজানন্দ—এরূপ নামকরণও আছে। যাহা হউক, এই মহাসুখ বা সহজানন্দে যোগীর কিরূপ অবস্থা হয় তাহার দীর্ঘ বর্ণনা বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে; এই মহাসুখের অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি যেন ঘুমাইয়া পড়ে, মন যেন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয়, দেহ যেন মহাসুখে মূর্ছিত হয়।[১] এই অবস্থায় উপনীত হইলে সমস্ত মায়িক জগতের উপলব্ধি নষ্ট হয়, আত্মপর ভেদ থাকে না, ভবমোহ বিলুপ্ত হয়, শূন্যতা জ্ঞান লাভ হয়। সাধক তখন প্রমত্তের মত অবস্থান করেন। চর্যার মধ্যেও আমরা পাই—

ঘুমই ন চেবই সপরবিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিল লাঙ্গা॥
চেঅণ ণ বেঅন ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা॥ (৩৬)

কাহ্নু সহজ নিদ্রায় অভিভূত—তিনি আত্মপর বিভাগ করিতেছেন না। তাঁহার চেতন বেদন কিছুই নাই, সমস্ত সুফল করিয়া তিনি সুখে নিদ্রাভিভূত আছেন।

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না
কান্ধ বিয়োএ মা হোহি বিসন্না॥ (৪২)

চিত্তসহজ দ্বারা শূন্য-সম্পূর্ণ, স্কন্ধ বিয়োগ দ্বারা আর বিষণ্ণ হইও না।

কাহ্ন বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা॥ (৯)

কাহ্নু সহজরূপ নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া আসব-মত্তের মত বিলাস করিতেছেন।

মহারসপানে মাতেলরে তিহুঅণ সএল উএখী।
পঞ্চ বিসঅ নায়করে বিপখ কোবীন দেখি॥ (১৬)

মহারস (সহজানন্দ) পানে মত্ত চিত্ত, ত্রিভুবনে সকল উপেক্ষা করে; পঞ্চ বিষয়ের নায়ক হইয়া অর্থাৎ নিজেই বজ্রসত্ত্ব হইয়া কাহাকেও শত্রু দেখে না।

উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ॥
পেখরে ভুসুকু সহজ সরুআ॥
জাসু সুণন্তে তুটই ইন্দিআল।
নিহুয়ে ণিঅমণ দে উল্লাস॥ (৩০)

---

১. ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীবচ।
নষ্ট চেষ্ট ইবাভাতি সৎসুখ মূর্চ্ছিতঃ।—(বাক্তাবাহুগত তত্ত্বসিদ্ধি) Obscure Religious, Cults পৃ. ১২৭-এ উদ্ধৃত।

গগনে আশ্চর্য সহজানন্দ উদিত হইয়াছেন, দেখ ভুসুকু সহজ স্বরূপ। ইহা দেখিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়জাল ছিন্ন হয়, মন আনন্দে মত্ত হয়।—এরূপ উদাহরণ, চর্যাপদে প্রচুর পাওয়া যায়

চর্যার সাধক-কবিদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এতক্ষণ আমরা চর্যার ধর্মমত অর্থাৎ তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব—বিবর্তন—ও তাহার সাধন-পদ্ধতি ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছি। চর্যার ধর্মমত স্বরূপে যাহাই হউক এবং ইহার সাধন-পদ্ধতি তান্ত্রিকই হউক আর যাই হউক—ইহাদের ধর্মের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। মধ্যযুগের সাধনায় সমন্বয়ের কথা স্মরণ রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে এই তান্ত্রিক মতের সহিত অন্যান্য মতের কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যাইবে—এবং অন্যান্য কিছু কিছু ধর্মের প্রভাবও যে ইহার উপর না পড়িয়াছিল, তাহা নহে। এই সমন্বয় ও সাদৃশ্যের মূল কারণ চর্যার সাধকদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে চর্যার সাধকেরা ছিলেন 'সহজিয়া'।

বাঙ্গালীর তথা ভারতীয় সংস্কৃতি-সাধনার ধারা বিশ্লেষণ করিলে সর্বত্রই অল্পবিস্তর দুটি উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, একটি আর্য উপাদান, অপরটি আর্যেতর। এই আর্যেতর উপাদানের মধ্যে অন্যতম তান্ত্রিক যৌগিক সাধন-পদ্ধতি[১] কখনও পরোক্ষভাবে কখনও প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বিভিন্নযুগে দার্শনিকতা-ভিত্তিক যে সমস্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তান্ত্রিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের সহিত মিশিয়া বারবার তাহা বিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এইভাবেই বেদাচার-প্রতিবাদী, জ্ঞান ও মনন মার্গ বিরোধী, দেহভিত্তিক যোগসাধন পদ্ধতি 'সহজ-সাধনার' ভিত্তি রচনা করিয়াছে। যুগে যুগে এই বিশিষ্ট সাধনার ধারা বিভিন্ন সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত মিশিয়া বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। সহজিয়া বলিতে প্রথমত তাই কোন সম্প্রদায়কে না বুঝাইয়া একটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই বোঝায়। এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি স্মরণাতীত কালের সর্বভারতীয় ঐতিহ্য, যদিও বাংলা দেশে ইহার যতখানি প্রতিষ্ঠা অন্যত্র তত নহে।

১. "...a great deal of Indian roliglous and cultural, traditions...is just non-Aryan translated in terms of Aryan speech...the ideas of karma and transmigration, the practice of yoga, the religious and philosophical ideas centering roung the conception of the divinity of Siva and Devi and Viahnu ; the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa, all these and much more in Hindu religion and thought could appear to be non-Aryan in origin.—Indo-Aryan and Hindi, Dr. S. K. Chatterjee. Pp 3?-34.

আনুমানিক অষ্টম/নবম শতাব্দী হইতে সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া বাঙলা দেশের বিবর্তিত —বৌদ্ধধর্ম, কৌলধর্ম, নাথ-পন্থ, সহজিয়া-বৈষ্ণব-ধর্ম বাউল ইত্যাদি সকল মত ও পথের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য ছিল, তেমনি সাদৃশ্য ছিল ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। সকলেই ছিলেন অল্প বিস্তর সহজিয়া, যদিও সহজিয়া বলিতে সাধারণ প্রচলিত অর্থে অনেক সময়ই কেবল মাত্র বৈষ্ণব সহজিয়াদিগকেই বোঝায়।

অন্যান্য সহজিয়াদের মত বৌদ্ধ সহজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গির ও প্রধান বৈশিষ্ট্য—ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, রীতিনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব। তাঁহাদের মতে পরমসত্যলাভ আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন অথবা জপতপ-ধ্যান-ধারণা,—জ্ঞানচর্চা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। পরমসত্য কেবলমাত্র সহজ তত্ত্বে দীক্ষা ও যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়া অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যোগাভ্যাসই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা, কারণ কঠিন সংযম পালনের মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে তাহা মানুষকে রোগগ্রস্ত করিয়া তোলে। সহজিয়ারা মানুষের সহজ স্বভাবকে পীড়িত না করিয়া স্বভাবসম্মত পন্থাতেই সত্যোপলব্ধির নির্দেশ দান করিয়াছেন অবশ্য তাই বলিয়া ইহাদের মধ্যে যে নৈতিকতার অভাব ছিল একথা মনে করিবার কারণ নাই। সহজিয়ারা মানবিক বৃত্তির উপরই ধর্মসাধনার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। এ কথার অর্থ এই যে, তাঁহারা স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিয়া ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের রূপান্তর ও উর্দ্ধগতির (Sublimation) কথা বলিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহারা 'সহজিয়া'। তাঁহাদের ধর্মমত একদিকে যেমন সহজ অর্থাৎ সরল অন্যদিকে জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সহ-জ অর্থাৎ জন্মগত। চর্যাপদগুলির মধ্যেও এই প্রতিবাদের মনোভাব, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিতৃষ্ণা এবং সহজ পথের প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝাণ বখাণে।
অপইঠান মহাসুহলীণে দুলখ পরম নিবাণেঁ॥ (৩৪)

মন্ত্রে তন্ত্রে ধ্যান ব্যাখ্যানে কিছুই হয় না। মহাসুখলীলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে পরম নির্বাণ লাভ হয় না।

সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥ (১)

সকল সমাধি দ্বারা কি হইবে—সুখ দুঃখেতে নিশ্চিত মরিবে।—এই সমস্ত জপতপ তন্ত্র, মন্ত্র, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি নানা প্রকার অনুষ্ঠানের বক্র পথের প্রয়োজন নাই —সহজ ঋজুপথ গ্রহণ কর। বোধি নিকটেই আছে; তাহার জন্য আবর্তিত পথেরও প্রয়োজন নাই—দূরে যাইবারও প্রয়োজন নাই।—যাঁহারাই এই সহজ পথে গিয়াছেন তাঁহারাই মুক্তির পরপারে গিয়াছেন। 'উজুরে উজু ছাড়ি মা লেহুরে

বান্ধ।' 'জে জে উজুবাটে গেলা, অনাবাটা ভইলা সোই।' সহজ পথই যখন ইহাদের কাম্য এবং আচার-অনুষ্ঠানে বিতৃষ্ণাই যখন ইহাদের স্বভাব, তখন জ্ঞানচর্চার পথও ইহাদের পথ নহে। বস্তুত সহজ স্বরূপ স্ব-সম্বেদ্য; আগমবেদ পুথি পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, তাই তাহার কোন সার্থকতাও নাই।

জাহের বান চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥ (২৯)

যাহার (সহজের) বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না তাহার কথা আগমবেদ ইত্যাদিতে ব্যাখ্যা করে কি করিয়া? অথবা—

জো মণগোএর আলজালা।
আগম পোথী ইষ্টা মালা॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ॥ (৪০)

আগম পুথি ইষ্টমালা এবং সকল মনগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্পৃষ্ট বিষয়াদি ইন্দ্রজালতুল্য। সহজের ব্যাখ্যা করা যায় না। কায় বাক্ চিত্ত কিছুই তাহাতে প্রবেশ করে না।

অবশ্য 'সহজ' সম্পর্কে এই নেতিমূলক দিক ছাড়াও সহজিয়াদের সহজ সম্পর্কে একটি ইতিমূলক মনোভাবও ছিল। সহজিয়াদের মতে পরম সত্যের স্বরূপই— 'সহজ'। এই সহজের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রায় উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার তুল্য। কিন্তু তাহার সহিত মিলিয়া গিয়াছে আরও অনেক রূপ ও স্বরূপ। সহজ স্ব-সম্বেদ্য, অবর্ণনীয়. অনির্বচনীয়; ইনিই নির্বাণ, তথতা; ইনিই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পরম সত্য—ইনিই আবার বিজ্ঞপ্তি মাত্রতা। ইনি একদিকে বজ্রসত্ব অন্যদিকে আবার শূন্যতা করুণার মিলিত অবস্থা—মহাসুখ সহজের পরিকল্পনায়—এইরূপ বহুযুগের ধ্যান ধারণার সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। এই সহজই সাধকদের মতে—সমস্ত কিছুর কর্তা, ধাতা, চরম সত্য, পরম লক্ষ্য— শেষ সিদ্ধি।

চর্যার সাধক কবিদিগের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদে বিশ্বাস। সহজ সাধনায় পরমার্থকে বাহিরে কোথাও অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই, পরম সত্তার অবস্থান দেহভাণ্ডে; ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড। এই তত্ত্বের ফলে সহজিয়াদের মধ্যে একদিকে যেমন কায়-সাধন পদ্ধতির অনুসরণ অন্যদিকে তেমনি মানুষের দেহই ভগবানের অধিষ্ঠান এই বিশ্বাসের ফলে মানুষের মহিমাবৃদ্ধি ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব। চর্যাগীতির মধ্যে এই ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডবাদের নিদর্শন প্রচুর। [৩ অনুচ্ছেদে আলোচনা দ্র.]

সমস্ত তান্ত্রিক তত্ত্ব ও সহজিয়া সাধনপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ গোপনীয়তা

গুরুর উপর নির্ভরশীলতা চর্যার সাধক কবিদের মধ্যেও লক্ষণীয়। তান্ত্রিক তত্ত্ব অতি গুহ্য ; বাহিরের অদীক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ্য নহে। সেই জন্যই সমস্ত সহজিয়াদের মধ্যেই হেঁয়ালিপূর্ণ সন্ধ্যা বা সন্ধাভাষার প্রয়োগ ব্যাপক। [ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা দ্র.] কেবলমাত্র দীক্ষিত সাধকই পদে পদে সদ্‌গুরুর প্রসাদে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ক্রিয়াকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমাত্রেই গুরুর প্রাধান্য স্বাভাবিক। তন্ত্র একান্তই গুরুপ্রধান তাহাতে তাই গুরু ব্যতীত এক পাও চলিবার উপায় নাই।[১] তন্ত্রভিত্তিক বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ইত্যাদি সব ধর্মেই গুরুব স্থান অতি উচ্চে। সুফী মতেও মুর্শীদের উচ্চাসন লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের সন্ত-সাধক কবীর দাদূ রামানন্দ ইত্যাদির সাধনাও গুরুবাদী। চর্যার সাধকেরাও স্বভাবতই গুরুবাদী। চর্যায় তত্ত্বের কথা, পদ্ধতির কথা, সবই আছে কিন্তু সর্বোপরি আছে গুরুর উপর নির্ভর করিবার কথা। 'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ' (১)—লুই বলিতেছেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিযা পথের সন্ধান জানিযা লও। 'জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী/পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী। (৫)—যদি তোমরা পারগামী হইবে তবে অনুত্তরস্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর। এই 'গুরু' আবার বজ্রযানের প্রভাবে হইয়াছেন বজ্রগুরু—'বাজুলে দিল মো লকখ ভণিআ'—বাজুলে (বজ্রগুরু) আমাকে লক্ষ্য বলিয়া দিয়াছেন। চর্যাগীতির সর্বত্র এই গুরুপ্রাধান্যের কথা এত প্রচুর যে বিস্তারিত উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল ও নাথপন্থ : বিবর্তনের ধারা

গুপ্তপূর্ব যুগের বাঙ্গালীর সাধনাব পবিচয নিঃসংশযে জানা যায় না, তবে অনুমান করা চলে এই সাধনার ধারা ছিল অবৈদিক আর্যেতর ধর্ম সাধনা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মারফৎ এই যুগেই আর্য সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালীর সামান্য পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। (বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বেদ-বিরোধী হইলেও আর্য সংস্কৃতির পন্থানুসারী।) গুপ্ত সম্রাটগণের দুইশত বৎসরের শাসনকালেই বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সহিত বাঙ্গালীর বেশ ভালভাবেই পরিচয় ঘটে। তবুও এযুগে পূজিত দেবদেবীর পরিচয় এবং সাধন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে হিন্দু তান্ত্রিকতার বাহুল্যই লক্ষিত হইবে। গুপ্তযুগের পর পালযুগকে বলা যায় বৌদ্ধযুগ। অবশ্য পালযুগের বাংলার বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম হইতে অনেকখানি পৃথক—তান্ত্রিক বা সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও

---

১. তন্ত্রে গুরুর আসন অতি উচ্চে শুধু নহে, গুরুর বাক্যই তান্ত্রিকদের তত্ত্ব—গুরুই সাক্ষাৎ দেবতা—

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।

মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥—কুলার্ণবতন্ত্র. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃ. ৩৯৫ দ্র,।

সবধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন বেদাশ্রীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষক। সেন রাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ নিধনের অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য বেদাচার রাজধর্ম ছিল বলিয়া অনেকেই এই সময় বাহ্যত ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান স্বীকাব করিযা লইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যত যাহাই হউক এযুগেও বাঙ্গালী ছিল মূলত সহজিযা। এই যুগেই বৌদ্ধ সহজিযার বিবর্তনে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার সূত্রপাত। এবং সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধসহজিয়া হইতে বৈষ্ণব সহজিযায রূপান্তরিত হইল।[১] বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ত্রযোদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে। অনেক বাঙ্গালী এই সময় রাজধর্ম গ্রহণ করিযা মুসলমান হইল। কিন্তু বেশির ভাগই চাপে পড়িযা মুসলমান হইয়াও পূর্বমত সহজিয়া সংস্কার বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাহারাই ফকির হইযা পূর্বের সেই আচার-আচরণকে বজায় রাখিবাব চেষ্টা করিল। ত্রযোদশ শতাব্দীব শেষদিক হইতে বাংলাদেশে সুফীমত-বাদের অনুপ্রবেশেব ফলে বাংলাব সহজিযামনা মুসলমানেবা যেন একটি আশ্রয পাইযা গেল, কারণ সহজিযাদের সহিত সুফী সাধনার বেশ সাদৃশ্য ছিল। চৈতন্য -পরবতী কালে প্রেমধারণার অবতাবণায বৈষ্ণব সহজিযা মতবাদ একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। আরও পরবর্তী কালে এই সহজ সাধনার ধারাই আউল, বাউল, কর্তাভজা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মতবাদেব ভিতর দিযা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিযাছে।[২]

ইতিহাসেব ধারায চর্যার পরবতী যুগের বাংলাদেশের মধ্যযুগীয ধর্মসাধনার বৈষ্ণব সহজিযা, বাউল, নাথপন্থ ইত্যাদি বৌদ্ধ সহজিযা মতের বিবর্তনপ্রসূত। সুতরাং পারিভাষিক শব্দাবলী ব্যবহারে ও পদ্ধতিগত খুঁটিনাটিতে পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাদের যোগসূত্র এবং সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নহে।

৬. দার্শনিক পটভূমি

ভূমিকা : মূল দার্শনিক ভিত্তি

চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর একদিকে যেমন ইহার ভাষার স্বরূপ এবং রচনা কাল লইয়া নানা মতভেদের উদ্ভব হয় অন্যদিকে তেমনি ইহার ধর্মমত এবং দার্শনিক পটভূমিকা সম্পর্কে নানা আলোচনার সূত্রপাত হয। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমেই ইহার বৌদ্ধ স্বরূপটির কথা উল্লেখ করেন এবং

১. বাংলার বাউল ও বাউলগান, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ১২৭

২ দ্র. কর্তাভজাধর্মের ইতিবৃত্ত, দেবেন্দ্রনাথ দে।

প্রথম প্রকাশের সময় হইতেই 'হাজার বছরের পুরাণ বাজালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' এই নাম দিয়া অন্য তিনটি গ্রন্থের সহিত চর্যাগুলিকেও প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে চর্যাগীতি সম্পর্কে যত আলোচনা হইয়াছে তাহাতে ইহার ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট হইয়াছে এবং সকলেই প্রায় ইহার মূল কাঠামোটির বৌদ্ধ-স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। চর্যাপদগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব আছে তাহা অনতিলক্ষ্য হইলেও দুর্লক্ষ্য নহে এবং বিশ্লেষণ করিয়া তাহা আলোচনা করিবার সময় স্মরণ রাখা কর্তব্য তাহার মূল কাঠামোটি বৌদ্ধ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য দার্শনিক মতবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্যই বা কতখানি এবং সে সাদৃশ্যের কারণই বা কি সে আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

ভারতীয় সাধনায় সর্বত্রই ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ জৈন, বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলিতেই মূলগত ঐক্যের ভাবটি সহজেই ধরা পড়ে। ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলিই দার্শনিকতাকে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী আনন্দের উপাদান হিসাবে গ্রহণ না করিয়া জীবনচর্যায় উন্নতির প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই জগৎ দুঃখময় ও অশান্তিজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই দুঃখবাদ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত দার্শনিক মতগুলির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু দুঃখবাদ হইতে উদ্ভূত হইলেও সকলেই পরিণতিতে একটি সনাতন ন্যায়নীতি (Eternal moral order) এবং ধর্মে বিশ্বাসী, তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই চরম সুখের পরিকল্পনাতেই তাহাদের মতের পরিণতি নির্দেশ করিয়াছেন।[১] এই দিক দিয়া ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক মতগুলিই যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালা। বুদ্ধদেবের দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, এই চারটি আর্যসত্য যেন নানা প্রকারে বিভিন্ন দর্শনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত দার্শনিক মতবাদেই আবার ভবদুঃখের কারণ হিসাবে অজ্ঞান (বা অবিদ্যা, বা মায়া) ইত্যাদিকে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই ভবদুঃখের নিবৃত্তির উপায় হিসাবে—জ্ঞান, ধ্যান, সংযম ইত্যাদি পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছে এবং এই উপায়গুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মুক্তির আশাও করা হইয়াছে। শুধু যে দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যেই মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তাহা নহে—বরং বলা চলে দার্শনিক মতবাদগুলির মূলগত ঐক্য থাকিলেও বাহ্যিক পার্থক্য আছে—কিন্তু ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই ঐক্যের মনোভাবটি ভিতরে বাইরে সর্বত্র সুস্পষ্ট। সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যতই মতবিরোধ এবং তর্কযুদ্ধ থাক না কেন, সাধনার ক্ষেত্রে সর্বত্র একটি আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। দেশকালের ব্যবধান বা কোন সম্প্রদায়গত ভেদ এই মৌলিক ঐক্যকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। তাই উপনিষদের সাধনা, গীতার সাধনা, বেদান্তের সাধনা,

১. দ্র. রাধাকৃষ্ণণের 'Indian Philosophy' Vol I, p. 49-50.

বৈষ্ণবের সাধনা, তন্ত্রের সাধনা, সহজিযাদের সাধনা, নাথযোগী, বাউল, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধনা সকলের ভিতর রহিয়াছে একটি গভীর ঐক্য।[১]

ভারতীয় দর্শনের এবং সাধনার এই মূলগত ঐক্য কোন বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মসাধনার পশ্চাতে মূল দার্শনিক ভিত্তি ভূমিটি আবিষ্কারের পথে একটি প্রধান বাধা। বিশেষত এই ধর্মসাধনা যখন সাধারণ লৌকিক ধর্মসাধনা তখন তাহাতে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় আরও স্বাভাবিক। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে যেমন ধর্মসাধনা বিষযে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ইত্যাদির চুলচেরা বিভাগ নাই, দার্শনিক বা তাত্ত্বিক দিকেও তেমনি যুক্তির পার্থক্য থাকিলেও একটি মতবাদ অন্যটিব দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইয়াছে। তাই দেখি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম যত পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তত বেশি করিয়া ইহা হিন্দু মতবাদগুলিব দ্বাবা প্রভাবিত হইতেছিল। অবশ্য এই প্রভাব উভয় পাক্ষিক, হিন্দুবা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন —বৌদ্ধেরাও বিষ্ণুকে বোধিসত্ত্বপদ্মপাণি-অবলোকিতেশ্বর বলিযা উল্লেখ করিযাছেন। এই একাকারের পথে অনেক স্থানেই বুদ্ধমূর্তি শিব, জগন্নাথ ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন।[২] মূল লক্ষ্য এবং উৎপত্তিস্থান যখন সকলেরই প্রায় এক তখন এই পারস্পরিক প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। সত্যোপলব্ধির কেন্দ্র হইতে যখন ইহা সাধনার অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে চলিয়া আসিয়াছে—তখন এই একাকার তো আরও স্বাভাবিক।

এই ঐক্য ও সমন্বয়ের সুরই—চর্যাগীতিগুলির দার্শনিক পটভূমির স্বরূপ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে চর্যাগীতিগুলি আবার গুহ্য-যোগী তান্ত্রিক সাধকদিগের সাধনার ধারা বহন করে। তন্ত্র হিন্দুই হউক আর বৌদ্ধই হউক ইহার বক্তব্য সর্বত্রই এক। সুতরাং এই দিক দিয়াও চর্যার দার্শনিকতার স্বরূপ হিন্দু কি বৌদ্ধ তাহা নির্ণয করা কষ্টকর। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রযোজন যে চর্যা যে-যুগে রচিত হইযাছিল তাহা বাংলা দেশের ধর্মসাধনায সমন্বয়ের যুগ—পালযুগ। আবার অন্যদিকে চর্যাগীতিগুলি যাহাদের জন্য বচিত হইয়াছিল তাহাদের কথা বিচার করিয়াও ইহার মধ্যে তন্ত্রের দিকে সমন্বয় ও সংমিশ্রণের একটি উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[৩] অতি সাধারণ জনসম্প্রদায়ের জন্য রচিত এই চর্যাগীতিগুলিকে জনসাধারণের বোধগম্য ও সহজ, সরল করিবার জন্য চর্যায় কোন বিশিষ্ট মতবাদের কড়াকড়ি না থাকাই স্বাভাবিক। একটি বিশিষ্ট মতবাদের কাঠামোর উপর বিভিন্ন মতবাদের পলেস্তারা চাপাইয়া একটি

১. 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য', ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতের সাধনা'।

২. দ্র. রাধাকৃষ্ণণের 'Indian Philosophy' Vol I p. 607।

৩. দ্র. 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' পৃ. ১৬-১৯, ড. অরবিন্দ পোদ্দার; এবং বাংলা, সাহিত্যের রূপরেখা' ১ম খণ্ড, শ্রীগোপাল হালদার।

সহজবোধ্য সমন্বিত মতবাদ সৃষ্টিও চর্যাকারদের পক্ষে স্বাভাবিক। চর্যার দার্শনিক মতবাদের স্বরূপ সম্পর্কে সুতরাং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে হয় যে বৌদ্ধ দর্শনের কাঠামোর উপরই কাল, পারিপার্শ্বিক, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযোজনে অন্য মতবাদেব কিঞ্চিৎ আবরণ বা সাদৃশ্যের ছাপ লইয়া ইহা গঠিত।

চর্যায বর্ণিত দার্শনিক মতবাদের মূল কাঠামোটি যে বৌদ্ধ দর্শনের তাহার প্রমাণ পাওয়া যায কতকগুলি চর্যায সাধারণ বৌদ্ধ ধ্যানধারণার প্রকাশ হইতে। প্রথম চর্যাতেই কায়াকে তরুবর বলিযা তাহার পাঁচটি শাখার কল্পনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি শাখা বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ [রূপাদয়ঃ পঞ্চ স্কন্ধা—টীকা]। এই অংশটিতে বৌদ্ধদর্শনের নৈরাত্মবাদের আভাস পাওযা যায। বৌদ্ধদর্শনে আত্মা মানা হয না বলিযা তাহাকে নৈরাত্ম দর্শন বলা হয়। যেমন পদ্ম বলিতে দল, ডাঁটা মৃণাল ইত্যাদিব সমাবেশ বোঝায় অন্য কিছুই বোঝায না, তেমনি আত্মা বলিতে কোন স্বতন্ত্র বস্তুকে বোঝায় না। কতকগুলি চিত্তবৃত্তিব একত্র সমাবেশই আত্মা বা আমির ভ্রম জন্মায। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের স্কন্ধবাদের উৎপত্তি। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা,—রূপ [শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রভৃতি একত্রে] বেদনা, [সুখ, দুঃখ, অসুখ-দুঃখ], সংজ্ঞা [জাতিরূপে বুঝিবার প্রণালী], সংস্কার [পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি হইতে জাত মানসিক বৃত্তি] এবং বিজ্ঞান [বোধ],—এই স্কন্ধগুলির সমন্বয়। আবার দেহ এবং তাহা হইতে জাত আমিত্ব বোধও মূলত এই পঞ্চ স্কন্ধের সমবায় ছাড়া অন্য কিছুই নহে। পঞ্চম চর্যাটিতেও বৌদ্ধধর্মের এই সত্যেরই স্পষ্ট আভাস পাওযা যায়—

> ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
> দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥

ইত্যাদি বলিয়া ভবসংসাবকে যে-নদীর সহিত তুলনা করা হইযাছে তাহাতেও বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণভঙ্গবাদেব আভাস পাওযা যায। বৌদ্ধ দর্শন কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সমস্ত কিছুই প্রতি মুহূর্তে প্রতি অংশে পরিবর্তিত হইতেছে। নদীর প্রবাহে প্রতিটি জলকণা প্রত্যেকে একে অন্য হইতে পৃথক—এবং প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল ; তবুও নিযত পরিবর্তনশীল সেই স্বতন্ত্র জলকণা সমূহের প্রবাহে যেমন নদীর ধারণার উৎপত্তি, সেইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাবেই ভবের অস্তিত্ববোধ। দ্বিতীয় পংক্তিতেও বৌদ্ধ দর্শনের 'মধ্যমা প্রতিপদে'র পরিচয় পাওযা যায়। বুদ্ধদেব দুই চরম পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ চরম ভোগ বা পরম কৃচ্ছ্রসাধন কোনটিকে গ্রহণ না করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখানে অবশ্য যে-মধ্যপথের কথা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক অনুরূপ মধ্যপথ নহে, তবে তাহা হইতেই জাত। শূন্যতা ও করুণার মিলিত মধ্যপথ এখানে উদ্দিষ্ট। 'জে জে আইলা তে তে গেলা'—ইত্যাদি পদেও বৌদ্ধ দর্শনের নিয়ত পরিবর্তনবাদের

ইঙ্গিত। ইহা ছাড়াও প্রায় প্রতি পদেই বোধি, সংবোধি, দশবল, তথাগত, শূন্য, করুণা, তথতা, স্কন্ধ, বুদ্ধ, হেরুক ইত্যাদি বৌদ্ধদর্শনের স্বকীয় পারিভাষিক শব্দের এত প্রচুর ও অর্থপূর্ণ ব্যবহার পাওযা যায় যে চর্যাগীতির দার্শনিকতার মূল ভিত্তিটি যে বৌদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

চর্যাগীতির মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি 'মায়াবাদী'

চর্যাগীতিগুলির মূল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটি 'মায়াবাদী'। চর্যাকারদের ধারণায জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা—ইহার কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন বলিয়াই এই জগৎসংসাব সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, মায়ার প্রভাব তিরোহিত হইলে জগৎসংসারের মিথ্যাত্ব সম্পর্কে ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়। জগৎ-সংসারের স্বরূপ সম্পর্কে এই ধারণাই বৌদ্ধদর্শনের মহাযানী সম্প্রদায়ের শূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের মধ্যে দৃষ্ট হয। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যখন বৌদ্ধধর্ম নানা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল তখন বস্তুর স্বরূপ ও তাহা জানিবার উপায় এই দুই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া মূলত চারটি সম্প্রদাযের উদ্ভব হয়। ইহার মধ্যে নাগার্জুন[১] প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী এবং মৈত্রেয়-অসঙ্গ-বসুবন্ধু[২] প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচারবাদীরাই মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। হীনযানী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকেরা ঠিক মায়াবাদী নহেন ববং বলা চলে (যদিও পূরাপূরি আধুনিক অর্থে নহে) বাস্তববাদী। মহাযানীদের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মত দুইটিতে অনেক পার্থক্য থাকিলেও মূলে তাঁহারা উভয়েই মাযাবাদী।

শূন্যবাদীরা জাগতিক সত্তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। বুদ্ধদেবের 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' (Theory of Dependent Causation) মতবাদকে গ্রহণ করিয়া ইঁহারা বস্তুব সত্তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাহাকে ধর্মনৈরাত্ম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বস্তুর কোন নিজস্ব স্বরূপ বা ধর্ম নাই। সকলেই অন্য কোন কিছুর উপর তাহার বর্তমান বাহ্যিক স্বরূপের

১. নাগার্জুন—খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন বলিয়া প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য ই'হাকে প্রথম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। দ্র. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা. পৃ. ১৩০। ড. রাধাকৃষ্ণণও ই'হাকে দ্বিতীয় শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের জন্য ড. রাধাকৃষ্ণণের Indian Philoshophy, Vol 1 pp 643-644 পাদটীকা দ্র.।

২. মৈত্রেয়. অসঙ্গ, বসুবন্ধু—বিজ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্গাতা হিসাবে এই তিনটি নাম একত্রে উক্তহইলেও মৈত্রেয় সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। "মৈত্রেয় নামের ঐতিহাসিকতা, এখনও নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় নি।" 'বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য', ড. বাগচি পৃ. ৭৭। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু দুই ভ্রাতা ছিলেন। ই'হারা চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লোক।

জন্য নির্ভরশীল। এই দ্বিতীয় কোন বস্তুটি আবার অপর আর কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। যাহার নিজস্ব স্বরূপই অন্যের উপর নির্ভরশীল তাহাকে আর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে আবার অসত্যও বলা যায় না, কারণ যাহা অসত্য তাহার কোন বাহ্যিক পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। আবার ইহাকে সত্য ও অসত্য উভয় কিম্বা সত্যও নহে অসত্যও নহে এই অনুভয়ও বলা চলে না —ইহাতে শুধু বাগ্‌জালই বিস্তৃত হয়। এইভাবে নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়া, চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত করিয়া নাগার্জুন সত্তার শূন্যতা প্রমাণ করিলেন। বস্তুর অসারত্ব অর্থাৎ ধর্ম-নৈরাত্ম্য এবং আত্মার অসারত্ব অর্থাৎ পুদ্গল নৈরাত্ম্য— এই উভয়বিধ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকাই শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা। সত্তার এই নৈরাত্ম্য সত্ত্বেও বহির্বস্তুর যে উপলব্ধি হয় তাহার কারণ তাহা অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্ত চৈতসিকের সৃষ্টি (অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি)। তাহা কোন পরমার্থ সত্য নহে, তাহা সংবৃতি সত্য মাত্র। বিভিন্ন উপায়ের মধ্য দিয়া নির্বাণ লাভ করিতে পারিলে পরমার্থ সত্য লাভ হয়। অবশ্য এই লোকোত্তর ইন্দ্রিয়াতীত পরমার্থ সত্য অবর্ণনীয়ও বটে।

বিজ্ঞানবাদীরা চিত্তকে অসৎ না বলিলেও বস্তুসত্তার অসারত্ব প্রসঙ্গে শূন্যবাদীদের সহিত একমত। তাঁহাদের মতেও বাহ্যিক বস্তুজগতের কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব। যেমন স্বপ্নে অথবা মোহে মানুষ অস্তিত্বহীন বস্তুনিচয়ের কল্পনা করে, ইহাও সেইরূপ। শূন্যতত্ত্বকে বিজ্ঞানবাদীরা কোন নেতিবাচক যুক্তির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই তাঁহারা শূন্যতত্ত্ব বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্যক্তির নিকট বস্তুবিশ্বের ধ্যানধারণা তাহার ব্যক্তি বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়। এই ব্যক্তি-বিজ্ঞান আবার বিধৃত আছে একটি সমষ্টি-বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে তাহার নাম 'আলয়বিজ্ঞান'। এই আলয়বিজ্ঞানের মধ্যেই সমস্ত বস্তুজ্ঞান নিহিত আছে। মূলত বস্তুজগৎ অসার কিন্তু ব্যক্তি-বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত আলয়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির ধারার সন্ততি বোধজাত কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান হইতেই বস্তুজ্ঞানের উদ্ভব। বিজ্ঞান অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ হইলেই চিত্ত-চৈতসিকরূপে নিজেকে ছড়াইয়া দেয় এবং সেই চঞ্চল চিত্তবৃত্তিই বস্তুজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে। "অবিদ্যাজনিত বাসনা-বিক্ষোভ নিরুদ্ধ হইলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। কাল নিরুদ্ধ হইলে বস্তুজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় এবং ধর্ম নৈরাত্ম্যে ও পুদ্গল নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয়।"[১] অর্থাৎ অনুশীলন ও সংযমের মধ্য দিয়া বাহ্য জগতের মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের মোহ এবং ইহার প্রতি আসক্তি নষ্ট হয়।

শঙ্কর যদিও বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদ-(Subjective Idealism)-এর

১. 'চর্যাপদে বর্ণিত দার্শনিকতত্ত্ব', ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত; জগজ্জ্যোতিঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ; ১ম সংখ্যা।

প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তবুও জগৎ সম্পর্কে শঙ্করের মতবাদ ও বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়েই জাগতিক সমস্ত সত্তাকে অসার প্রতিপন্ন করিযাছেন। বিজ্ঞানবাদীরা সমস্ত সত্তাকে স্বপ্ন বা মোহের মত মিথ্যা বলিযা প্রতিপন্ন করিযাছেন। শঙ্কর সত্তাকে প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই ত্রিবিধ ভাগে (সত্তা ত্রৈবিধ্য) বিভক্ত করিযাছেন এবং সত্তার অস্তিত্ব-জ্ঞান রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত সর্বদা অলীক বা তুচ্ছ বলিযা উড়াইযা না দিলেও প্রকৃত সত্য বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহাবিক সত্তা যে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার কারণ তাহারা প্রকৃত সত্য বলিয়া নহে,—তাহার কারণ অবিদ্যাই 'অধিষ্ঠান' (অর্থাৎ মূলস্বরূপ) সম্পর্কে অজ্ঞানতার ফলে 'আবরণ' ও 'বিক্ষেপের' দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায তাহাদিগকে প্রতিভাত করায়। অর্থাৎ মায়ার প্রভাবেই বস্তুত অসার সত্তাও সার বা সত্য বলিযা প্রতিভাত হয। এইখানেই স্পষ্টত শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য। সকলেই জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব মাযা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের সহিত বেদান্তের অন্য মিলের কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে। শূন্যবাদ জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব অর্থাৎ সংবৃতি সত্যের অসারত্ব এবং পরমার্থ সত্যের অনির্বচনীযত্ব প্রতিষ্ঠা করিযাছে। বেদান্তেও অনুরূপভাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্যের অলীকত্ব, তুচ্ছত্ব এবং পরমার্থ সত্যের অনির্বচনীযত্ব প্রমাণ করা হইযাছে। শূন্যবাদীদের নির্বাণ পরিকল্পনাও বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত তুলনীয। বিজ্ঞানবাদীদের সহিতও বেদান্তের বস্তুর অসারত্ব বিষযক মত ছাড়াও অন্য দিকে সূক্ষ্ম মিল রহিযাছে। বিজ্ঞানবাদীদের 'আলয়বিজ্ঞান'—সমস্ত বস্তুজ্ঞানের মূল। আবার অনির্বচনীয় স্বরূপে আলযবিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ। পরমার্থ সত্যই যেমন এক হিসাবে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্যের আশ্রয—আলয়বিজ্ঞানও সেইরূপ। শুধু তাহাই নহে, "অনেকে সেই স্থায়ী আলযবিজ্ঞানকে চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপও বলিয়াছেন। বসুবন্ধুর বিংশিকা ও ত্রিংশিকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল"।[১] "এইরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুগুলিকে যদি মানিতে হয় তবে অদ্বৈত বেদান্তের সহিত ইহার পার্থক্য অতি অল্পই ঘটে। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য যে অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন মূলত তাহা বসুবন্ধুর মতেরই একটা নূতন সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।"[২]

---

১. দ্র. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ. ১৩৫।

২. দ্র. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ১৪৭

বিজ্ঞানবাদী, শূন্যবাদী ও বেদান্ত মতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের Introduction to Tantric Buddhism পৃ. ২৯-৩৩ এবং ড. রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy Vol I পৃ. ৬০৭, ৬৪১ এবং ৭০২ দ্রষ্টব্য।

চর্যাগীতির দার্শনিক তত্ত্বের মায়াবাদী স্বরূপটি বিভিন্ন উদ্ধৃতি সহযোগে উদাহৃত করিবার পূর্বে একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মায়াবাদ বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় দর্শনেই বিদ্যমান। সুতরাং পুনরায় প্রশ্ন ওঠে—চর্যার দার্শনিক স্বরূপ, বিশেষ করিয়া ইহার মায়াবাদ—হিন্দু না বৌদ্ধমূল ? এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বাধাগুলি ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। সেগুলিকে স্মরণ রাখিয়াও পূর্বের যুক্তি অনুসরণ করিয়া বলা চলে এই মায়াবাদকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পদকর্তারা যেসকল পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা এবং যে উপমা রূপকল্পাদির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রায়শ বৌদ্ধদর্শনের। সুতরাং সেই দিক দিয়া বলিতে হয় চর্যার মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শনের কাঠামোর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম চর্যাটি হইতেই আমরা চর্যা-দর্শনের মায়াবাদী স্বরূপটির পরিচয় পাই। 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল' বলিয়া চর্যাকারেরা জাগতিক সত্তার উৎপত্তির জন্য আমাদের চিত্তকেই দায়ী করিয়াছেন। অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্তই কালজ্ঞান সৃষ্টি করে—এবং কালজ্ঞানই বস্তুজ্ঞান সম্ভব করিয়া তোলে। অর্থাই জগৎ-সংসার মূলত মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ চিত্তে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। সপ্তম চর্যাতেও অনুরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্নু ভব পরিচ্ছিন্না ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণা গবণে কাহ্নু বিমল ভইলা ॥

তিন বা বহুরূপে যাহা পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে তাহারা বস্তুত পৃথক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নহে। একটি মিথ্যা অস্তিত্ব বোধের দ্বারা আমরা সকল কিছুকে পৃথক বা পরিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছি। এই ভবসংসারের অস্তিত্ব সংবৃতি সত্য মাত্র, কোন কিছুই এখানে স্থায়ী নহে, যাহারা আসে তাহারাই যায়। সকলই ক্ষণপরিবর্তনশীল। মূলত কিছুই সত্য নহে, আসাটাও নহে যাওয়াটাও নহে। অষ্টম চর্যাতেও আমরা মায়াবাদের আভাস পাই—

সোণে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহি কে ঠাবী ॥

(শূন্যতা স্বরূপ) সোনা দ্বারা করুণা-রূপ (চিত্ত-) নৌকাকে ভরিয়া লইয়াছে তাই (রূপজগতের অস্তিত্ব বোধের) রূপা রাখিবার ঠাঁই নাই। এখানেও পরোক্ষভাবে রূপজগতের অস্তিত্ববোধের ধারণার অসারত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। দশম চর্যাতেও সংসারকে নটপেটিকা (নড়পেড়া) অর্থাৎ মিথ্যা নাটকাভিনয়ের সাজসজ্জার আধার অর্থাৎ মূলত অসার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী আর একটি চর্যাতেও উক্ত হইয়াছে—

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা ॥ (১২)

মতিদ্বারা ঠাকুরকে পরিনিবৃত্ত করিয়া, অচঞ্চল করিয়া, ভবের শক্তিকে জয় করা গেল। অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা ভবের অস্তিত্ব-বোধরূপ মিথ্যা ধারণাকে জয় করা হইল। এই জগৎসংসার যে অনাদি অবিদ্যা-জনিত মায়ার স্বপ্ন, নিদ্রাহীন (জাগ্রৎ) স্বপ্নের মত,—এই তত্ত্বটির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আছে ত্রয়োদশ সংখ্যক চর্যাতে—"নিংদ বিহণে সুইণা জইসো।" ২১ সংখ্যক চর্যাতে চঞ্চল চিত্তপবনকে মূষিকের সহিত এবং রাত্রির অন্ধকারকে অজ্ঞানতার সহিত তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই মূষিকই ভবের অস্তিত্ব-বোধ জাগায়, এই মূষিকই কালস্বরূপ (কালমুসা); এই মুষিককে হত্যা করিতে পারিলে ভব বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব। "জবে মুসাএর আচার তুটঅ। ভুসুকু ভণএ তবে বান্ধন ফিটঅ" ॥ (২১)

ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা যে মানুষ নিজেই করিয়া লয়, ইহাদের সত্যকার স্বরূপ যে মিথ্যা, তাহার অতি চমৎকার উল্লেখ আছে ২২ সংখ্যক চর্যাতে—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥
অম্ভেন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
জইসা জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥

ভব এবং নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা নিজেই সৃষ্টি করিয়া মিথ্যাই লোকে নিজেকে ভবসংসারে বদ্ধ করে। আমরা অচিন্ত্য যোগীরা জানি না (জানিতে চাহি না) জন্ম-মরণ কিরূপে হয়। জন্মও যেমন মরণও সেইরূপ, জীবন্তে ও মৃতে কোন ইতরবিশেষ নাই। এই পদটির সহিত অনুরূপ আর একটি পদও লক্ষণীয়—

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই;
লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠানা।
জাহের বান চিহ্ন রূব ণ জাণী ॥
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ (২৯)

তত্ত্বের দিক দিয়া পদটি পূর্ববর্তী পদটির অনুরূপ হইলেও ইহাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিজ্ঞানবাদীদের স্পষ্ট প্রভাব। ভাব এবং অভাব, অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব ইহার কিছুই সত্যও নহে অসত্যও নহে। সত্য একমাত্র এক দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান। এখানে জগৎ-সংসারের প্রাতিভাসিক রূপের পশ্চাতে দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান সত্যকে স্বীকার করা হইয়াছে। সাধারণভাবে বিভিন্ন পদের মধ্যে মায়াবাদ প্রকাশিত

হইলেও পূর্বোক্ত পদটির মধ্যে বিজ্ঞানবাদী দর্শনের প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট তেমনি আবার এরূপ পদও আছে যাহার মধ্যে শূন্যবাদীদের মতের প্রভাব বেশি করিয়া প্রকট—

আইএ অণুঅণা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যাচে কিং তং বোড়ো খাই॥
অকট জোইআ রে মা কর হথা লোহা।
আইস সহাবেঁ জই জগ বুঝষি তুট বাষনা তোরা॥
মরুমরীচি গন্ধব নইরী দাপতিবিম্বুজইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জই॥
বাংঝিসুআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশ ফুলিলা॥ (৪১)

'আদিতেই অনুৎপন্ন এই জগৎ কেবল ভ্রান্তিবশতই প্রতিভাত হইতেছে। যে রজ্জুসর্প দেখিয়া চমকিত হয় তাহাকে কি সত্যই বোড়া সাপে খায়? অকাট (মূর্খ) যোগী হস্ত লোণা করিও না (সংসারে জড়াইয়া পড়িও না)। জগৎকে যদি এই (নিম্নবর্ণিত) স্বভাবে জানিতে পার তবেই তোমার সকল বাসনা টুটিবে। মরু-মরীচিকা, গন্ধর্ব-নগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন ভ্রান্তিবশত মনে প্রতিভাত হয়, বাতাবর্তে দৃঢ় হইয়া জলে যেমন প্রস্তর প্রতিভাত হয় (জলস্তম্ভাদি), বন্ধ্যাসুতের ক্রীড়া যেমন, বালু-তৈল, শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম—সকলই যেমন অস্তিত্বহীন অলীক মাত্র, এই ভব-সংসারও সেইরূপ অলীক।' জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে এই পদটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই শূন্যবাদীদের প্রভাব-পুষ্ট। জগৎ-সংসারের অস্তিত্বের পশ্চাতে কোনরূপ কোন প্রকৃত সত্যের অস্তিত্বের কথা আভাসে ইঙ্গিতেও এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা শূন্যবাদীদিগের বৈশিষ্ট্য।

এই পদটির পাশাপাশি আবার উল্লেখ করা যায় বেদান্তের অখণ্ড আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন শাশ্বত-বিজ্ঞানের কথা যেখানে উক্ত হইয়াছে—

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ মা হোহি বিসন্না॥
ভণ কইসে কাহ্ন নাহি।
ফরই অনুদিনং তৈলোএ পমাই॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগতরঙ্গ কি সোষই সাঅর॥
মূঢ়া অচ্ছন্তে লোঅ ণ পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড় ণ চ্ছংন্তে দেখই॥ (৪২)

'চিত্ত শূন্য সম্পূর্ণ (শূন্য হইয়া সম্পূর্ণ)। স্কন্ধ বিয়োগে বিষন্ন হইও না। বল কি করিয়া কাহ্ন নাই? অনুদিন সে ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে।

মূঢ়গণই দষ্টকে নষ্ট দেখিয়া কাতর, তরঙ্গভঙ্গে কি সাগর শোষণ করে? যে লোক আছে মূঢেরা তাহাকে দেখিতে পায় না, যেমন দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থ দেখা যায় না।' অর্থাৎ শূন্যতা যেন পূর্ণতারই নামান্তর। মৃত্যুতেও জীবনের শেষ নহে। মৃত্যুর পরেও আনন্দময় সহজ স্বরূপের অস্তিত্ব থাকে। সর্বব্যাপী আনন্দময় শাশ্বত অস্তিত্বশীল সেই সহজ-স্বরূপ যেন একটি সাগরের মত তাহাতে অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিজীবনের জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গে কোন পরিবর্তনই সূচিত হয় না। স্থূল দৃষ্টিতে সেই আনন্দস্বরূপকে দেখা যায় না—প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সেই আনন্দ-স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পরমার্থ সত্য এখানে চিন্ময়, আনন্দরূপ, ব্রহ্মসদৃশ হইয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অবশ্য বেদান্তের প্রভাবকে স্বীকার করিলেও ইহার বৌদ্ধ আবরণটিও স্পষ্ট—শূন্য, স্কন্ধ-বিয়োগ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলি ইহার নিশ্চিত প্রমাণ।

চর্যাগীতির দার্শনিকতা ভাববাদী

এই মায়াবাদের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই চর্যাগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় ইহার দার্শনিকতার ভাববাদী Idealistic স্বরূপ বা চিত্তপ্রাধান্যবাদ। চর্যাগীতিগুলিতে মায়াবাদী দর্শনে যে তিনটি সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে তাহারা সকলেই ভাববাদী। শূন্যবাদী, বিজ্ঞানবাদী এবং অন্যদিকে সৌত্রান্তিক, বৈভাষিকদের মধ্যে পার্থক্যের একটি মূল কারণই এখানে। চর্যাগীতিগুলির মধ্যেও আমরা তাই লক্ষ্য করি, নানা রূপকের মধ্য দিয়া বিশ্বসংসারকে চিত্তের খেলা বলিয়া এবং মুক্তির উপায় হিসাবে চিত্ত নিরোধের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে চিত্তের দুটি রূপ,—একটি অবিদ্যাগ্রস্ত অপবিশুদ্ধ রূপ—সংবৃতি বোধিচিত্ত, অপরটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান রূপ, প্রজ্ঞালোকদীপ্ত, প্রকৃতি-প্রভাস্বর রূপ। এই সংবৃতি বোধিচিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া প্রকৃতি-প্রভাস্বর প্রজ্ঞালোকদীপ্ত চিত্তকে লাভ করাই চর্যার কবিসাধকদিগের যথার্থ লক্ষ্য।

পূর্ব অনুচ্ছেদে মায়াবাদী দর্শনের নিদর্শন হিসাবে যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই লক্ষ্য করা যায় বিশ্বসংসারের অস্তিত্বকে সর্বত্রই চিত্তের খেলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অবিদ্যা-বিক্ষুব্ধ চিত্তকে জয় করিবার উপায়ও নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম চর্যাটিতেই আমরা লক্ষ্য করি অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্তে কালজ্ঞান উৎপত্তির ফলস্বরূপ দুঃখ-বিপর্যয়ের ইঙ্গিত এবং তাহা হইতে মুক্তির স্পষ্ট নির্দেশ হিসাবে "গুরু পুচ্ছিঅ জাণ" "সুণু পাখ ভিতি লাহুরে পাস"—ইত্যাদির উল্লেখ। দ্বাদশ চর্যাতেও অবিশুদ্ধ চিত্তকে শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা পরিনিবৃত্ত করিয়া মিথ্যা ভবের শক্তিকে পরাজিত করিবার ইঙ্গিত

আছে। কতকগুলি চর্যাতে চঞ্চল চিত্তকে হরিণ, মূষিক ইত্যাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ চর্যাতে—

কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চোদীস॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খণহ ণ ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণ পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ন জাণী॥

এখানে চঞ্চল চিত্তকে হরিণ এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তকে হরিণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চঞ্চল হরিণ সর্বদা শিকারী-পরিবেষ্টিত। নিজের মাংসেই হরিণ নিজের বৈরী; অর্থাৎ চিত্ত সর্বদা অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া নানা দুঃখ-বিপর্যয়ের দ্বারা বেষ্টিত এবং সে অবিদ্যার জন্য চিত্ত নিজেই দায়ী। এই বিপদের সময়েই প্রকৃতি-প্রভাস্বর শূন্যস্বরূপ চিত্ত-হরিণীর বাণী শোনা যায় এবং চঞ্চল চিত্ত-হরিণও মুক্তির পথ পায়। অন্য আর একটি চর্যাতেও—

নিশিঅ অন্ধারী মুসার চারা।
অমিঅভখঅ মুসা করঅ আহারা॥
মার রে জোইআ মুসা পবণা।
জেণ তুটঅ অবণা গবণা॥ (২১)

মূষিক এখানে অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্ত-রাত্রির অন্ধকার, অবিদ্যার অন্ধকার। চিত্ত-মূষিককে হত্যা করিলেই ভব-সংসারে গতাগতি বন্ধ হয়। এই মূষিকই কাল। সদ্‌গুরুউপদেশের পূর্ব পর্যন্ত ইহা চঞ্চল থাকে—কিন্তু ইহাই আবারগুরুর উপদেশে শূন্যতা অভিমুখে ঊর্ধ্বে উঠিয়া চিদমৃত পান করিয়া প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তে পরিণত হয়।

আর একটি চর্যাতে (৪৫) আমরা দেখি চিত্তকে উপমিত করা হইয়াছে বৃক্ষের সঙ্গে। মন-তরু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা; বহুল আশাই পত্র ফল বাহক। জল সিঞ্চনে বৃক্ষের যেমন বৃদ্ধি, শুভাশুভের কল্পনা দ্বারা সেইরূপ মন-তরুর বৃদ্ধি। গুরুবচনরূপ প্রজ্ঞা-কুঠারে সেই মন-তরুকে মূলডাল-সমেত ছেদন করিতে হয়। বাসনা-বিক্ষুব্ধ অবিদ্যাতরুকে ছেদন করিলে প্রকৃতি-প্রভাস্বর মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

অবিদ্যাচ্ছন্ন এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর ভেদে চিত্তের দুইটি অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় অন্য একটি চর্যাতেও—

পেখু সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা॥
মোহ বিমুক্কা জই মণা।
তবেঁ টুটই অবণা গমণা॥

নৌ দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজ্জই।
পেথ মোঅ মোহে বলিবলি বাঝই ॥
ছাঅ মাআ কাঅ সমানা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণাণা ॥
চিঅ তথতা সহাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ফুড়অণ ন হোই ॥ (৪৬)

দেখ স্বপ্নে এবং আদর্শে যেরূপ, অন্তরালে মোহও সেইরূপ। মন মোহবিমুক্ত হইলে সংসারে গমনাগমন বন্ধ হয়। (মোহশূন্য) মন দগ্ধ হয় না, ভেজে না, ছিন্ন হয় না, তবু দেখ লোকে মোহে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান, দুই পক্ষেই সেই বিজ্ঞান। চিত্ত তথতা স্বভাবে শুদ্ধ হয়। জয়নন্দী বলেন, তখন সবই স্ফুট, অন্য কিছুই নাই। অর্থাৎ মনের অন্তরালবর্তী মোহের কাজই হইতেছে, যাহা বস্তুত নাই তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করান; যেমন হয় স্বপ্নে কিম্বা দর্পণ-প্রতিবিম্বে। এই মোহগ্রস্ত মনই পরিশুদ্ধ হইলে ভবসংসারে গমনাগমন বন্ধ হয়। মোহহীন সেই মনের অবস্থা—অদাহ্য, অক্লেদ্য, অচ্ছেদ্য। এই মন যখন অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে অর্থাৎ ইহাতে গ্রাহ্য-গ্রাহক, জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব ভাব বিদ্যমান থাকে তখন ইহা হইতে ছায়া মায়া কায়ার উৎপত্তি। এই মনই যখন আবার প্রকৃতি-প্রভাস্বর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ অর্থাৎ বাসনা-বিক্ষোভ-হীন অবিদ্যামুক্ত হয়, তখন জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব. গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব না থাকায় অদ্বয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথতা-স্বভাবে শোভা পায়।

চিত্তকে অবিদ্যামুক্ত করিয়া প্রকৃতি-প্রভাস্বরতায় উন্নীত করিবার উপায়ের কথাও (যৌগিক পন্থাও) চর্যাকারেরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। চর্যার চিত্তপ্রাধান্যবাদের ইহাও আর একটি দিক। এক হিসাবে চর্যার মধ্যে এই আলোচনাই বেশি, কারণ চর্যা সাধন-সঙ্গীত, তত্ত্ববিদ্যা নহে। তবুও চর্যার ভাববাদ ও চিত্তপ্রাধান্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ধ্যান-ধারণা ও যোগসাধনার সাহায্যেই সাধকগণ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তকে বিনাশ করিয়া শূন্যতাজ্ঞান লাভ করিতেন। প্রথম চর্যাটিতেই উল্লিখিত আছে—লুইপাদ বলিতেছেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ধ্যানের মধ্য দিয়া, 'ভণই লুই আম্হে সাণে [ঝাণে] দিঠা"। চিত্তকে অবিদ্যামুক্ত করিবার উপায় হিসাবে আর একটি গীতেও বলা হইয়াছে—চিত্ত হইল তুলার মত, তাহাকে ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করিয়া নিরবয়ব কর। এইরূপ করিলেই অর্থাৎ ধ্যান-ধারণা বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইলেই বোঝা যায় চিত্তের স্বরূপ কি। এইভাবে চিত্ত নিরবয়ব অর্থাৎ অবিদ্যা-বিমুক্ত হইলে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। চর্যাকারের ভাষায়—

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু ॥
তউ যে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই ॥
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ।
পুন লইআঁ অপণা চটারিউ ॥ (২৬)

চিত্তের অবিদ্যা-বিমুক্তি সম্পর্কে অন্ত আর একটি চর্যাতেও পাওয়া যায়—

এতকাল হাউ অচ্ছিলেসু মোহে।
এবেঁ মই বুঝিল সদগুরু বোহেঁ ॥
এবে চিঅরাঅ মকু ণঠা।
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা ॥ (৩৫)

এতকাল আমি মোহে ছিলাম, এবার আমি সদ্গুরুর বোধে বুঝিলাম। এখন আমার (অবিশুদ্ধ) চিত্তরাজ নষ্ট হইল (নিঃস্বভাবীকৃত হইল) এবং গগন সমুদ্রে (শূন্যতাজ্ঞানে) প্রবিষ্ট হইল।

অনুরূপ অনেক পদেই চর্যাব চিত্ত-প্রাধান্য ও ভাববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যার সাধক-কবিরা ছিলেন তান্ত্রিক এবং তন্ত্র এক হিসাবে সাধনার কার্যকরী পন্থা (Practical methods) মাত্র। তবুও কিন্তু ইঁহারা যে তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অনির্বচনীয়, হৃদয়বেদ্য, অনুভূতিগম্য (Subjective) চর্যাকারদের মতে সহজতত্ত্ব—স্ব-সম্বেদ্য, স্বরূপ বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ জানা যায় না—"সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআবে অলকখলকখণ ণ জাই (১৫)। এই দিক দিযাও ইহার দার্শনিকস্বরূপ ভাববাদী (Idealistic)। এখানে অবশ্য বিজ্ঞান-বাদীদের প্রভাবই বেশি। শূন্যবাদী ও বেদান্তবাদীরাও ভাববাদী, কিন্তু বিজ্ঞান-বাদীরাই বেশি করিয়া চিত্তপ্রাধান্যকে স্বীকার করিয়াছেন। চর্যাপদগুলির মধ্যে শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ একাকার হইয়া গেলেও মূল চিত্তের অস্তিত্ব স্বীকার প্রসঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। চিত্তের অবিশুদ্ধ স্বরূপে গ্রাহ্য-গ্রাহক, জ্ঞাতা-জ্ঞাতৃত্ব দ্বৈতভাব থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপে তাহা দ্বৈত-বিমুক্ত, অদ্বযভাবে প্রতিষ্ঠিত—এই সব তত্ত্ব বিজ্ঞানবাদীদের Subjective Idealism-এর প্রত্যক্ষ ফল। এই অদ্বয়-জ্ঞানের কথা বহু চর্যাতেই উক্ত হইয়াছে—'আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ' (৫), 'ভাদে ভণই অভাগে লইআ' (৩৫), 'অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ' (৪৯) কিম্বা 'বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা। আণ চাহন্তে আণ বিণধা' (৪৪) অথবা 'ণাদ ণ বিন্দু রবি ণ শশি মণ্ডল। চিঅরাঅ সহাবে মুকল।' (৩৩)

শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব

চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রে আলোচিত চিত্তের চারিটি স্তরেব আলোচনাও এখানে আসিয়া পড়ে। নাগার্জুনপাদের নামে প্রচলিত পঞ্চক্রম নামক গ্রন্থে চিত্তকে স্তরভেদে শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য[১] এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম 'স্তর' শূন্যে চিত্ত প্রজ্ঞা বা আলোক-মুখী। কিন্তু এই স্তরে চিত্তের সহিত শোক, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, ইত্যাদি তেত্রিশ প্রকার চিত্ত-অবিশুদ্ধিকর প্রকৃতি-দোষ জড়িত আছে। এই স্তরকে পরতন্ত্র, বাম ও সর্বমায়ার প্রধান স্ত্রীমাযা বলিয়া অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয স্তরের 'অতিশূন্য' প্রথম স্তরের 'আলোকাভাস' হইতে উদ্ভূত 'আলোকজ্ঞান'। ইহাকে দক্ষিণ, সূর্যমণ্ডল ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এই স্তরের সহিতও কাম, সন্তোষ, সুখ, বিস্ময়, ধৈর্য, গর্ব ইত্যাদি চল্লিশ প্রকার প্রকৃতি-দোষ জড়িত আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মিলিতাবস্থা হইতে তৃতীয় স্তর—'মহাশূন্যের' উদ্ভব। এই স্তর আলোকোপলব্ধি—এবং পরিনিষ্পন্ন (absolute) বলিয়া খ্যাত, (অর্থাৎ ইহা প্রথম স্তরের মত 'পরতন্ত্র' ও দ্বিতীয স্তরের মত 'পরিকল্পিত' নহে।) কিন্তু এই তৃতীয় স্তরও অবিদ্যা এবং ইহাতে সাতটি প্রকৃতিদোষ জড়িত আছে যথা—বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, আলস্য ইত্যাদি। এই মোট আশীটি প্রকৃতি-দোষ আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত এবং দিবারাত্র ভেদে দ্বিগুণ হইযা একশত ষাটটিতে পরিণত হয়। প্রাণবায়ু এই প্রকৃতি-দোষগুলির বাহন এবং যেখানেই এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া সেইখানেই এই প্রকৃতি-দোষগুলির অস্তিত্ব বিদ্যমান। চিত্তের চতুর্থ স্তর 'সর্বশূন্য' সর্বপ্রকার প্রকৃতি-দোষ-বিমুক্ত, প্রকৃতি-প্রভাস্বর—ইহাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, পরম সত্য, চরম জ্ঞান, ইহা অস্তি নাস্তি আদি মধ্য অন্ত ইত্যাদি সকলের ঊর্ধ্বে।

এই চারি শূন্যের তত্ত্ব চর্যাগীতিগুলির মধ্যে সুস্পষ্টভাবেই গৃহীত হইয়াছে। 'টালত মোর নাহি পড়বেষী' (৩৩) ইত্যাদি বিখ্যাত পদটিতে এই চারি শূন্যের উল্লেখ আছে। 'টিলার উপর আমার ঘর, প্রতিবেশী নাই, হাঁড়িতে ভাত নাই… বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা পিঠ দোহা হয় ইত্যাদি।' হাঁড়ির ভাত এখানে পূর্বোক্ত প্রকৃতি-দোষসমূহ (ষষ্ট্যুত্তরশত প্রকৃতিদোষং—টীকা)। এই প্রকৃতি-দোষসমূহ যেখানে নাই—উষ্ণীষ-কমলের সেই মহাসুখচক্রে আমার ঘর। টীকায় প্রতিবেশীকে বলা হইয়াছে—পার্শ্বস্থ চন্দ্রস্থর্যৌ…তত্রৈবাস্তলীনৌ—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য বা গ্রাহ্য-গ্রাহক-ভাব এখানে নাই। আভাসত্রয়যুক্ত মন, যাহা

---

১ শূন্যঞ্চাতিশূন্যঞ্চ মহাশূন্যং তৃতীয়কম্।
চতুর্থং সর্বশূন্যঞ্চ ফলহেতু প্রভেদতঃ ॥—পঞ্চক্রম পুথি
[Obscure Religious Cults-এ উদ্ধৃত, পৃ. ৫১]

ভবের অস্তিত্ব বোধের জন্য দায়ী, তাহাকে বলদ বলা হইয়াছে। বলদ প্রসব করিল—অর্থাৎ মনরূপ বলদ ভবের অস্তিত্বের ধারণার উৎপত্তির জন্য দায়ী। যোগীরা ত্রিসন্ধ্যা পিঠ (আভাস দোষগুলিকে) দোহন (নিঃস্বভাবীকরণ) করেন। অন্য একটি পদেও দারিকপাদ যখন বলেন, 'বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলেঁ' তখন গগনের অপর কূল বলিতে তিনশূন্যের পরপারবর্তী চতুর্থ-শূন্যস্তরকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। শূন্য অর্থাৎ প্রথম তিন শূন্য হইল মোহ-ভাণ্ডার এবং চতুর্থস্তর সর্বশূন্য হইল 'তথতা'। এই তথতা বা চতুর্থ শূন্য দ্বারা আঘাত করিতে পারিলে প্রথম শূন্যত্রয়কে হত্যা করা যায় এবং তাহা হইলেই সকল প্রকার প্রকৃতি-দোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কাহ্নুপাদের ভাষায়—

সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী॥ (৩৬)

অন্য আর একটি পদে দাবা খেলার রূপকের মধ্য দিয়া এই শূন্য ও প্রকৃতি দোষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 'প্রথমে দুটিকে (প্রথম দুই শূন্যকে) হত্যা করিতে পারিলে—ঠাকুর (তৃতীয় শূন্য)-ও মৃত হয়। প্রথমে তোড়িয়া বোড়িয়া (দাবার বড়ে—টীকার মতে ষষ্ট্যুত্তর শত প্রকৃতি-দোষ)-কে মারিলাম, পরে গজবর (প্রকৃতি-দোষমুক্ত সর্বশূন্য তথতা) দ্বারা পঞ্চস্কন্ধকে হত্যা করিলাম—

ফীটউ দুআ মাদেসি রে ঠাকুর।
উআরি উএসেঁ কাহ্নু ণিঅড় জিনউর॥
পহিলেঁ তোড়িআ বোড়িআ মরাড়িউ।
গঅবর তোলিআ পাঞ্চজণা ঘালিউ॥ (১২)

মহাযানী বৌদ্ধদের মতে বোধিসত্ত্বাবস্থা লাভই পরম লক্ষ্য। বোধিচিত্ত লাভই বোধিসত্ত্বাবস্থায় উপনীত হইবার উপায়। বোধিচিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভাস্বর মুক্তচিত্ত আবার শূন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থা (শূন্যতাকরুণাভিন্নং বোধিচিত্ত-মিতিস্মৃতম্)। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম মহাযানী মত হইতে উদ্ভূত; চর্যাতেও তাই শূন্যতা ধারণার সঙ্গে সঙ্গে করুণার উল্লেখ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান।[১] পূর্বেই আমরা একটি চর্যাতে লক্ষ্য করিয়াছি—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নহি কে ঠাবী॥ (৮)

করুণা নৌকা সোনায় পরিপূর্ণ, রূপা রাখিবার স্থান নাই। এখানে সোনা ও রূপা শব্দ দুইটিতে শ্লেষ আছে। সোনা = স্বর্ণ ও শূন্যতা, রূপা = রৌপ্য ও রূপ; শূন্যতা দ্বারা করুণা-নৌকা পরিপূর্ণ (শূন্যতা করুণার মিলিতাবস্থা), এখন রূপের আর স্থান নাই অর্থাৎ রূপজগতের অস্তিত্বের আর উপলব্ধি নাই। আর একটি পদেও আমরা দেখি, দাবা খেলার রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দাবার ছককে 'করুণা'

১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বলিযা উল্লেখ করিয়াছেন কাহ্নপাদ। 'করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল' (১২)। অন্যান্য কয়েকটি পদেও করুণার উল্লেখ আছে—'করুণমেহ নিরন্তর ফরিঅ' (৩০), 'অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ' (৩১), 'সুণ করুণার অভিণাচারে কাঅ বাক চিঅ' (৩৪) ইত্যাদি।

চর্যার দার্শনিকতাব 'অনীশ্বরতা'

চর্যাগীতিগুলির দার্শনিকতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ইহার অনীশ্বরতা। এই 'অনীশ্বরতা' শব্দটিকে ঠিক কি অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে—তাহার একটু ব্যাখ্যা প্রযোজন। নাস্তিক্যবাদ বলিতে প্রচলিত অর্থে ধর্ম-ঈশ্বর ইত্যাদি কোন কিছুকেই না মানা বোঝায। চর্যার দর্শন এই অর্থে নাস্তিক্যবাদী নহে। তবে দর্শনেব শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বেদের প্রামাণ্য স্বীকাব-অস্বীকার প্রশ্নে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে সেদিক দিযা চর্যাব দর্শনকে নাস্তিক দর্শক বলা চলে। কারণ চর্যার ধর্মে বেদেব ব্যর্থতা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

যাহের বাণ চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥ (২৯)

বৌদ্ধধর্ম বেদের প্রামাণ্য স্বীকার কবে না, সেই দিক দিয়া বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক। বৌদ্ধদর্শন শুধু যে নাস্তিক তাহাই নহে, তাহা অনীশ্বরও বটে। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব প্রশ্নে বৌদ্ধদর্শন নীরব। বৌদ্ধদর্শন তাই, বিশেষ অর্থে যেমন নাস্তিক, তেমনি অনীশ্বরও বটে। [প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, সাংখ্য-দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে বলিয়া আস্তিক—কিন্তু তাঁহাদের মতে প্রমাণাভাবহেতু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাই তাঁহারা অনীশ্বরবাদী।]

চর্যার অনীশ্বরতা বৌদ্ধ মতানুগ বলা চলে। অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ক্রম-অবনতিব পথে নানা দেবদেবীব অস্তিত্ব স্বীকার করিতে থাকে এবং যখন ইহা সহজযানে পরিণত হয় (সহজযানের ধর্মমতকে অবলম্বন করিয়াই চর্যাগীতিগুলি রচিত[১])—তখন তাহাতে বজ্রদেবতার অস্তিত্ব লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু সহজযান বজ্রযানে দেবতাদের অস্তিত্ব থাকিলেও প্রাধান্য নাই। এই সহজযান-বজ্রযানের প্রধান দেবতা বজ্রসত্ত্ব। ইনি দেবতা হইলেও দোহা ও চর্যাগীতিগুলির মধ্যে ইহার দেবত্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা ইঁহাকে একটি মানসিক অবস্থা বলিয়াই বেশী করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানগম্য সাধনলব্ধ একটি মানসিক অবস্থা—বজ্রসত্ত্বও সেইরূপ। বজ্রসত্ত্বই শূন্যতা ও করুণার অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত, গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবমুক্ত, প্রকৃতিপ্রভাস্বর 'বোধিচিত্ত'। তাহাই সহজ, তাহাই মহাসুখ। এই সহজ বোধিচিত্ত লাভই যেমন বজ্রসত্ত্বকে লাভ করা, তেমনি মহাসুখ লাভও বটে। বেদান্তের ব্রহ্মোপলব্ধিতে যেমন অলৌকিক আনন্দলাভ—এই সহজের উপলব্ধিতেও

১. 'ধর্মমত ও সাধন-পদ্ধতি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তেমনি মহাসুখ লাভ। চর্যাপদগুলির অনীশ্বরতা এই দিক দিয়াই লক্ষণীয়। বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন প্রচলিত অর্থে ঈশ্বর নহেন—চর্যাপদগুলির সহজও সেইরূপ।

চর্যাপদগুলির এই অনীশ্বরতা শুধু বৌদ্ধদর্শন বা বেদান্তের প্রভাবের ফল নহে। এখানে বেশী করিয়া কার্যকরী তন্ত্রের প্রভাব। তন্ত্র ধর্মবিষয়ক সাধন-পদ্ধতি। এই সাধন-পদ্ধতি অনুসরণের সিদ্ধি হিসাবে যে অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে শিবশক্তির মিলিত যুগনদ্ধ রূপই তাহার আদর্শ বটে, কিন্তু সেই মিলিত রূপ অপেক্ষা তাহার অন্তর্নিহিত আনন্দময় তত্ত্বরূপটি বেশী করিয়া বর্ণিত। তন্ত্রে তাই সিদ্ধি হিসাবে সেই প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত রূপের আনন্দকেই ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার মধ্য দিয়া লাভ করার কথা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ, বেদান্তের আনন্দ এবং তান্ত্রিকদের মহাসুখ,—বৌদ্ধতান্ত্রিকদের ধারণার মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। দুঃখবাদ হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বৌদ্ধধর্মের চারিটি আর্য সত্যের শেষটি। নির্বাণ তাহাদের সিদ্ধি—তাই নির্বাণই দুঃখ-নিবৃত্তি, সুতরাং নির্বাণই সুখ। চর্যায় তাই দেখি কোন বিশেষ দেবতার সাযুজ্য সামীপ্যলাভ কবি-সাধকদিগের লক্ষ্য নহে। নিজের মধ্যেই তান্ত্রিক উপায়ে সহজের উপলব্ধি ও মহাসুখ লাভই তাহাদের লক্ষ্য। কোন চর্যাতেই তাই ঈশ্বরের দৈবী মহিমার বর্ণনা নাই বরং বার বার উল্লেখ আছে—পরম উপলব্ধি 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা', 'স্বসংবেদ্য', 'অলক্ষ্যলক্ষণ', আগমবেদ পুরাণ পুথিতে মিথ্যাই তাঁহার স্বরূপ বর্ণনার চেষ্টা। অবশ্য সহজিয়া বৌদ্ধেরা তাই বলিয়া সহজকে দেহজ কোন আনন্দ বলিয়াও বর্ণনা করেন নাই। ইনি দেহস্থ হইয়াও দেহজ নহেন (দেহস্তোঽপি ন দেহজ)। ইনি উপলব্ধি-গ্রাহ্য, তবুও অতীন্দ্রিয়। চর্যার মূল লক্ষ্যের এই অনীশ্বরতা বা অবাঙ্-মনোগোচর আনন্দ স্বরূপতার জন্য চর্যার দার্শনিক স্বরূপকে mystic'ও বলা চলে।

৭. চর্যাগীতির সমাজ-পরিবেশ

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধন-সঙ্গীত। কিন্তু বিষয়বস্তুতে পুরাপুরি আধ্যাত্মিক হওয়া সত্ত্বেও চর্যাগীতিগুলির মধ্যে সে-যুগের জীবনযাত্রা ও বাস্তব সমাজব্যবস্থার যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র পাওয়া যায় তাহা আধ্যাত্মিক সাহিত্যে তো বটেই, সম্ভবত প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের খুব কম নিদর্শনেই পাওয়া যায়। এই দিক দিয়া চর্যাগীতিগুলি বাংলা সাহিত্যে

প্রায় একক বলা চলে। অবশ্য একথা ঠিক যে, সমস্ত প্রকার সাহিত্যের মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিফলন থাকে এবং কোন বিশেষ যুগের সাহিত্যসৃষ্টি হইতে সে-যুগের সমাজ-পরিবেশ ও গণমানসের একটি চিত্র নির্ণয় করা অসম্ভব না-ও হইতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনসঙ্গীতে, যেখানে তত্ত্বব্যাখ্যা ও বিন্যাসই কবিদের উদ্দেশ্য, সেখানেও কবিদের দৃষ্টি এত বেশী করিয়া বাস্তবমুখীন ছিল, একথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চর্যার সাধকেরা অবশ্য সহজ-সাধক ছিলেন। সেই হিসাবে জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কে তাঁহারা যে মতবাদ পোষণ করিতেন, তাহা ঠিক নিরোধের নহে। তবুও একথা স্বীকার্য যে, সহজ সাধনার ভিত্তিটি সাধারণত 'মায়াবাদী'ই হয় এবং চর্যাগীতিগুলিরও দার্শনিক ভিত্তিটি মায়াবাদী। এ অবস্থায় নিজেদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চর্যাগীতির কবিরা তৎকালীন সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রার যে সমস্ত রূপ-কল্প ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিস্ময়েরই বটে।

যাহা হউক, চর্যাগীতিগুলির সমাজ-পরিবেশ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য গীতিগুলির রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হইলেও নানা আলোচনা হইতে বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, এগুলি দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক মতে এ সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে পালরাজাদের পতন ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল। ধর্মের দিকে পাল-কম্বোজ-সেন-বর্মণ-রাজাদের মধ্যে বিশ্বাসের পার্থক্য ছিল। কিন্তু সামাজিক দিকে, অন্তত একটি বিষয়ে, ইঁহারা সকলেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি বিশেষ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙলার বর্ণবিন্যাস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠা ও হাড়ী ডোম শবর ইত্যাদি অন্ত্যজ জাতিগুলির সামাজিক অবনত অবস্থায় পতন। ব্যাপারটি অবশ্য ঠিক একদিনে সংঘটিত হয় নাই। দীর্ঘ দিনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এই ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। সুতরাং এ সম্পর্কে একটু দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলা দেশে যে বিভিন্ন জাতি বাস করিত তাহারা অর্থাৎ দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আদি-অস্ট্রেলীয়, নেগ্রিটো ইত্যাদি জাতিগুলি—কেহই সংস্কৃতির দিক দিয়া আর্য ছিল না এবং উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট আর্যদের মনে ইহাদের সম্পর্কে যে 'দর্পিত উন্নাসিকতা' ছিল, ঐতরেয় আরণ্যকে ইহাদের প্রতি প্রযুক্ত 'বয়াংসি' ইত্যাদি শব্দেই তাহার প্রমাণ সুস্পষ্ট। আর্যীকরণের চেষ্টারও বিরাম ছিল না। বাংলা দেশে আর্যীকরণের প্রথম সূত্রপাত ধরা যাইতে পারে গুপ্ত আমল হইতে। গুপ্ত হইতে পাল রাজগণ পর্যন্ত রাজারা ধর্মমতে ছিলেন বৌদ্ধ। তবুও সংস্কৃতির দিকে আর্যীকরণের চেষ্টায় তাঁহাদের অবদানও নিতান্ত কম নহে। বৌদ্ধেরা অবশ্য বেদ বিরোধী ছিলেন কিন্তু তাঁহারা বৈদিক সমাজ-

ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন, একথার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তাঁহাদের রাজত্ব কালেই ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির প্রসার ও সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্থান-নির্দেশ ক্রমশ সুস্পষ্ট হইতে থাকে। এই সময়কার প্রাপ্ত বহু লিপি ইত্যাদিতে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবপাল দেবের মুঙ্গের লিপিতে ধর্মপাল সম্পর্কে বলা হইয়াছে—তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে আমগাছি লিপিতে বিগ্রহ পালকে 'চাতুর্বর্ণ্য সমাশ্রয়' অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলা হইয়াছে। পরম-সৌগত এই পাল রাজাদের ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের বিবরণও প্রচুর পাওয়া যায়। (দ্র. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ২৮৭)। এই গুপ্ত ও পাল রাজারা বিশেষ করিয়া পাল রাজারা ধর্মমতে ছিলেন বিশেষ উদার। ফলে তখনকার সমাজেও এই উদারতা কিছুটা পরিমাণে প্রতিফলিত ছিল। অন্যদিকে আবার তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। ফলে একদিকে যেমন একীকরণের চেষ্টা ছিল, অন্যদিকে ছিল তেমনি বর্ণবিন্যাস দৃঢ়ীকরণের চেষ্টা। এই চেষ্টা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বর্মণ-সেন আমলে। বর্মণ রাজারা ছিলেন কলিঙ্গাগত, সেন রাজারা কর্ণাট-আগত। বহিরাগত এই দুই রাজবংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং সমাজের আর্যীকরণ ও বর্ণবিন্যাস প্রতিষ্ঠার রীতিমত পৃষ্ঠপোষক। বিশেষ করিয়া সেন বংশের শেষ দুই রাজা বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণ সেন নিজেরাই তো ছিলেন স্মৃতি রচয়িতা:—সুতরাং সেন আমলে বাংলাদেশে স্মার্ত-বর্ণবিন্যস্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা বেশ দৃঢ় হইয়া গেল।

রাজত্বের 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায়' সমাজের এই পরিবর্তনও দীর্ঘ এক ইতিহাস। এই ইতিহাসের গতিও সর্বদা সরলরেখায় নহে। আর্যপূর্ব বিভিন্ন শ্রেণী এক একবার এক এক বর্ণে গৃহীত হইয়াছে, একভাবে তাহাদের জাতি নির্ণীত হইয়া এক গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে, আবার হয়তো রাজরোষ কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহাদের বর্ণজাতি সবই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, অন্য গ্রন্থে তাহাদের বিবরণ অন্যভাবে লিখিত হইয়াছে। রাজারাজড়াদের মধ্যেও এই রীতির প্রাদুর্ভাব ছিল। সেন বংশ প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ পরে হন ক্ষত্রিয় এবং তখন তাহাদের পরিচয় হয় 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। প্রথমত বর্ণ বিন্যাসের ধারা ছিল না-জন্মগত, না-'গুণকর্ম বিভাগশঃ'—রীতিমত খেয়ালী। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিন্যাস সম্পর্কে বাঙালীর শ্রদ্ধাপূর্ণ সংস্কার ছিল বহুদিনকার—এবং বাংলা দেশে আর্যসংস্কৃতির প্রসারে তাহার বৃদ্ধিই হয়। ক্রমে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও নির্দিষ্ট হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও স্মরণ রাখা উচিত। সামাজিক পরিবর্তন কখনও অর্থনৈতিক পরিবর্তন নিরপেক্ষ নহে। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ইতিমধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বাণিজ্যপ্রধান বাঙলা দেশ কৃষি-

প্রধান বাংলা দেশে পরিণত হইয়াছে। বাণিজ্য প্রাধান্তের যুগে বিভিন্ন বণিক ও ধনোৎপাদক জাতিগুলির, ঠিক স্মৃতি শাস্ত্রসম্মত না হইলেও, কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান যে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষিপ্রাধান্তের যুগে তাহাদের সম্মান নষ্ট হইল এবং বিশেষ করিয়া অবহেলিত হইল সমাজশ্রমিক শ্রেণীরা। ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এমনি করিয়া অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্ত দিকেই সাফল্য লাভ করিল। (দ্র. বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৩১০)।

বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বলিতে সাধারণ অর্থে অবশ্য,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত বর্ণগুলিরই প্রতিষ্ঠা বুঝায়। কিন্তু বস্তুত ইহার ফলে ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য এই তিনটি শ্রেণীরই উদ্ভব হয়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সমস্ত জাতিই 'শূদ্র'। ব্যাপকভাবে এই শূদ্রপদবীর ব্যবহার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭৮) ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, পুরাণাদিতে শূদ্র বলিতে 'not only the members of the fourth Caste, but also those members of the three higher Castes who accepted any of the heretical religions or influenced by Tantric rites' তাহাদিগকে বুঝাইত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের ব্যাপক অর্থে 'শূদ্র' পদবীর ব্যবহারের কারণ এখানে জানা গেল। কারণ যাহাই হউক, একটি তথ্য এখানে বেশ স্পষ্ট হইয়া যাইতেছে যে, বাংলা দেশে বর্ণবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবার পরও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে বিশেষ কিছুই ছিল না। সকলেই শূদ্র পর্যায়ে গৃহীত হইত ; এবং দুইটি (অথবা চারিটি) বর্ণ ছাড়াও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বলিয়া শূদ্রের নিম্নেও আর একটি শ্রেণীর অস্তিত্ব তখন ছিল। বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ আছে। মনে হয় ধর্মের দিকে ইহারা ছিল প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং আর্থিক পর্যায়ে তাহারা ছিল সমাজশ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্গত। এযুগের ডোম-শবর চণ্ডাল শ্রেণীই সেই অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য পঞ্চম (?) বর্ণ। চর্যাগীতিতে ইহাদের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা একদিকে যেমন ধর্মক্ষেত্রে ইহাদের বৌদ্ধত্ব, অন্যদিকে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবহেলিত বিপর্যস্ত অবস্থাই প্রমাণ করে। সেন-বর্মণ আমলে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। বৌদ্ধ পালরাজারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন—কিন্তু সেন রাজাদের আমলে প্রাপ্ত লিপির একটিতেও বৌদ্ধদের ভূমিদানের উল্লেখ নাই। বরং বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অভিযানের অনেক কাহিনীই প্রচলিত আছে। রাজশক্তির বিরূপতা-ভাজন এই বৌদ্ধেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা যে সহজেই হারাইত, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

কিন্তু দুঃখের কারণ শুধু এখানেই নহে। সমাজনায়ক ব্রাহ্মণেরা সমাজের মধ্যে নানা স্তরে নানা ভেদবিভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেরাও সেই ভেদ-বিভেদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। নিজেদের মধ্যেও তাঁহাদের নানা স্তরবিভাগ, নানা

গাঞী ইত্যাদি। তবুও কিন্তু যেটুকু তাঁহাদের হাতের মধ্যে ছিল সেখানে পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। স্মৃতি শাস্ত্রগুলির মধ্যে এমন অনেক বিধিব উল্লেখ আছে যাহাতে দেখা যায় একই অপরাধের জন্য নিম্ন জাতীয়েরা যে শাস্তি পাইতেছে ব্রাহ্মণেরা তাহা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইতেছেন বা মোটেই পাইতেছেন না। সমাজের মধ্যে নানা বিধিনিষেধের অন্তরালে ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর জনসাধাবণের জন্য নানা প্রকাব অন্যায় আচরণের পথ প্রশস্ত রহিয়াছে—কিন্তু সামান্য অপরাধেও নিম্নশ্রেণীব লোকদের পাইতে হইতেছে কঠোর শাস্তি।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে চর্যাগীতিগুলি বচিত। সামাজিক বৈষম্য ও পক্ষপাত, উচ্চ বর্ণেব মধ্যে নানা প্রকাব অন্যায় ও ব্যভিচার, নিম্নবর্ণ অন্ত্যজদেব সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাব ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়—ইহাই ছিল চর্যা রচনার যুগে সামাজিক অবস্থাব স্বরূপ। সুতরাং এই যুগে বসিযা বিপর্যস্ত কোন সামাজিক শ্রেণী যদি সাহিত্য বচনা কবে এবং তাহাতে যদি বাস্তব প্রতিফলন হয় তবে স্বভাবতই সেই চিত্র হইবে দুঃখেব অথবা কাল্পনিক দুঃখনিবৃত্তির বা মন-গড়া সুখেব। হইযাছেও তাই। চযাগীতিগুলির মধ্যে যে সমাজচিত্র ও বাস্তব জীবনযাত্রাব আভাস ইঙ্গিত পাওযা যায, তাহাতে একদিকে সমাজের এই ভেদ বিভেদ এবং বৈষম্যের চিত্র, অন্যদিকে দুঃখপূর্ণ দরিদ্র জীবন-যাত্রার কথনও পূর্ণাঙ্গ কথনও বা খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদান লক্ষ্য কবা যায।

জীবনযাত্রাব বাস্তব ও বিভিন্ন উপাদান

বাসস্থান: অস্পৃশ্যতা॥ সমাজ চিরকালই শ্রেণীবিভক্ত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানা স্তবেব মধ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যও কিছু নূতন কথা নহে। চর্যাপদের যুগেও সমাজেব এই শ্রেণীবিভক্ত রূপের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। পূর্বে আমবা ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া চর্যাব যুগের সামাজিক পটভূমিকা ও তাহার স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি নিম্নকোটির সমাজশ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণত সমাজে অবজ্ঞাত ছিল—আর্থিক দিকেও রীতিমত বিপর্যস্ত ছিল। তাহাদের বাসস্থানও ছিল দূরে, সমাজের উচ্চকোটির লোকেদের বাসস্থানের স্পর্শ বাঁচাইয়া। কয়েকটি চর্যাতেই ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। (১০)

'নগর বাহিরে, ডোম্বি তোর কুড়ে ঘর।' অন্য একটি চর্যাতেও আছে গ্রাম বা নগরের বাহিরে উঁচু পর্বতের উপর শবরের বাস—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসহি সবরী বালী। (২৮)

কিম্বা 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী,' (৩৩)—ইত্যাদি সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, তখনকার দিনে এই সমস্ত দরিদ্র নীচ জাতীয় ডোম

শবর প্রভৃতিদের বাসস্থান ছিল গ্রামের প্রান্তে পর্বত গাত্রে কিংবা টিলায়। অবশ্য উচ্চকোটির লোকদের সহিত ইহাদের কোন যোগাযোগ যে ছিল না,তাহা নহে। অনেক সময় তাহাদের মনোহরণের জন্য ডোম্বীদের চেষ্টাও ছিল বেশ প্রকট—তবুও কিন্তু মনে হয় এসমস্ত ব্যাপার সামাজিক দিক দিয়া খুব শ্রদ্ধেয় ছিল না।

জীবিকা॥ এই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সমাজশ্রমিকেরা আর্থিক দিকেও ছিল ভীষণভাবে দুঃস্থ। তাহাদের জীবিকার যে কয়েকটি উপায়ের কথা চর্যাপদে আছে, তাহার কোনটিই তেমন সম্মানজনক বা অর্থকরী নহে। ইহাদের জাতীয় বৃত্তি ছিল, মনে হয়, তাঁত বোনা ও চাঙ্গড়ী প্রস্তুত করা—'তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা' (১০)। ইহাদের অন্যতম জাতীয় বৃত্তি ছিল নৌকা বাওয়া এবং সম্ভবত মাছধরা। অনেকগুলি চর্যার মধ্যে নৌকার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার হইযাছে। এই নৌকা অবশ্যই আধ্যাত্মিক অর্থে উদ্দিষ্ট—কিন্তু বার বার নৌকা ও নদীর ব্যবহার সহজেই দেশের নদীমাতৃকতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অনেকগুলি পদেই নৌকা কি করিয়া চালাইতে হইবে, কি করিয়া কাছি উপাড়িয়া গুণ টানিতে হইবে, কিভাবে জল সেঁচিতে হইবে তাহার নানা প্রকার নির্দেশ আছে। (দ্র, ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ৩৮ ইত্যাদি চর্যাপদ)

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি।
বাহ তু কামলি সদগুরু পুচ্ছি॥ (৮)

কিম্বা, পাঞ্চ কেড়ুয়াল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিঠত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ-দুখোলে সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥ (১৪)

ইত্যাদিতে কাছি টানিবার যে নির্দেশ আছে, মনে হয়, তাহা পূর্ববঙ্গীয় দড়াজাল। পূর্ববঙ্গে এখনও ঐরূপ দড়াজাল টানিযা মাছ ধরিবার রীতি প্রচলিত আছে। এবং যে সমস্ত শ্রমিকের সাহায্যে ঐ জাল টানানো হয় তাহাদিগকে কামলা-ই বলে। চর্যাকারদের জীবনের সহিত নদীর যোগ যখন অতই ঘনিষ্ঠ—তখন ইহা খুবই স্বাভাবিক—ধীবর বৃত্তি তাহাদের জীবিকার অন্যতম উপায় ছিল। ইহাদের ব্যাধ বৃত্তির উল্লেখ আছে দুইটি চর্যাতে। একটিতে তো শিকার ধরিবার রীতিটির বেশ দীর্ঘ বর্ণনা আছে। চারিদিক হইতে জাল পাতিয়া, হাঁক পাড়িয়া হরিণ শিকার করা হইত। (৬)। ইহাদের অন্যতম বৃত্তি ছিল—মদচোঁয়ান, তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে ৩ সংখ্যক চর্যা-গীতিটিতে। (এক সে শুণ্ডিনি দুইঘরে সান্ধঅ। চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ॥ ইত্যাদি)। ধুনুরী বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় একটি চর্যাতে – তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু। (২৬)। তরু ছেদনের উল্লেখ আছে একাধিক চর্যাতে—(৫, ৪৫) এবং কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেঁদনের যেরূপ স্পষ্ট বর্ণনা আছে তাহাতে মনে হয় এই সমাজশ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ইহা অন্যতম বৃত্তিই ছিল।

গীত ইহাদের শুধুমাত্র আনন্দ ও অবসর বিনোদনের উপাদানই ছিল না, সম্ভবত জীবিকার অন্যতম উপায়ও ছিল ; আর সে নৃত্যগীতের কলা-কৌশলও ছিল বহু বিচিত্র—

এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী
তহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ (১০)

চৌষট্‌ঠি দলযুক্ত পদ্মের উপর এই নৃত্যের কল্পনা হইতেই তৎকালীন বহু বিচিত্র নৃত্যবৃত্তির কথাই অনুমিত হয়। এই চর্যায় উল্লিখিত 'নড়এড়া' (নট পেটিকা) এবং ১৭ সং চর্যায় উক্ত 'বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'—ইত্যাদি হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, চর্যার যুগে বুদ্ধচরিত অবলম্বনে নৃত্যগীতিময় বুদ্ধনাটক অভিনয়ের রীতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত আধুনিককালে রাঢ় অঞ্চলে যে ভ্রাম্যমাণ লেটোরদল দেখা যায় (দ্র, নট, নাট্য নাটক : ড. সুকুমার সেন ; পৃ : ১০১) তেমন নাটুকে দল সেযুগে পেটিকার মধ্যে সাজসজ্জা লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অভিনয় দেখাইয়া জীবিকার্জন করিত।

দৈনন্দিন জীবনের চিত্র : দুঃখ, অশান্তি, অসঙ্গতি ॥ চর্যাগীতিগুলিতে তৎকালীন সামাজিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে সকল চিত্র পাওয়া যায় তাহা দীন-দরিদ্র সুলভ। জীবনের নানাদিকে দুঃখদুর্দশা, অন্নাভাব, সামাজিক অশান্তি, মানসিক দুঃখ, সেই চিত্র-গুলির মূল কথা। অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটি চর্যাতে উল্লিখিত আছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গ সংসার বড.হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামায় ॥ (৩৩)

আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে তৎকালীন দরিদ্র জনসাধারণের অতি দুঃখের একখানি চিত্র। সমাজ সংসার হইতে দূরে, প্রতিবেশীহীন টিলার উপর ঘর, হাঁড়িতে ভাত নাই, তবুও তাহার উপর চাপ। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে জগৎ-সংসারে শুধু অসঙ্গতিই আছে। পদকর্তা পরবর্তী পংক্তিগুলিতে সেই অসঙ্গতির চিত্রকেই পরিস্ফুট করিয়াছেন—

বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে ॥
পিটা দুহিএ এ তিণা সাঁঝে ॥
জো সো বুধী সোধ নিবুধী।
জো যো চৌর সোই সাধী ॥
নিতে নিতি ষিআলা ষিহে যম জুঝঅ।
ঢেণ্ঢণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ ॥ (৩৩)

বলদ [illegible], গাভী বন্ধ্যা ; [illegible] পাত্র ভরিয়া দোহন করা হয়, যে বোঝে

সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু (অথবা কোটাল) ; নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢনপাদের গীতি খুব কম লোকেই বোঝে। আধ্যাত্মিক অর্থ ই এখানে মূল হইলেও বাহ্যিক দিকে অভিধায় যে অসঙ্গতির চিত্র ফুটিয়াছে তাহা মনে হয় সামাজিক অসঙ্গতিরই প্রতিফলন। এইরূপ নৈরাশ্য ও দুঃখের ইঙ্গিত অন্য কয়েকটি চর্যাতেও আছে—হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে (২০)—আমি আশাহীনা, স্বামী ক্ষপণক। অথবা—

অপণে নাহি সো কাহেরি শঙ্কা।
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা॥ (৩৭)

আমি নিজেই নাই তো কাহার শংকা করিব? তাইতো আমার মহামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা টুটিয়া গেল।

সামাজিক অশান্তি ও অবস্থাবিপর্যয়ের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় আব কয়েকটি চর্যাতে—

কাহেরে ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খণহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি॥ (৬)

এখানে অবশ্য হরিণের রূপকে ধর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে। হরিণ এখানে আধ্যাত্মিক অর্থে চিত্তকে বুঝাইতেছে। চিত্ত হরিণের কি অসহায় অবস্থা! চারিদিকে হাঁক পড়িতেছে, নিজের জন্যই সে নিজের শত্রু। দুঃখে পড়িয়া 'তিণ ণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ণ পাণী'—হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না জল পান করে না। তৎকালীন সামাজিকের অসহায় অবস্থাই প্রতিফলিত হইয়াছে চিত্ত-হরিণের চিত্রে। পববর্তী আর একটি চর্যাতে যে চিত্র পাওযা যায় তাহা আরও দুঃখ-বিপর্যযের—

বাজ ণাব পাড়ী পউআঁ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ॥
অজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥
ডহিজো পঞ্চপাটণ ইন্দি বিসঅ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ন থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥ (৪৯)

পদ্মখালে বজ্র-নৌকা বাহিত হইল, নির্দয় দস্যুতে দেশ লুট করিল। আমার গৃহিণী চণ্ডালী হইল, আমি আজ বাঙালী (বেচারী ?) হইলাম। আমার ইন্দ্রিয়-

বিষয় দগ্ধ হইল ; মন যে কোথায় গেল জানি না। সোনা রূপা আমার কিছুই থাকিল না—নিজ পরিবারে (বেশ) সুখেই রহিলাম ! চতুষ্কোটি ভাণ্ডার মোর নিঃশেষ হইল, এখন জীবিতে বা মৃতে পার্থক্য কি ! দুইটি চিত্রেই দেশের মধ্যকার অশান্তি ও অরাজক অবস্থার নির্দেশ অতি সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ শেষের চিত্রটিতে অসহায়তা যেন অতি প্রকট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে—দেশে অশান্তির কারণ হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ই নয়, চুরি ডাকাতিরও প্রাদুর্ভাব ছিল। অবশ্য দ্বিতীয়টি প্রথমটির আনুষঙ্গিক। সদ্যোক্ত পদটিতে ডাকাতির কথা আছে। অনুরূপ চুরির কথা আছে কয়েকটি পদে—কানেট চৌরেঁ নিল অধরাতি (২), বাটত ভঅ খাণ্ট বি বলআ (৩৮) জো সো চৌর সোই সাধী (৩৩) ইত্যাদি ! চোরের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিতও আছে কয়েকটি পদে—

স্থণ বাহ তথতা পহারী (৩৬)

শূন্য গৃহ, তথতা প্রহরী ; অথবা তালা চাবির ব্যবহার (৪)—ইত্যাদি সেই সতর্কতারই প্রতিচ্ছবি।

নারীর জীবনেব অতি দুঃখের একখানি মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় আর একটি চর্যাতে—

ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপূড়।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া॥ (২০)

প্রসব করিলাম মাগো আঁতুড় চাই. কিন্তু যাহা চাই তাহা পাই না। এই আমার প্রথম প্রসব—বাসনার পুটুলি, নাড়ি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাও লুপ্ত হইল।

এই দুঃখবিপর্যযের মধ্যে সামাজিক নৈতিক আদর্শ যে বিশেষ উঁচুস্তরের ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্তত একটি চর্যাতে—গৃহবধূর ব্যভিচারের ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট—

দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥ (২)

'দিবসে বধূটি কাকের ভয়ে ভীত— আর রাত্রি হইলে কামরূপ চলিয়া যায়।'

নৈতিক মান সমাজের উচ্চকোটির জন-সাধারণের মধ্যেও খুব উঁচু ছিল না। ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, অবৈধ আচরণের জন্য উচ্চকোটির লোকেদেব সম্পর্কে সমাজ-বিধির পক্ষপাতমূলক প্রশ্রয় ছিল। ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর লোকদের ডোম শবর ইত্যাদি অন্তেবাসী রমণীদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক সহজেই প্রচলিত ছিল। এইরূপ অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে ১০ সংখ্যক চর্যায়—

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছোই ছোই জাইসো ব্রাহ্ম নাড়িয়া। (১০)

সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা॥ এইরূপ অবস্থাতে সুস্থ শান্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষাও অতি স্বাভাবিক। চর্যায কযেকটি গীতে সেই ধবনেব অতি সুন্দর চিত্র আছে। পার্থিব সম্পদ নাই, কিন্তু আত্মিক দিকেও অন্তত যাহাতে সুখে থাকা যায সেজন্য তাহাদেব চেষ্টাব অন্ত নাই। সেইরূপ একটি সুখের চিত্র—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসহি সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পবহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সববো পাগল শববো মা কবো গুলী
গুহাবা তোহোবি।
ণিঅ ঘবিণী ণামে সহজ সুন্দরী॥
ণাণা তরুবব মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সববী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পডিলী সববো মহাসুখে সেজ্জি ছাইলী।
সববো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ বাতি পোহাইলী॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপূব খাই।
সুণ নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে বাতি পোহাই॥ (২৮)

শবর-শবরীর মিলিত জীবন যাত্রার অতি অপরূপ মাধুর্যমষ চিত্র।—'উচ্চ পবতেব উপব বাস কবে শবরী বালিকা, পরিধানে তাহার মযূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা, এই-ই শবরের নিজ গৃহিণী, নামে সহজসুন্দবী। নানা তরুবব মুকুলিত হইযাছে—গগনে ডাল ঠেকিযাছে (অর্থাৎ মিলনেব পরিবেশ, বসন্তেব আগমন ঘটিয়াছে।) কর্ণকুণ্ডলধারিণী শবরী একাকী বনে ভ্রমণ করিতেছে। শবব ত্রিধাতুব খাট পাড়িল, মহাসুখে শয্যা বিছাইল। নাগব শবব, নাগবী শবরী প্রেমে রাতি পোহাইল। কর্পূর-বাসিত পান খাইযা, নৈরামণিব (শবরীর) কণ্ঠলগ্ন হইযা মহাসুখে শববের রাত্রি প্রভাত হইল। নিববচ্ছিন্ন প্রেমের পবিপূর্ণ চিত্র। হয়তো জীবনে যে সুখ এই শবর শবরীরা লাভ করিতে পারে নাই, অধ্যাত্ম সাধনার উদ্গতির (Sublimation) মধ্য দিযা তাহারই বাসনা চরিতার্থ করিবার কল্পনা ইহা। তবুও এ চিত্র এক হিসাবে অবাস্তব নয, কারণ একেবারে বাস্তব-নিরপেক্ষ কল্পনা অসম্ভব। শবরের কল্পনাব এই চিত্রের ভিত্তিভূমি তাই বাস্তব সন্দেহ নাই। হয়তো সমাজেব উচ্চকোটির লোকেরা এই নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী ছিল।

অনুরূপ আর একটি বিস্তৃত চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় ৫০ সংখ্যক গীতিতে—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড় ছাড় মাআ মোহা বিষমে দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী॥

হেরি সে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে সমতুলা।
ষুকড় এ সে রে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।
অণুদিণ শবরো কিম্পি ণ চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥ (৫০)

গগনের গায়ে উঁচু টিলাতে শবরের বাড়ী, নৈরামণিকে কণ্ঠে লইয়া এই শূন্য অবরোধে মহাসুখে জাগিয়াই রাতি কাটে। এই তৃতীয় বাটিকা আকাশ তুল্য, এখন সুন্দর কাপাস ফুল ফুটিয়াছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় পরিপূর্ণ, অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, যেন আকাশ ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে। কাগনী ধান পাকিল, শবরী জগৎসংসার ভুলিয়া মহাসুখে মত্ত হইল।— সুখ পরিকল্পনার সত্যই পরিপূর্ণ চিত্র! বৃক্ষান্তরালে উঁচু টিলাতে শান্তিপূর্ণ গৃহ: কণ্ঠাশ্লিষ্ট প্রেমময়ী গৃহিণী; ধান পাকিয়াছে— অন্নের অভাব এবার মিটিবে। কাপাসফুল ফুটিয়াছে—বস্ত্রের অভাবও থাকিবে না। সুখের জন্য মানুষের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে!

খণ্ড চিত্র॥ তৎকালীন জীবনযাত্রার এরূপ বিস্তারিত চিত্র ছাড়াও চর্যাগুলির মধ্যে তৎকালীন জীবনেব অনেক খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত, অনেক আচার-ব্যবহার রীতি নীতি ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। তৎকালীন জীবনযাত্রা সুখেরই হউক আর দুঃখেরই হউক—আধুনিক জীবন যে সেই জীবনেরই ঐতিহাসিক ধারার ক্রমপরিণতি—তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়।

তখন বাঙ্গালী পরিবার নানা পরিজন লইয়া গঠিত হইত; কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রী লইয়া নহে। একাধিক চর্যাতে উল্লিখিত আছে শ্বশুর শাশুড়ী ননদ শালী ইত্যাদি লইয়া পরিবারটি গঠিত।—

মারিঅ শাসু নণন্দ ঘরে শালী।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী॥ (১১)

শাশুড়ী ননদ শালী স্ত্রী ইত্যাদি সমস্ত পরিজনবর্গকে হত্যা করিয়া কাহ্ন কাপালিক হইল। বিবাহের রীতিতেও আধুনিক জীবনযাত্রার সহিত তৎকালীন জীবনের অনেক মিল। বাদ্যভাণ্ড সহকারে বরযাত্রা, বিবাহে যৌতুকপ্রথা, নারীদিগের বাসর জাগা ইত্যাদির প্রচলন তৎকালেও ছিল। বিবাহের চিত্রটি বেশ পূর্ণাঙ্গ—

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিআ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম॥

অহণিসি সুরঅ পসঙ্গে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ॥ (১৯)

পটহ ও মাদল, জোড়া ঢোল, কাঁসি ইত্যাদির জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত হইল, কাহ্ন ডোম্নীকে বিবাহ করিতে চলিল। বিবাহে তাহার জন্ম সার্থক হইবে—বিবাহের যৌতুক অনুত্তর ধর্ম। অহর্নিশি সুরত প্রসঙ্গে যায়, রমণী পরিবৃত হইয়া বাসর রজনী পোহায়। এখানে বিবাহের উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়া ধর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে—কিন্তু তৎকালীন বিবাহের যে বাস্তব চিত্র পাওয়া গেল, চিত্র হিসাবে তাহা নিখুঁত। এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানবহুল বিবাহ ছাড়াও তৎকালে যে 'সাঙ্গা'ও প্রচলিত ছিল তাহার ইঙ্গিত আছে—

'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।' (১০)

একটি পদের মধ্যে তৎকালীন সৎকার প্রথারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এ রীতিটিও আধুনিক রীতির মত—

চারিবাসে তা ভলা রে দিঅঁা চঞ্চালী
তঁহি তোলি শবরো দাহ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো নিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী॥ (৫০)

চারি বাঁশে (খাট, চালি) গড়িল চেঁচাড়ি দিয়া, তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করা হইল। কাঁদিল শকুনি শৃগাল। সংসারমত্ত মরিল, দশদিকে পিণ্ড দেওয়া হইল। শবর নির্মূল হইল, শবরালি ঘুচিল।

পারিবারিক জীবনের খণ্ড চিত্র হিসাবে গোপালন ও দুগ্ধ দোহনের কথাও পাওয়া যায়। বলদের ব্যবহার, (সম্ভবত লাঙ্গল চষিবার জন্য) তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল না তাহাও অনুমান করা চলে বলদ শব্দটির উল্লেখ হইতে। হস্তীর ব্যবহার তখনকার দিনে অজ্ঞাত ছিল না। অন্তত ধনী ব্যক্তিরা ব্যবহার করিতেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় দুইটি গীতিতে। দুইটি স্তম্ভের সহিত শিকল দ্বারা হস্তীকে বাঁধিয়া রাখা হইত, বিশিষ্ট কোন ধ্বনি দ্বারা সে চালিত হইত—এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় পদ দুইটিতে (৯,১৯)।

অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে দাবা খেলা তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়; দাবা খেলিবার কি রীতি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল তাহা অবশ্য জানা যায় না, তবে যেটুকু উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় আধুনিক রীতি হইতে তাহা খুব ভিন্ন নহে।

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নঅবল।
সদগুরু বোহেঁ জিতেল ভববল॥

* * *

পহিলে তোড়িআ বড়িআ মরাড়িউ।

গঅবরে তোলিয়া পাঞ্চ জনা ঘালিউ ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভবভল জিতা ॥ (১২)

করুণা পিঁড়িতে নববল (দাবা) খেলি। গুরু উপদেশে জয়লাভ করি। প্রথমে তুড়িয়া ঘোড়ে মারা হইল, গজ দ্বারা পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল। মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরকে (রাজাকে) পরিনিবৃত্ত করিয়া জয় করা হইল।

সামাজিক ব্যসন হিসাবে মদ খাওয়া তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। মদচোয়ানো যেমন একটি শ্রেণীর জীবিকা ছিল—মদ খাওয়া তেমনি অনেকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মদের দোকানে বিশেষ কোন চিহ্ন থাকিত এবং তাহা দেখিয়া গ্রাহকেরা দোকান চিনিত—'দশমী দুআরত চিহ্ন দেখইআ। আইল গরাহক অপণে বহিআ' (২)॥ কর্পূর দিয়া পান খাওয়া বিলাসিতা ও আনন্দের অংশ বিশেষ।

সামাজিক উৎসব আনন্দের অঙ্গ হিসাবে নাচগান ইত্যাদির প্রচলন ছিল প্রচুর। নাচ গান বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ বার বার পাওয়া যাইতেছে। চর্যাগুলি গান—এগুলি যে সুর লয় সংযোগে গীত হইত তাহা তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটি পদে (১৭) 'হেরুঅবীণা' নামে যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে তাহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যন্ত্রটি গোপীযন্ত্র জাতীয় কোন যন্ত্রবিশেষ। লাউ, দণ্ডী, তন্ত্র ইত্যাদির সংযোগে যন্ত্রটির গঠন। মনে হয় তখনকার দিনেও পদগুলি কীর্তনের ন্যায় গীত হইত এবং তাহাতে হেরুক বীণা বাজিত। এই পদটিরই শেষ দিকে যে ইঙ্গিত আছে তাহাতে মনে হয় তখনকার দিনে নাটক অভিনয় প্রচলিত ছিল। 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই ॥' (১৭)—নাচ গান নাটক সমস্ত কিছুরই ইঙ্গিত আছে। অবশ্য নাটকে নৃত্য, গীত এবং সাজ-পোষাক ব্যবহারের ইঙ্গিত থাকিলেও সংলাপ ব্যবহৃত হইত কিনা তাহার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই। নাটকের রূপ যেমনই হউক, আনন্দের উপাদান হিসাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নটবৃত্তি যে বিশেষ একটি শ্রেণীর জীবিকা ছিল তাহার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করিয়াছি।

একটি পদে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা আছে। পদটি অবশ্য মূলে পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ হইতে সম্ভাব্য রূপটি অনুমান করা চলে—

(বিষয়েন্দ্রিয়ের) দুর্গসমূহ জিত হইল, শূন্যরাজ মহাসুখী হইলেন। তুর্য শঙ্খ-ধ্বনি অনাহত গর্জন করিল। (সংসার মোহরূপ) সৈন্য দূরে পলাইল। সুখ নগরীর প্রধান স্থান সব জয় করা হইল। আঙ্গুল ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুক্কুরীপাদ বলিতেছেন।

জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদান :

ইহা ছাড়া কতকগুলি চর্যাতে—তখনকার জীবনযাত্রার বাস্তব উপাদানের

কিছু কিছু নামোল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। ঘরে ব্যবহৃত বাসনপত্রাদির মধ্যে—হাড়ি পিঠা, (দুধ দুহিবার পাত্র), ঘড়ি, ঘড়া ', ঘড়ুলি (গাড়ু) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অলংকারের মধ্যে আছে—কাণেট (কর্ণভূষণ), ঘণ্টানেউর (নূপুর), কাঙ্কান (কঙ্কন), মুত্তিহার (মুক্তাহার) এবং কুণ্ডল। আরশি ব্যবহারের উল্লেখ আছে একটি চর্যাতে। বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে উল্লেখ আছে—পড়হ (পটহ) মাদল, করণ্ড (ঢোল ? , কসাল (কাঁসি), ডমরু, ডমরুলি, বীণা, বাঁশি ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদির মধ্যে উল্লেখ আছে—কুঁঠার, কোঞ্চাতাল (তালা চাবি) টাঙ্গি, পিড়ি, চীরা (পতাকা , সোনা রূপা ইত্যাদির। থানা কাছারি ইত্যাদিও প্রচলিত ছিল বোঝা যায় উআরি (কাছারি এবং দুষাধি (কোটাল) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইতে।

ধর্মীয় রূপ :

চর্যাগুলির মধ্য হইতে তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় রূপটি বেশ সুন্দরভাবে জানা যায়। সমাজে তখন কাপালিক, যোগী, ক্ষপণক, রসসিদ্ধা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন। তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের দিকে ইহাদের মধ্যে রীতিমত যোগ ও সাদৃশ্য ছিল। ইহাদের জীবনযাত্রার অনেক খণ্ড চিত্র চর্যার এখানে ওখানে ছড়াইয়া আছে। বেশী করিয়া উল্লেখ আছে—উলঙ্গ, হাড়ের মালা গলায় পরা, সাধন-সঙ্গিনী সমভিব্যাহারী কাপালিকের।

নারীর অবস্থা :

সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল চর্যাগীতি হইতে তাহার কোন প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য চর্যাগীতির যাহা উদ্দেশ্য তাহাতে তাহা পাওয়া সম্ভবও নয়। তবে দুঃখ-বিপর্যয়ের চিত্র প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি নারীরাও ছিল সমদুঃখভাগী। নারীরাও যে সাধনার জগতে অগ্রসর ছিল এবং সাধন-সঙ্গিনী হিসাবে তাহাদের প্রয়োজন ছিল তাহার অতি প্রচুর উল্লেখ চর্যাগীতিগুলিতে আছে। নারীদের জন্য স্থানবিশেষে মহিলা-মহল থাকিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১৩ সং চর্যাতে উল্লিখিত—'শূন মেহেরী'র ব্যাখ্যা শূন্য-অন্তঃপুর বা মহিলা-মহল, এইরূপ অনুমানের ভিত্তি।

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি চর্যাগীতিগুলি সাধন-সঙ্গীত। সুতরাং সমাজের বাস্তব চিত্র অঙ্কন তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবুও কোন যুগের সাহিত্যই সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিরপেক্ষ হয় না। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপকল্প ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়া যুগজীবনের বাস্তব আভাস স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এমন কি, কোন বিশেষ যুগে কোন বিশেষ ধর্ম বা সাধনার প্রচলনের মধ্যেও সমাজ পারিবেশগত কারণ থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির

মধ্যে ও যুগ ও জীবনের প্রতিফলন হিসাবে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা তৎকালীন ইতিহাস-বিরোধী তো নহেই বরং ইহার মধ্যেই নিহিত আছে ধর্মীয় জীবনের অভিপ্রায়-সূত্রটি। জীবনযাত্রার নানা আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনযাত্রার নানা প্রকার বাস্তব উপাদান সবই তৎকালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন। এই সমস্ত রীতি-নীতির অনেকগুলিই আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়া বাঙালীজীবনের অখণ্ড ধারাবাহিকতাও সূচিত করিতেছে।

৮ চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য

কাব্য-বিচার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আদিতম উপাদান হিসাবে চর্যাগীতিগুলির উল্লেখ সর্বদাই করা হয়, কিন্তু এগুলি আদৌ সাহিত্যিক নিদর্শন কি না এ প্রশ্ন সাধারণত করা হয় না। বস্তুত এগুলির সাহিত্যিক মূল্য কতখানি তাহার নির্ভুল বিচার এখন আর সম্ভব নহে। যুগপরিবর্তনে সাহিত্যের ভাব ভাষা পরিবর্তিত হইয়া যায়। ফলে, অনেক সময় কোন কোন কাব্য-সাহিত্যের সাহিত্যিক মূল্যনিরূপণে বাধা ঘটায়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। হাজার বছর পূর্বেকার কেবল অপভ্রংশের খোলসমুক্ত শিশুবয়সী এই বাংলা ভাষা আধুনিক কালে বাঙালীর কাছেও ব্যাখ্যাগম্য। ভাষার এই দুর্বোধ্যতার জন্য রস যাহা আছে তাহারও উপলব্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে। অন্যদিকে ভাবের বিবর্তনও এবিষয়ে কম বাধা নহে। পাঠকসাধারণের মনে আবেদন সৃষ্টি করিতে পারা এবং তাহাদের অন্তরের রম্য-বোধকে জাগ্রত উদ্বোধিত করিয়া অলৌকিক আনন্দের মায়ালোকে পৌঁছাইয়া দেওয়াই সাহিত্যের কাজ, তাহাতেই সাহিত্যের সাহিত্যত্ব। এইভাবে সহৃদয় হৃদয়বেদ্য হইয়া উঠিবার জন্য কবির মন ও পাঠকের মনের সমতা চাই। অর্থাৎ কবির মনোসৃষ্ট ভাববস্তুর বাসনা-সংস্কার পাঠকের মনে যদি না থাকে তবে সেই কাব্য পাঠকের মনে কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। এইখানেই কাব্য-বিশেষের কোন এক বিশেষ যুগে খ্যাতির অধিকার থাকা সত্ত্বেও পরে সেই খ্যাতি নষ্ট হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্থায়িভাবগুলি সম্পর্কে বক্তব্য যাহাই হউক না কেন, কাব্যসৃষ্টির উপাদান বিভাব, অনুভাব এবং মানুষের মনের সঞ্চারী-ভাবগুলি সঞ্চরণশীল। যুগে যুগে তাহারা পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাই সন্দেহ করিয়াছিলেন—

আজি নববসন্তের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে॥

কবির নিজের সম্পর্কে এ সন্দেহ অমূলক হইলেও, সাধারণ কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কিন্তু ইহা একেবারে অমূলক নহে। মানুষের মনের স্থায়ী রসের বীজ ও সাহিত্যের স্থায়িত্বের কথাকে একেবারে অস্বীকার না করিলেও একথা অবশ্যই মানিতে হয় যে, পৃথিবীর কোন সাহিত্যই চিরকাল সমান ভাবে রসসৃষ্টিতে সক্ষম নহে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, কেবল মাত্র স্থায়িভাবই রসসৃষ্টির কারণ নয। যে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী সহযোগে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টায়—এবং স্থায়িভাব স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও—ইহাদের পরিবর্তনশীলতার জন্যে রসোপলব্ধি ব্যাহত না হইলেও ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং চর্যাগীতিগুলির রস তৎকালীন পাঠকদের মনে যতখানি ছিল আজ আর কিছুতেই তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে না। অন্যদিকে চর্যার ভাষা ও বিষয়বস্তুর (তত্ত্বের) ব্যাখ্যাগম্যতাও ইহার রসোপলব্ধির পথে বাধা। কাব্য ব্যাখ্যাগম্য হইলে 'সুধী' ব্যক্তিদের উৎসবের কারণ হইতে পারে—কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্যই বটে। চর্যাগীতির তত্ত্বও একদা যাহাই হউক, আজ রীতিমত ব্যাখ্যাগম্য। সুতরাং এদিক দিয়াও সহজ রসোপলব্ধির সম্ভাবনা অনেক কম।

(সুতরাং প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া ভাল, অন্তত আধুনিক কালে, চর্যাগীতিগুলির ঐতিহাসিক তথা ধর্মীয় ও দার্শনিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য যতখানি, সাহিত্যিক মূল্য ততখানি নহে।) তবে একেবারেই কিছু সাহিত্যিক মূল্য নাই একথাও বলা চলে না। চর্যাগীতিগুলি আধ্যাত্মিক সাধন-সঙ্গীত, সুতরাং ইহার কোন সর্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য থাকিতে পারে না, একথাও সর্বাংশে সত্য নহে। আধ্যাত্মিকতা সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান মাত্রের বর্ণনায় পর্যবসিত না হইলে মানুষের হৃদয়ের একটি আবেগ হিসাবে ইহারও কিছু সাহিত্যিক আবেদন থাকে। সেদিক দিয়া চর্যাপদেরও কিছু কিছু আবেদন থাকা স্বাভাবিক এবং আছেও।

[তত্ত্বের দিকে চর্যার দর্শন ও সাধন-পদ্ধতি গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত। বিষয়টি জটিল এবং তাহাকে গোপন করিবার চেষ্টারও অন্ত নাই। প্রাচীনতার জন্য দুর্বোধ্য এই ভাষা তত্ত্ব ও গুহ্যতার জন্য আরও দুরূহ হওয়ায় চর্যার কবিতাগুলির রসাস্বাদানে ব্যাঘাত ঘটে।] তবুও যেহেতু এই ধর্মের সাধকেরা

ছিলেন দীন দরিদ্র জনসাধারণ, তাই দুরূহতার চেষ্টা সত্ত্বেও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ইহাকেও সহজ করিতে হইয়াছে। তাছাড়া দার্শনিক ও ধর্মীয় স্বরূপে চর্যাগীতিগুলি সহজিয়া সাধনার অন্তর্গত। সাধনার ক্ষেত্রে এই সহজিয়াভাব রীতিমত সর্বজনীন। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—এই সহজিয়াভাব বাঙ্গালীর জন্মগত। সুতরাং বাঙ্গালীর একান্ত পরিচিত এই সাধনার ধারা বাঙ্গালীর মনে আজিও কিঞ্চিৎ আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে। যখন চর্যাকারেরা বলেন—

কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল তিল একু বাকু ণ ভুলহ রাজপথ কণ্টারা॥
মাআ মোহা সমুদাবে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভান্তি ন পুচ্ছসি নাহা॥

(কূল হইতে কূলে ঘুরিও না রে মূঢ়, সংসার সোজা পথ। মূর্খ, তিলেক বাঁকে ভুলিও না, রাজপথ কনকমণ্ডিত। মায়া মোহ সমুদ্রের অন্তও বুঝিস না—থইও পাস না , আগে নৌকা বা ভেলা দেখা যায় না, ভ্রান্তিবশে নাথ (গুরু)-কেও জিজ্ঞাসা করিস না)—সহজ বৈরাগ্যের এই কথার আবেদনও সহজ। সেইরূপ, কবি যখন বলেন 'অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ।'—তখন ইহার সহজ আবেদনে আমাদের অন্তর সাড়া না দিয়া পারে না।

আধ্যাত্মিকতা চর্যাগীতির উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে এমন অনেক রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে পাঠকচিত্তে যাহার আবেদন চিরকালীন রসের ভূমিতে। এরূপ কতকগুলি চিত্রে আমরা পাই তৎকালীন জীবনের কিছুকিছু পরিচয় যেমন—শিকারের চিত্র, নৌকা বাহিবার চিত্র, মদ্য-বিক্রয়শালার চিত্র ইত্যাদি। ইহাদের অনেকগুলিতেই স্বভাবোক্তির মাধ্যমে কিছুটা পরিমাণে রসের উদ্বোধন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় নদীপ্রবাহ ও নদীপার হইবার এই বর্ণনাটি—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামী লোঅ নিভর তরই॥ ইত্যাদি

অথবা

গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ॥
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।

* * *

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তে মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি॥ ইত্যাদি

কতকগুলি চিত্র আছে, যেগুলির সর্বজনীন সাহিত্যিক মূল্য ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও অস্বীকার করা চলে না। চিত্রসৌন্দর্যের দিক দিয়াও সেগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমনি উপভোগ্য সেগুলির মধ্যেকার পরিপূর্ণ সুখের আশায় উন্মুখ

চিত্তের গভীর আকুতি—

ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলী সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুঅঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥

শবর শবরীর মিলনের এই পরিপূর্ণ চিত্রটি সত্যই অনবদ্য। মিলনের পরিবেশ হিসাবে—বনভূমিতে বসন্তের আগমন; নানা তরুবর মুকুলিত হইয়াছে—ডালপালা আকাশের দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ময়ূরপুচ্ছ-পরিহিত, গ্রীবায় গুঞ্জামালাধারী, কর্ণকুণ্ডলে সজ্জিত শবরী একাকী বিচরণ করিতেছে। শবর শয্যা রচনা করিয়া প্রেমে রাত্রি অতিবাহিত করিল।—এ চিত্রের অন্তরালে আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই থাকুক না কেন বাহ্যিক দিকে এ চিত্রের সৌন্দর্য ও তাহার কাব্যরূপ পাঠককে মুগ্ধ করে। অনুরূপ আর একখানি চিত্র—

গগনচুম্বী গৃহ, সমস্ত চিন্তা-উদ্বেগ-নির্মুক্ত অবস্থায় [শূন্য-রূপ] নারীমহলে প্রিয়ার কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান; বাটির পাশে নীচে কার্পাস ফুল ফুটিয়াছে—আকাশ ভরিয়া ফুটিয়াছে তারা ফুল, অন্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইতেছে। মাঠে ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের ইঙ্গিত বহন করিয়া স্বর্ণশীর্ষে আন্দোলিত পাকা ধানের মঞ্জরী। শবর শবরীর আর কি চাই! আনন্দে মত্ত শবর শবরী অহদিন মহাসুখে বিভোর হইয়া আছে। (৫০ সং চর্যা)। এ চিত্রের কাব্যোৎকর্ষ উপেক্ষণীয় নহে।

বিষয়বস্তু যত আধ্যাত্মিকই হউক না কেন, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য যে সমস্ত রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমাদের জীবনের অতি পরিচিত বিভিন্ন জিনিসের। এরূপ রূপকল্প আছে যুদ্ধ-যাত্রার, বিবাহ-যাত্রার। এগুলি কোন পরিপূর্ণ রস সৃষ্টি করতে না পারিলেও—পাঠকের মনের মধ্যে একটি রম্যবোধকে জাগ্রত করে ও তাহার ফলে কিঞ্চিৎ আনন্দেরও সঞ্চার করে। এরূপ কতকগুলি চিত্রে আছে শৃঙ্গারের আভাস। এগুলি সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বি কমলরস পীবমি ॥

পদটির আকাঙ্ক্ষার বিষয় ও আবেগ পাঠকচিত্তে বেশ কিছুটা আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ সন্দেহ নাই। অনুরূপ আর একখানি চিত্রে প্রেম-নিবেদনের ভঙ্গিটিও বেশ আনন্দদায়ক—

নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাইসো বাহ্ম নাড়িআ ॥

আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥

*　　　*　　　*

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় এড্ডা ॥
তুলো ডোম্বী হাউ কপালী।
তোহোর অন্তর মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ (১০)

অন্তেবাসী এই ডোম্বী-যোগিনীর প্রেমলাভের জন্য কি গভীর আকাঙ্ক্ষা! তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকারও কম নহে—'ডোম্বী তোমার জন্য আমি নটসজ্জা ছাড়িলাম—তোমার জন্য আমি হাড়ের মালা পর্যন্ত গলায় পরিলাম—এখনও কি তোমার সহিত আমার সাঙ্গা হইবে না?' জানি না ডোম্বী এ আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল কি না—কিন্তু গভীর আবেগের সহিত এই আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারিত হইয়াছিল—তাহার সাহিত্যিক আবেদন আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

দুঃখ-বর্ণনার কাব্য-আবেদন সর্বাপেক্ষা বেশি। দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকেরা এ কথা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং এক বাক্যে উচ্চারণ করিয়াছেন 'সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহ'—কিম্বা—

Our sweetest songs are those
that tell of saddest thoughts.

চর্যাগীতির কবিরাও এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহাদের কাব্যেও তাই দুঃখের ছড়াছড়ি। কতকগুলি চিত্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিপূর্ণ দুঃখ ও অসঙ্গতির যে আভাস আছে তাহা পাঠকচিত্তেও অনুরূপ রসের উদ্বোধন করিয়া স্বতই কাব্যপর্যায়ে উন্নীত হইয়া যায়। এরূপ একখানি চিত্রে আছে, নির্দয় দস্যু কর্তৃক ঘরবাড়ি লুণ্ঠিত হইবার পর নিদারুণ অসহায় অবস্থার বর্ণনা। অন্য আর একখানি চিত্র আছে, দূরে টিলার উপর প্রতিবেশীহীন নির্জনে অবস্থিত একখানি ঘরের কথা। গৃহে নিত্যই অন্নাভাব তবুও অতিথি আবেশীর অন্ত নাই। সংসার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। হায়, দোহা দুধ কি বাঁটে ফিরিয়া যায়! সাংসারিক দুঃখের এই অভিঘাতে বুদ্ধির সমতা যায় নষ্ট হইয়া। তাইতো মনে হয়, গাভী হইল বন্ধ্যা, আর বলদ বৎস প্রসব করিল। পাত্র ভরিয়া তাহাকেই তিন সন্ধ্যা দোহন করা হয়। যে বোঝে সে-ই নির্বোধ, আর যে চোর সে-ই সাধু!—হাজার বছরের পুরাতন এই চিত্র—দুঃখানুভূতির তীব্রতায় তবুও ইহার আবেদন চিরনূতন।

দুঃখানুভূতির তীব্রতা আরও বেশি করিয়া লক্ষ্য করা যায় প্রথম পুত্রবতী দুঃখিনী এক নারীর উক্তিতে—

হাউ নিরাসী খমণ ভতারে।
মোহর বিগোআ কহণ ন জাই ॥

ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু চাহম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসনপুড।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপূড়া॥

নারীর দুঃখ প্রকাশের একমাত্র আশ্রয়স্থল মাতা। মাতাকে সম্বোধন করিয়া এই দুঃখপূর্ণ উক্তি; এ দুঃখও নারীজীবনের চরমতম দুঃখ। নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে—সেই মাতৃত্বই আজ দুঃখের আঘাতে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা নৈরাশ্য আর কি আছে! দুঃখের কথা আর কাহাকে বলিবে—বলিবেই বা কোন্ মুখে। স্বামী বিরাগী। বাসনার পুটলি এই প্রথম প্রসব—অথচ আঁতুড় নাই, যাহা চাওয়া যায় কিছুই নাই!—আধ্যাত্মিক অর্থ যাহাই হউক—নারী-জীবনের এই দুঃখানুভূতির তীব্রতাই কবিতাটির প্রাণ এবং কবিত্বের দিক দিয়াও তাই সমগ্র চর্যাপদে এই পদটির আসন অনেক উচ্চে।

গীতিগুলির মধ্যে কাব্য-আবেদন সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস যে রচয়িতাদের মধ্যে ছিল তাহার নির্ভুল ইঙ্গিত ইহাদের আঙ্গিক প্রকরণে সৌষ্ঠব-সাধনের চেষ্টায়। কবিতাগুলিতে ছন্দ এবং অলংকার-প্রয়োগ নিখুঁত নহে কিন্তু ছন্দ-অলংকারে সাজাইয়া এগুলিকে শ্রোতা-সাধারণের কাছে আরো বেশি মনোরম করিবার চেষ্টা কবিদের ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে তাঁহারা কিছুটা সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। বাচ্য শব্দে সমর্পিত হইলেই তাহা এক প্রকার সাধারণীকৃতি লাভ করে। শব্দাবলী যদি ছন্দে গাঁথা ও অলংকারে সজ্জিত হয় তবে সে দাবি আরো প্রবল হয়। ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের কুশলতায় চর্যার ভাষা সাধারণীকৃতির পূর্ণ সফলতা দাবি করিতে পারে না; কিন্তু স্থানবিশেষে যেটুকু মাধুর্য ইহা অর্জন করিয়াছে কাব্যপদবী বিচারে সেটুকুও স্বীকার্য।

কাব্য-ভাষার সার্থকতা বাক্ ও অর্থের অবিনা সংযোগে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা-সম্পদ বাগর্থের এই হর-গৌরী মিলনের মধ্যেই লক্ষণীয়। চর্যাগীতির কবিদের নিকট সেই নিখুঁত নৈপুণ্য প্রত্যাশিত নহে। তবুও তাঁহাদের কবিতায় কাব্যকলাবিধির এই মৌল রীতি-সচেতনতার নিদর্শন একেবারে বিরল নহে। ১৭ সং চর্যায় বীণার উৎপ্রেক্ষায় কবি যখন বলেন—

হালো সই বাজই হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

তখন চরণদুটির মধ্যে যে ধ্বনিঝংকার ফুটিয়া ওঠে তাহা বীণানিক্কণের ইঙ্গিতবহ। তেমনি রূপকল্পকে জীবন্ত করিবার জন্য বর্ণিত পরিবেশের উপযোগী শব্দচয়নের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় পূর্বোক্ত প্রসব-সম্পর্কিত গীতিটিতে গ্রাম্য রমণীদের মুখের উপযোগী 'ভতারে', 'বিআন' প্রভৃতি অশিষ্ট শব্দাবলীর প্রয়োগে। চর্যাগীতিতে এই জাতীয় ধ্বনিসুষমামণ্ডিত অর্থব্যঞ্জনায় সজীব শব্দচয়নের নিদর্শন বিরল

নহে। চর্যাগীতির সাহিত্যিক মূল্য বিচারে এগুলির অবদান উপেক্ষণীয় নহে।

চর্যাগীতি ও লোকসাহিত্য

চর্যাগীতির আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই এগুলিকে লোকগীতি বা লোকসাহিত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

এক হিসাবে সাহিত্য মাত্রই লোকসাহিত্য হইলেও প্রচলিত ধ্যানধারণায় মার্জিত উন্নত সাহিত্যসাধনার সঙ্গে লোকসাহিত্যের ব্যবধান স্বীকৃত। নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মৌখিক প্রচলিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। প্রাকৃত জনজীবনের বিভিন্ন দিক—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রেম, বিরহ, মিলন, মান-অভিমান, বিবাহাদি আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ, ব্রতকথা কাজকর্ম-জীবিকা, গুরুত্বপূর্ণ কোন বিশেষ ঘটনা ইত্যাদি জীবনচর্যার সবকিছুই—ছড়া, গীতি, গীতিকা (কাহিনীমূলক), ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, ইতিকথা (লিজেণ্ড) ইত্যাদির রূপ ধরিয়া যখন লোকমুখে লোকসমাজে প্রচারিত হয় তখনই তাহা লোকসাহিত্যরূপে চিহ্নিত হয়। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির কাছে লোকসঙ্গীত ও সাহিত্যের প্রকাশ ভঙ্গিতে কিছু দৈন্য ও স্থূলতা ধরা পড়িলেও জনজীবনের মর্মমূলে ইহার শিকড় প্রসারিত থাকায় ইহার মধ্যে একপ্রকার সহজ সবল আন্তরিকতার সুরও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত লোকসাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গিকে স্থূলতা বা দীনতা বলিয়া চিহ্নিত না করিয়া অমার্জিত সরলতা বলিয়া উল্লেখ করাই ভাল। ধর্মীয় সঙ্গীতকে সাধারণত লোকসঙ্গীতের গণ্ডীর বাহিরে গণ্য করা হয়, কারণ ইহাদের আবেদন সম্প্রদায়গত ও গুরুমুখী। তবুও সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক সর্বজনীনতা ও সহজ আবেদনের জন্য বাংলার বাউল, মুর্শীদ্যা, দেহতত্ত্বের গানগুলিকে লোকসঙ্গীতপর্যায়ে গ্রহণ করা হয়।

পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে চর্যাগীতি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিধাহীন মন্তব্য সহজ নহে। চর্যাগীতি সাম্প্রদায়িক ধর্মসঙ্গীত। গুরু-সম্প্রদায়গত দীক্ষিত জনের মধ্যে ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গীতিকারদের চেষ্টাও ছিল প্রভূত। সে চেষ্টার কথা তাঁহারা গোপনও করেন নাই। সুতরাং সাম্প্রদায়িক এই ধর্মসঙ্গীত আপাতবিচারে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। তবুও যে যুক্তিতে বাউল ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীতগুলিকে লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়—সেই দাবি চর্যাগীতি প্রসঙ্গে করা চলে কিনা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বাউল মুর্শীদ্যা ইত্যাদি সঙ্গীতগুলির উদ্ভব মধ্যযুগে ঘটিলেও আজও সেগুলি জনজীবনের ব্যাপক পরিধিতে বহুল প্রচারিত। এমনকি শিক্ষিত সমাজেও জন-

প্রিয়। চর্যাগীতির জীবনদর্শন ইত্যাদির উত্তরাধিকার বাঙ্গালী অস্বীকার করিতে পারে না, এমনকি কীর্তন-ধারার সঙ্গীতে ইহার অনুরণন স্বীকৃত হইলেও প্রত্যক্ষ সঙ্গীতরূপ হিসাবে চর্যাগান বাঙ্গালী সমাজের কোন স্তরেই আজ আর প্রচলিত নাই। তবুও এ অনুমান হয়ত ভ্রান্ত নহে, একদা চর্যাগীতি সমাজে জনপ্রিয় মর্যাদায় বহুল প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গীতরস উপভোগের জন্য অদীক্ষিত জনসাধারণও চর্যাগীতি আস্বাদন কবিতেন। চর্যাগীতির এই জনপ্রিয়তাই পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রগুলির মধ্যে ইহার উল্লেখ ও বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের প্রেবণা। সুতরাং আজ চর্যাগীতি লিখিতরূপে আমাদেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেও একদা চর্যাগীতিগুলি লোকমুখে প্রচলিত ও জনপ্রিয় সঙ্গীত-রীতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। অবশ্য প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ রাখা উচিত, জনপ্রিয়তার জন্য চর্যাগীত-রীতি পববর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হইলেও—সেখানে কিন্তু লোক-গীতি পর্যাযে ইহা গৃহীত হয নাই। সঙ্গীতশাস্ত্রের উল্লেখ এবং গীতিগুলির উপর রাগ-রাগিণীর নির্দেশ চর্যাগীতিগুলিব, কিঞ্চিৎ শিথিলবদ্ধ হইলেও, উচ্চাঙ্গ মার্গ-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্তির দাবিই সমর্থন করে।

চর্যাগীতিগুলির বিষযবস্তু সম্প্রদাযগত ধর্মতত্ত্ব: কিন্তু ধর্মের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সহজিযা। আচার-অনুষ্ঠান-বাহুল্য ও সাধন-প্রণালীর জটিলতার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব ইত্যাদি সহজিযা দৃষ্টিভঙ্গিব সব বৈশিষ্ট্যই চর্যার ধর্মমতে লক্ষণীয়। সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই সম্ভবত একটি সর্বজনীনতা বিদ্যমান। ইহার সহজ-গ্রাহ্যতা ইহাকে লোকজীবনেব কাছাকাছি টানিযা আনে; কিম্বা বলা যায় লোকজীবনের জটিলতামুক্ত সহজ সরলতার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার রোহভূমিতেই সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব। সুতরাং আজ অবলুপ্ত হইলেও চর্যাগান যখন প্রচলিত ছিল তখন তাহা লোকসমাজে জনপ্রিয় ছিল তাহা অনুমেয়।

চর্যার দর্শন খুব নিম্ন মার্গের নহে। চর্যাকারেরা যে অপণ্ডিত ছিলেন এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবুও মাযাবাদী, বিজ্ঞানবাদী বা শূন্যবাদী যে নামেই চর্যার দার্শনিকতাকে অভিহিত করা হউক, লক্ষণীয় এই, যুক্তিপূর্ণ দার্শনিকতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চর্যাগীতিতে খুব বেশি নাই। এখানেও চর্যাগীতির সহিত জনসাধারণের জীবন-সংযোগের সূত্রটি পরিলক্ষ্য। বস্তুত মাযাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চর্যায় যাহা প্রকাশিত তাহা মূলত সহজিয়া, লোকায়ত। দুঃখ-দুর্দশার দিনে মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা বৈরাগ্য, জগৎসংসারের অর্থহীনতা সম্পর্কে একটি দার্শনিক-সুলভ বিষণ্ণ চেতনা। আত্মোপলব্ধি বা পারমার্থিক সত্য লাভের ছদ্ম আবরণের আড়ালে ইহাকে ঊর্ধ্বায়িত করিবার প্রযাস থাকিলেও উৎসমূলের দারিদ্র্য ও দুঃখভোগের ইঙ্গিত একেবারে গোপন করা সম্ভব নহে। চর্যাগীতির দার্শনিকতা বিচার করিতে বসিয়া বৌদ্ধ দর্শনের কোন্ ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে ইহার ক্রমবিকাশ অথবা উপনিষদ বেদান্ত

ইত্যাদি কোন্ কোন্ মতবাদের দ্বারা ইহা প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট তাহা বিশ্লেষণ করা গেলেও—সেই দার্শনিকতাকে যে জনসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে সহজ সরল রূপকের মাধ্যমে, জনজীবনে পরিচিত একান্ত অন্তরঙ্গ লোকায়ত চিত্রকল্পের সাহায্যে রূপায়িত করা হইয়াছে—ইহাও চোখে না পড়িয়া পারে না। সুতরাং দার্শনিকতার ভিত্তিতে চর্যাগীতিগুলিকে মার্জিত শিক্ষিত উচ্চস্তরের জন-জীবনের সাহিত্য বলিয়া নিরঙ্কুশ ভাবে দাবি করা চলে না।

চর্যাগীতিগুলি কিভাবে কাহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল, ইহার গায়েন রীতিই বা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে নির্ভুল কোন ইতিহাস আজ আর অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় নাই। কিন্তু নিম্নস্তরের জনজীবনের সহিত ইহার সংযোগ এবং দরিদ্র নিম্নবিত্ত জনসাধারণের দারিদ্র্য-দুঃখপীড়িত জীবনচিত্রের প্রতিফলন চর্যাগীতির সর্বাঙ্গে। চর্যাগীতি যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন সেই সমস্ত সিদ্ধাচার্য মহাজনেরা অনেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এমনকি রাজবংশোদ্ভবও ছিলেন। হয়ত কেহ কেহ শূদ্রও ছিলেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু চর্যার মধ্যে যে সমাজজীবনের প্রতিফলন হইয়াছে তাহা অন্ত্যজ শ্রেণীর। কদাচিৎ দুই-একটি চিত্রে যুদ্ধযাত্রা, দেশজয় ইত্যাদি রাজকীয় কথা আছে, কিন্তু তাহা যে ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু নীচ অন্ত্যজ শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দরিদ্র জীবনের বেদনাপূর্ণ চিত্ররূপ, শুঁড়ির দোকানে মদ্যপান, হাতী ও হরিণ শিকার, তাঁত বোনা, তুলো ধুনা, নৌকা বাওয়া, ঝুড়ি-চাঙ্গাড়ি বিক্রয় করা, অথবা ভ্রাম্যমাণ নটবৃত্তি ইত্যাদি জীবিকা, জীবনের সর্বাঙ্গীণ দুঃখদুর্দশার ইঙ্গিত চর্যাগীতির ছত্রে ছত্রে পরিকীর্ণ। সুতরাং এ অনুমান মিথ্যা নহে, চর্যাগীতির রচনাকারেরা যাহাই হউন, যাঁহাদের জীবনচর্যা লইয়া ও যাঁহাদের উদ্দেশ্যে চর্যাগীতি রচিত হইয়াছিল এবং যাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল তাঁহারা ছিলেন 'জনসাধারণ'।

লাক্ষণিক বিচারে চর্যাগীতির লোকসাহিত্যের দাবি দ্বিধাহীন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা চলে না। চর্যাগীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি যেগুলি ইহার লোকসাহিত্য-পদবীর পরিপন্থী। তবুও একদা এই সঙ্গীতগুলি জনজীবনের পটভূমিকাতে ও তাহার সহিত অন্তরঙ্গ সংযোগে রচিত হইয়াছিল এবং লোক-সমাজে জনপ্রিয় ছিল,—এই যুক্তিতে এগুলিকে লোকসাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া দাবি করাও একান্ত অযৌক্তিক নহে। প্রায় সমকালে রচিত মার্জিত ও শিক্ষিত রুচিসম্মত জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিত তুলনামূলক বিচার করিলে পূর্বোক্ত দাবি সমর্থন করা চলে। অবশ্য জয়দেবের গীতগোবিন্দও নাকি পূর্বে লৌকিকরূপে লৌকিক ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় মার্জিত রূপ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সে বিচার স্বতন্ত্র।

৯. চর্যাগীতির উত্তরাধিকার

ইতিহাসের ধারা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলে। কালের সংঘাতে তাহার অনেক উপাদান হয়তো লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়, হয়তো কিছু কিছু একেবারে স্মৃতিমাত্রও না রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়— তবুও একথা মনে করিবার কারণ নাই যে ইতিহাস কয়েকটি মাত্র আকস্মিক ঘটনার সমাবেশ। সমস্ত ইতিহাস যেমন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসও তেমনি সমাজ ও যুগের প্রভাবে প্রভাবিত বাঙ্গালী মানসের ধারাবাহিক বিবর্তনের স্বাক্ষর-সমন্বিত বিচিত্র সৃজনী প্রতিভার ইতিহাস। উপাদানের অভাবে অনেক সময়ই আমরা ইহার সম্পর্কে খণ্ডিত ধারণা পোষণ করিয়াছি, কিন্তু বস্তুত ইহা খণ্ডিত নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের পুথিখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা এই সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাচীনতম রূপটির কল্পনাও করিতে পারিতাম না। আজ সে উপাদানের অভাব দূরীভূত হইয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের প্রত্যেকটি স্তরের কিছু-না-কিছু উপাদান সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি—এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারাবাহিকতাও আজ আমরা অনুসরণ করিতে পারি।

কিন্তু শুধু এটুকুই কর্তব্য নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, একটি স্তর হইতে আর একটি স্তরে বিবর্তনের ধারাটি কি? প্রাচীন স্তর অর্বাচীন স্তরের উপর কি কি প্রভাব রাখিয়া গেল, আধুনিক স্তরই বা কোন্ কোন্ স্বকীয় উপাদান লইয়া পূর্ববর্তী স্তর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল। সমাজবিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা সাহিত্যের এই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আজও সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। হওয়া সহজও নহে। কিন্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ধারাবাহিকতার আলোচনা হয় নাই বলিয়া প্রাচীন কালের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের মনে অনেক সময়ই অনেক বিচিত্র ধারণা দেখা দিয়াছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের অনেকের ধারণা আছে—চর্যাগীতিগুলি প্রাচীন বাঙলার একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত মাত্র, ইহার না আছে কিছু সাহিত্যিক মূল্য না আছে কিছু ধারাবাহিকতা। ˙ত্ত্বের দিকে অনেক মনীষী আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে চর্যাগীতিগুলির মধ্যেকার সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধনা—বিবর্তনের ধারায় সহজিয়া বৈষ্ণব, নাথসম্প্রদায়, আউল, বাউল ইত্যাদি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কথাটির গুরুত্ব নিতান্ত কম নহে। যে সাধনাকে আমরা দোহা ও চর্যাগীতিতে আরম্ভ ও শেষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম তাহারই প্রচ্ছন্ন ধারা সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙলার বাউল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, এ তত্ত্বের মূল্য বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিবার বিষয়ই বটে। কিন্তু আমার মনে হয় তত্ত্বটির মূল্য আরও অধিক। যখন হইতে বাঙালী বাঙলা ভাষা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে যে দোহা ও চর্যাগুলি বাঙ্গালীর সাধনার সূত্রপাতে অবস্থিত ছিল

—তাহা নিতান্তই আকস্মিকভাবে—আরও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার প্রভাবকে আরও কয়েকটি সাধনার মধ্য দিয়া ক্ষীণ ধারায় প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—শুধু এই পর্যন্ত জানিলেই চলিবে না। এ কথা বলিলে বিস্ময়কর শোনায় বটে, কিন্তু কথাটি সত্য যে বাঙালীর জীবনধারার সূত্রপাতের ঐ চর্যাগুলি ধারাবাহিক বাঙালীজীবনচর্যারও স্বাক্ষর বহন করে। ঐ গীতিগুলির মধ্যেই বাঙালী জীবনের মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। যুগে যুগে রং পাল্টাইয়া ঐ সাধনা, ঐ জীবন-বোধই বাঙ্গালী চৈতন্যে বিরাজ করিযাছে ও বাঙ্গালীয়ানার নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

চর্যাগীতিগুলির ধর্ম ও দার্শনিকতা আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা যাহা লক্ষ্য করিযাছি—তাহার মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিলে দাঁড়ায় যে, (ক) ইহার দার্শনিকতার মূলে যদিও বিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম তবুও সমন্বয়ই ইহার মূল সুর। বিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের কাঠামোর উপর বেদান্ত, যোগ ও তন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন সাধনার ধারা মিলিত হইয়া চর্যাগীতির দার্শনিক পটভূমিটি রচনা করিয়াছে। (খ) যে কারণেই হউক চর্যাগীতিকবিদের জীবন সম্পর্কে একটি ঔদাসীন্যের ভাব আছে। এ ঔদাসীন্য ঠিক পরিপূর্ণ বৈরাগ্যের ঔদাসীন্য নহে, এ ঔদাসীন্য যেন কবিত্ব-মিশ্রিত ঔদাসীন্য। জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ-মাধুর্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে তবুও যেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।' (গ) সাধনার ধারায় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য নাই, বরং আছে আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ। প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী মনোভাবই তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে 'সহজ সাধনার' পথে। এই সহজ সাধনাই চর্যার সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। (ঘ) সহজ সাধনার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই দেখা দেয—মানবতন্ত্র। তত্ত্বের দিকে সহজ সাধনা যে বলে—মানুষের দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড—তাহাই সাধকের দৃষ্টিতে মানুষের গৌরবকে বাড়াইয়া তোলে। মানবতন্ত্র তাই সহজ সাধনার অনুষঙ্গী। ভারতীয় পটভূমিতে বাঙ্গালীর জীবন ও সাধনাকে বিশ্লেষণ করিলে, আমার মনে হয, পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্য এবং সূত্রগুলি স্পষ্টভাবেই যুগে যুগে প্রবাহিত হইতে দেখা যাইবে। অবশ্য বাহিরের নানা প্রভাব ইহার রং অনেক পাল্টাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ধারাবাহিকতার সূত্রটিও দুর্লক্ষ্য নহে।

বাঙ্গালীর জীবনে ও সাধনায় সমন্বয়ের সুরটিই, মনে হয়, প্রধান সুর। আর্যপূর্ব বাঙলা দেশ কোন একটি বিশিষ্ট জাতির বাসভূমি ছিল না। একাধিক অনার্য জাতি এখানে বাস করিত। পরে তাহার সহিত মিশিয়াছে আর্যরক্ত। আধুনিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর দেহে কোন বিশিষ্ট জাতির বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত নাই। বাঙ্গালীর দেহগঠনে আছে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়। দেহে যেমন, বাঙ্গালীর মনেও তেমনি এই

বিচিত্রের সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থের মধ্যে ভারতবর্ষের যে সমন্বয়ের গীতি গাহিয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া সত্য বাঙলা দেশে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে দুঃখ করিয়া 'বাঙলা সকলের' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন দুঃখ না করিয়াও বাঙ্গালীর মনোজীবন সম্পর্কে সে কথা বলা চলে। বস্তুত বাঙ্গালীর এমন একটিও সাধনা নাই যেখানে 'সমন্বয়' প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাঙ্গালীর সাধনায় বৈষ্ণব-শাক্ত-বেদ-তন্ত্র সর্বদাই একাকার। অদ্বৈতবাদী বেদান্তের আনন্দভাবনাই বৈষ্ণব সাধনার মূলে। এই অদ্বৈতবাদী আনন্দ-ভাবনা বৈষ্ণব তন্ত্রে আসিয়া সমন্বয়ের প্রভাবে হইল 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'। দ্বৈতবাদী শাক্তেরা অদ্বৈতবাদের প্রভাবে পড়িয়া নির্বিঘ্নে বলিয়া বসিলেন তারা আমার নিরাকারা'। সাকার শক্তি নিরাকার পরমব্রহ্ম-র সহিত একাকার হইয়া গেলেন। মাধুর্যের উপাসক বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপটিকেও বাদ দিতে পারেন না। আবার ঐশ্বর্যের সাধক শাক্তেরা মায়ের মাধুর্যমিশ্রা রূপটিকে যেন রসাইয়া রসাইয়া রূপ দিয়া তোলেন। সাধনার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের ধারাটি একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদির Neo-Hinduism বা Revivalism আন্দোলনের ভিত্তিই এই সমন্বয়ে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে বাঙালীর সাহিত্য, শুধু বিষয় বস্তুতেই নহে—রূপকল্পে, form-এও। এই সমন্বয়ের চরম প্রমাণ রবীন্দ্র-সাহিত্য। দেশি-বিদেশি সকল সুরের সঙ্গমতীর্থ রবীন্দ্র-ভারতী। এমন কি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যসাধনায়ও সেই সমন্বয়ের ধারাটি সমানে অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। ইহার মূল কারণই বাঙ্গালীর জীবনচর্যার মূল সূত্র 'দিবে আর নিবে, মিলিবে, মিলাবে যাবে না ফিরে'।

বাঙ্গালীর সাধনা রূপে সমন্বয়ী, স্বরূপে তাহা 'সহজ'। এই সহজ সাধনা একমাত্র বাঙ্গালীরই একান্ত নিজস্ব নহে। তবুও একথাটি সত্য যে, সহজ সাধনা বাঙ্গালীজীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভারতীয় অন্য কোন প্রদেশে তাহা সেরূপ পারে নাই। কবীর, দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের সাধনার স্বরূপটিও *'সহজ' সন্দেহ নাই*। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই যে, তাহার উপর বাঙ্গালীর প্রভাব ছিল না। অন্তত সময়ের দিক দিয়া তাঁহারা চর্যাপদের পরের যুগের। সুতরাং অসম্ভব নহে যে তাঁহাদের উপর বাঙ্গালী জীবনচর্যার প্রভাব কিছু থাকিবে। কিন্তু সে আলোচনা থাক। আপাতত আমরা লক্ষ্য করিব বাঙ্গালীর এই সহজ সাধনার বিবর্তন। বাঙলার প্রকৃতির মধ্যেই এমন উপাদান আছে যাহা বাঙালীকে উদাস করিয়া তোলে – অথচ ইহার প্রাণমাতানো সৌন্দর্যকে একেবারে পরিত্যাগও করা চলে না। বাঙ্গালীর বৈরাগ্য ও সৌন্দর্য-ধনা তাই একত্রেই চলে। সহজ সাধনার মূলেও এই মনোভাব। জীবনের

রূপ রস আনন্দ গন্ধের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া জীবননাথের অনুসন্ধান। জীবনের সহজ বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া বিকৃতির পথে নহে—সেই বৃত্তিগুলির প্রকাশের মধ্যেই সাধনা। নিরঙ্কুশ উপভোগ ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, —উপলব্ধিই চরম। সহজ সাধনার দার্শনিক ভিত্তিটি সাধারণত হয় মায়াবাদী; তবুও বেদান্তের মাযাবাদ বলিতে ঠিক যাহা বোঝায়- ইহাদের মায়াবাদের উগ্রতা তত নহে। ইহারা জগৎকে মিথ্যা বলে বটে, তাহা জগতের রূপ হইতে স্বরূপের দিকে দৃষ্টিকে পরিচালিত করিবার জন্য। 'আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাসিত হইতেছে' একথাও যাঁহাদের উক্তি, 'নানা তরুবর মুকুলিত হইল, গগনেতে ডাল লাগিল' বলিযা, আধ্যাত্মিক অর্থে হইলেও, এই জাগতিক সৌন্দর্যের চিত্রও তাঁহারাই অঙ্কন করেন। জগতের তত্ত্বজ্ঞান দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান (দুলক্‌খ বিণাণা) সুতরাং তাঁহাদের নিদেশ—'অনুভব সহজ মা ভোল রে জোঈ'। তন্ত্রের দিকে এই সহজসাধনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক দেহতত্ত্ব ইত্যাদি—বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ধর্মমত ও সাধনপদ্ধতি অধ্যায়ে ৫ম অনুচ্ছেদে বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার ধারার ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, বাউল, নাথপন্থী ইত্যাদির মূল দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধন পদ্ধতিও যে বৌদ্ধ সহজিয়াদের যুগোপযোগী বিবর্তন-প্রসূত একথার উল্লেখ করিয়াছি।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বৈষ্ণব সহজিযাদের সাধনার সমস্ত দিকই বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনার সহিত অভিন্ন—কেবলমাত্র প্রেমের রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব সহজিয়াদের অভিনবত্ব। কিন্তু আমার মনে হয় এই দিকেও বৈষ্ণব সহজিয়ারা যে একেবারে স্বতন্ত্র বা কেবলমাত্র বৈষ্ণব ধারার প্রভাবে প্রভাবিত তাহাই নহে; এখানেও চর্যাগীতির প্রভাব আছে। চর্যাগীতিতে প্রেম নাই একথা ঠিক। কিন্তু প্রেমের প্রত্যক্ষ পূর্বাভাস আছে। চর্যাগীতির অর্থাৎ সহজিয়া বৌদ্ধদের মহাসুখ পরিকল্পনা একদিকে যেমন বুদ্ধদেবের 'নির্বাণের' দুঃখনিবৃত্তি ধারণা ও বেদান্তের আনন্দবাদের সমন্বয়, অন্যদিকে তেমনি তন্ত্রের প্রভাবে ইহাই আবার পুরুষ-প্রকৃতির মিলন মহারসের উপলব্ধি। এই মহাসুখ পরিকল্পনার মধ্যেই আছে সহজসাধনার প্রেমের বীজ। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা বা প্রাধান্য না থাকিলেও সহজসুন্দরীকে লইয়া প্রেমের কয়েকখানি মনোরম চিত্র চর্যাগীতিতে আছে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে ইহা ছাড়াও আছে মূল বৈষ্ণব ধর্ম ও প্রেমতত্ত্বের প্রভাব; কিন্তু বীজাকারে প্রেমের অস্তিত্ব চর্যাগীতিতেও ছিল এবং তাহার প্রভাবও স্বীকার্য।

প্রেমের এ অস্তিত্ব না থাকিয়াও পারে না। যেখানে মানুষের দেহের মধ্যেই সকল তত্ত্ব নিহিত বলা হইতেছে, যেখানে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, সাধনপদ্ধতিতে যেখানে দুইকে অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার

করিয়া লওয়া হইতেছে সেখানে যে আকারেই হউক প্রেমের অস্তিত্ব থাকিতে বাধ্য। নানা কারণে চর্যাগীতিতে এই প্রেম প্রচ্ছন্ন, বৈষ্ণব সহজিয়া সঙ্গীতে তাহা প্রত্যক্ষ।

বাউলসঙ্গীতগুলিতে এই প্রেমই আবার অন্য আর একটি বিশিষ্ট মূর্তি ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। এখানে প্রেম অন্য কোন বাহ্য শক্তি বা প্রকৃতির সহিত নহে, তাহা নিজের মনের মানুষেরই সহিত। এই 'মনের মানুষ' পরিকল্পনা বাউলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানেও কিন্তু চর্যাগীতি ও দোহাকোষের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নহে। দোহা ও চর্যাগুলির মধ্যে দেহ-প্রাধান্যের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, সহজকে তাঁহারা দেহের মধ্যে কল্পনা করিতে যাইয়া এক নৈর্ব্যক্তিক পুরুষের কল্পনার পূর্বাভাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন —

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণই।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই॥

অথবা
ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

ইত্যাদি দোহাগুলিতে দেহ-ঘরে যে বুদ্ধের অবস্থিতি কল্পনা করা হইয়াছে তাহার সহিত বাউলের 'মনের মধ্যে মনের মানুষের' কল্পনার যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। 'আছে এক মনের মানুষ পরম পুরুষ দেহের মাঝে বিরাজ করে' বাউলের এই গান,

অথবা
'দেহের মধ্যে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়,
তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো।
তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে
দেহের মধ্যে আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়।'

এইরূপ আরও বহু গানে মনের মানুষের যে কল্পনা আছে তাহা মূল সহজ সাধনা ও প্রেমভাবনারই এক বিশেষ বিকাশ।

এই ধারার শেষ কিন্তু এইখানেই নয়। বাউলদের এই ধারা রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বহু আলোচনায় তাঁহার উপর বাউল প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়াছেন। হারামণি ১ম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—"আমার লেখা যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি আমার লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সদা-সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে।" এই 'সহজভাবে বিঁধে গেছে' কথাটা একান্তভাবে সত্য। 'Religion of Man' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যখন তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সহিত নিজের অন্তরের আধ্যাত্মিক চিন্তার মিলন ঘটাইতে

পারিতেছিলেন না। তখন এই বাউলদের 'মনের মানুষ' পরিকল্পনাই পথের সন্ধান দিয়াছে। পূর্ব হইতেই তিনি 'অন্তরতর যদযমাত্মা' এই বাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন। বাউলদের মুখেব 'মনেব মানুষ' ও পবম পুরুষকে তিনি এক করিয়া লইলেন এবং তাঁহার কাব্য-সঙ্গীতেও তাহাকে রূপ দিলেন বারবার—

ওহে অন্তবতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তবে মম।

এই অন্তবতম ও মনের মানুষে সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। এই সাদৃশ্য আরো স্পষ্ট করিযা লক্ষ্য কবা যায কতকগুলি গানে যেগুলি রবীন্দ্রনাথেব ভাষায "ববীন্দ্র বাউলেব বচনা"—

আমি তাবেই খুঁজে বেড়াই যে রয মনে আমাব মনে।
সে আছে ব'লে
আমাব আকাশ জুড়ে ফোটে তাবা বাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয বনে আমাব বনে॥
সে আছে বলে চোখেব তারার আলোয
এত রূপের খেলা রঙেব মেলা অসীম সাদায কালোয।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমাব অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায দখিন সমীবণে॥ ইত্যাদি।
অথবা, আমি কান পেতে বই আমাব আপন হৃদয গহন দ্বাবে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথা হয বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি রে
কোন্ বাতের পাখি গায একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকাবে॥
'ক সে আমার কেই বা জানে, কিছু বা তার দেখি আভা।
কিছু বা পাই অনুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায পায কী কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায বাণী গানের তানে লুকিযে তারে॥

অনুরূপ অসংখ্য সঙ্গীতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের রচনায সহজেই মেলে।

বাঙ্গালীর সাধনায় আর একটি চিরবৈশিষ্ট্য মানব মাহাত্ম্যের উপলব্ধি। মানুষ ও মাটিকে পরিত্যাগ করিযা, জগৎ জীবনকে অতিক্রম করিযা যে সাধনা বাংলার মাটিতে তাহা কোনকালেই বিশেষ প্রশ্রয় পায় নাই। এইজন্যই শুদ্ধজ্ঞান অপেক্ষা কর্ম ও ভক্তির পথ চিরকালই বাংলাদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ন্যায়ের চর্চা বাংলাদেশে প্রচুর হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা তান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ও বৈষ্ণব প্রেমের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালীজীবনে এই কর্ম ও ভক্তির প্রাধান্যের কারণ বাঙালী মানুষকে চিরকাল বড় করিয়া দেখিয়াছে।

এই মানুষকে বড় করিয়া দেখা একদিকে যেমন আনিয়াছে 'সহজ সাধনা'র ধারা, অন্যদিকে তাহারই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আসিয়াছে মানবিকতার মূল্যবোধ। বৌদ্ধসহজিয়ারা তন্ত্র ও যোগ হইতে এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন যে, বিশ্বের সকল তত্ত্ব আছে মানুষের দেহভাণ্ডে; এই দেহতত্ত্বই জন্ম দিয়াছে বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'মানব তন্ত্র'। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

শুদ্ধমাত্র তান্ত্রিক অর্থেই সত্য নহে, বাস্তব মানবিকতার অর্থেও সত্য। কথাটি শুনিতে একটু বিস্ময়কর বলিযাই মনে হয। সমগ্র প্রাগাধুনিক যুগ ধরিয়া বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, মানুষকে দেবতার হাতের ক্রীড়নক করিযা দেবতার মহিমা প্রচারের চেষ্টা। সেখানে মানবমাহাত্ম্যের এই উক্তি কি করিযা সম্ভব! কিন্তু কথাটি সত্য। মধ্যযুগে দেবপ্রাধান্য স্বাভাবিক এবং মানবতন্ত্র বা মানবিকতা বলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয দৃষ্টিভঙ্গির সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে যে ধারণা আমরা লাভ করিয়াছি ঠিক সেই অর্থে মানবিকতাকে আমরা মধ্যযুগে কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু যেটুকু আছে তাহাই বিস্ময়ের এবং তাহার সূত্রপাত বাঙলা সাহিত্যের আদিযুগ হইতে। বৌদ্ধ সহজিয়ারা মানুষের মধ্যেই সমস্ত তত্ত্ব, এই কথা বলিয়া মানুষকে যেটুকু মহিমা দিলেন তাহাই আর একটু বৃহত্তর সার্থকতায ভরিযা উঠিল সহজিযা বৈষ্ণবদের হাতে। অতি ক্ষীণ হইলেও এই মহিমাবোধের ধারা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা প্রবাহিত হইযাছে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্য দিযা। এই মঙ্গলকাব্যগুলি স্পষ্টত দেব-মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত। তবুও কিন্তু ইহার মধ্যে একমাত্র চাঁদসদাগরের চরিত্র উল্লেখ করিয়াই বলা চলে যে মানুষকে বড় করিবার দৃষ্টি চিরকালই কবিদের ছিল, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই কেবল ভযে। চাঁদ যেন কোন ব্যক্তি-চরিত্র নহে, চাঁদ যেন দেবতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের যুগসঞ্চিত বিদ্রোহের বাণীর প্রতীক। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চাঁদকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে পরাজয়ও দেবতার ভয়ে নহে, স্নেহের নিকট। এই পরাজয়ও এক হিসাবে মানব-মাহাত্ম্যই ঘোষণা করিতেছে। চাঁদ প্রস্তরে গঠিত একটি আদর্শবাদী সত্তা নহেন। তিনি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, তাই স্নেহের কাছে তাঁহার পরাজয় স্বাভাবিক।

মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি বিরাট শাখা বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর দার্শনিক পটভূমি অনস্বীকার্য। রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে সেখানে প্রেমে আধ্যাত্মিকতাও আছে। তবুও বিখ্যাত 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতাটিতে

রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাহাকেই উত্তর ধরিয়া আমরা বলিতে পারি—রাধাকৃষ্ণ প্রতীকের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিরা মানুষের প্রেমকেই রূপ দিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে একটি আধ্যাত্মিক প্রেরণা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও মানবিক চেতনায় তো কোন বিরোধ নাই। প্রেমের ক্ষেত্রে থাকেও না। প্রেম মানুষের মনের এমনই একটি বৃত্তি—যেখানে দেবে মানবে একাকার হইয়া যায়। 'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা'। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের অসীমতা মানবিক প্রেমেরই উদ্‌গতি বা Sublimation এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চিত্রের নামে দীন মর্ত্যবাসীর প্রেমচ্ছবি, তাহাদেরই চিত্ত দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার চিত্রই অঙ্কন করা হইয়াছে, একথা বলিলে খুব অত্যুক্তি হয় না।

মধ্যযুগের শাক্ত পদাবলীতেও এই মানুষের ছবি। সেখানেও মাতা ও কন্যা। সেখানেও বাঙ্গালী কন্যার গৌরীদানের চিত্র, সেখানে অল্পবয়স্কা মূঢ় বালিকার পতিগৃহে যাত্রা, বৎসরান্তে তিনটি দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন এবং আবার শোকের উদ্বেলতার মধ্যে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন—একেবারে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের নিখুঁত চিত্র। মেনকা ও গৌরী শুধু ছলনা, উদ্দিষ্ট সেখানে আমাদেরই ঘরের অতি পরিচিত স্নেহ-নির্ঝর মাতা ও কন্যা। এমন কি শাক্ত পদাবলীর যে কবিতাগুলি আগমনী-বিজয়ার নহে তাহাতেও ভক্ত ও মাতায় যে লীলা তাহাও নিতান্তই পার্থিব বাৎসল্যের লীলা। আর যেখানে তত্ত্বকথা, সেখানেও আছে—

মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব-জমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

কৃষিকাজ, নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক কর্ষণ, কিন্তু ক্ষেত্রটি সেই মানব-জমিন্। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মানুষেরই কথা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই যেটুকু মানবমাহাত্ম্যবোধ আছে তাহাই বিস্ময়ের এবং পূর্বেই বলিয়াছি তাহাই বাঙ্গালীর মজ্জাগত। নানা কারণে হয়ত সর্বদা ইহা সমানভাবে স্ফুরিত হইতে পারে নাই, কিন্তু কেবলমাত্র চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের উক্তি দুইটিকেই উল্লেখ করিয়া বলা চলে প্রাগাধুনিক যুগের বাঙ্গালীর মানবিকতাবোধকে প্রমাণ করিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট দলিল।

আমাদের ধারণা আছে উনবিংশ শতাব্দীতেই আমরা প্রথম মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হইলাম এবং তাহা সম্ভব হইল ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতার সংস্পর্শে। কথাটা আংশিক সত্য। আমাদের মানবিকতাবোধ সম্পূর্ণ হইল উনবিংশ শতাব্দীতে; ইহার উন্মেষ ঘটিয়াছিল বাঙ্গালী জীবনের জন্মলগ্নে। এই বিবর্তনেরই একটি বিশেষ স্তর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ সম্পর্কে আলোচনা করিবার অবসর এখানে নাই। সুধী পাঠকের নিকট তাহার প্রয়োজনও নাই। শুধু কেবল এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র আধুনিক

সভ্যতার বা শিক্ষার পরিণত ফল হিসাবে যাঁহারা ভাবেন তাহারা একদেশদর্শী। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রায় প্রতিটি স্তরে আছে প্রাচীন ও নবীনের সমান প্রভাব; তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবিকতার মূল্যবোধ বিশ্লেষণে, চর্যাগীতির সূত্রপাতে যে মানবিকতাবোধের জন্ম, সেই ধারার অনুবর্তনকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

বাঙ্গালীর জীবন-চর্যা ও সাহিত্য সাধনার অন্তরঙ্গে (Content-এ আমরা এতক্ষণ চর্যাগীতির ধারার অনুবর্তন লক্ষ্য করিলাম। অবশ্য আমার বক্তব্য এই নহে যে, চর্যাগীতির মধ্যে যে বস্তু আমরা পাইয়াছি যুগ যুগ ধরিরা তাহাই ভাঙ্গাইয়া খাইতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালীর জীবনসাধনা তথা সাহিত্য-সাধনার কয়েকটি মূল বস্তু যাহা আমরা চর্যাগীতির মধ্যে লাভ করিয়াছি তাহাই যুগে যুগে কিছু কিছু রঙ পাল্টাইয়া, মাঝে মাঝে অন্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া, এবং মাঝে মাঝে ক্ষীণ ও প্রচ্ছন্ন হইলেও, অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহিত। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক রূপ-কর্মের বহিরঙ্গের মধ্যেও এই অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। পদাকারে মুক্তক বা খণ্ড কবিতা রচনা করা বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, সবই এই পদাকারে সাহিত্য-সাধনা। এমন কি বৃহৎ আকার মঙ্গলকাব্যগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে পদাকারে কাব্য রচনার চেষ্টা আছে। এই পদাকারে কাব্য রচনার প্রথম বাংলা প্রমাণ চর্যাপদগুলির মধ্যে আছে। 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' স্রষ্টা জয়দেব চর্যাগীতির পরের আমলের, সুতরাং গৌরব জয়দেবের নয়, গৌরব চর্যাকারদেরই প্রাপ্য।

এই পদগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য, ঠিক বহিরঙ্গে নয়, অন্তরঙ্গে ইহার গীতি-কবিতার সুর। এখানে আকার ও প্রকারে মাখামাখি, কারণ আকারে সংক্ষিপ্ত না হইলে গীতি-কবিতা রচনা সম্ভব নয়। পরম সুখের বিষয় বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মূল সুর এই গীতি-সুর বা Lyricism-এর সূত্রপাত চর্যাগীতিগুলিতে। অন্যদিকে চর্যাগীত-রীতি হইতে কীর্তনের উৎপত্তি, একথা জোর করিয়া বলা না গেলেও—একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে চর্যাগীতিগুলি যেমন সামাজিকভাবে একক ও সম্মেলক গীত হইত—তেমনি গীতধারা প্রবাহিত হইয়াছে বাঙালীর চিরকালের সামাজিক জীবনে, কীর্তনে, শাক্তদের গানে, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে।

সুতরাং একথা মনে করিবার কারণ নাই চর্যাগীতি বাঙ্গালী জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ একটি যুগের বিশেষ একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সাধন-সঙ্গীত মাত্র, ইহার না আছে কোন অনুবৃত্তি না আছে কোন উত্তর প্রভাব। চর্যাগীতির ভাবধারা ভুঁইফোড় কিছু নহে। বাঙ্গালী জীবনের বিশেষ একটি পর্যায়ে সমাজের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল আবার বাঙ্গালী জীবন ও সমাজের বিবর্তনে তাহার সেই মূল ধারাগুলি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ-কর্মের ভিতর দিয়া আধুনিক কাল পর্যন্তই প্রবাহিত হইয়াছে।

১০. মূল গীতি

সূচনা : পাঠান্তর ও পাঠনির্ণয় সমস্যা

একদা চর্যাগীতির পাঠনির্ণযের জন্য শাস্ত্রীগৃহীত পাঠ ও প্রতিলিপি, তিব্বতী অনুবাদ এবং ব্যাকরণগত দিকে তৎকালীন সম্ভাব্য রূপই ছিল সম্বল। অধুনা চর্যার পুথির ফটো মুদ্রণ সহজলভ্য হওযায [নীলরতন সেনকে সাধুবাদ !] নিজের চোখে দেখিবা পুথি বিচার করিয়া সম্পাদকেরা নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ পাইযাছেন। পুরাতন পুথির ফটোমুদ্রণ, স্বভাবতই তাই চিত্র স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। পুরাতন লিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধারে অন্য নানা কারণে দুরূহতা ছাড়াও এই অস্পষ্টতা ক্ষেত্র বিশেষে বেশ বাধা সৃষ্টি করিযাছে। পুথিব ফটোচিত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া, অন্যান্য যেসব কারণে চর্যার পাঠে মতভেদ তথা পাঠান্তর দেখা দিযাছে তাহার কযেকটি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি।

১। পুথিখানির লিপিকর এক না একাধিক সে বিষযে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন লিপি-বিশারদেরা। লিপিকর এক বা একাধিক যাহাই হউন, পুথির লিপিতে অযত্ন ও অসতর্কতাব বহু চিহ্ন বিদ্যমান। লিপিকরের অসতর্কতা এবং তজ্জনিত লিপিপ্রমাদ নির্ভুল পাঠনির্ণয়ের পক্ষে বাধা স্বরূপ। নিদর্শনসহ কযেকটি অসতর্কতাব বিষয উল্লেখ করি।

(ক) পুথির লিপি অবশ্যই বাংলা। কিন্তু খুব স্বল্প পরিমাণে হইলেও কদাচিৎ যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্ন এ-কার, ও-কার, ঐ-কার প্রভৃতির মধ্যে নাগরী ও নেওযারী রীতির অনুপ্রবেশ ঘটিযাছে। দ্রষ্টব্য পুথির ৪৩খ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির বিরামচিহ্ন। (নেওয়ারী রীতি), ৪৪ক পৃষ্ঠার 'কাহেরে'-এর 'হে' অক্ষরের এ-কার, ৪৫ক পৃষ্ঠায় 'চান্দে' শব্দটির এ-কার, ৩৩খ পৃষ্ঠায় জইসো-এর ও-কার ইত্যাদি।

(খ) পুথিতে Overwriting-এর চিহ্ন বেশ কযেকটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। লিপিকরেরা লিখিতে লিখিতে ভুল ধরা পড়িলে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্জন করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। কিন্তু চর্যার পুথিতে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঘষিয়া মাজিয়া ভুল লিপিকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা আছে। দ্রষ্টব্য পুথির ১৩খ পৃষ্ঠায় চউদিস শব্দটির 'চ' বর্ণটি, ২৬খ পৃষ্ঠার 'আলো' ('আসো' লিখিয়া পরে 'আলো' করা), ২৯খ পৃষ্ঠায় প্রথমে 'ষোহাএ' লিখিয়া পরে 'পোহাএ' করা ইত্যাদি।

(গ) Overwriting ছাড়াও ভুল অংশ বর্জন না করিয়া তাহার পাশে শুদ্ধপাঠ লিখিয়া দেওয়ার নিদর্শনও চর্যায় মেলে। পুথির ৪৯ক পৃষ্ঠায়

(৩৪সং চর্যার ৫ম পংক্তিতে) 'কিস্তো কি' দ্রষ্টব্য। লিপিকর কিস্তো লেখার পর আবার কিস্তো লিখিতে যাইতেছিলেন। ভুল ধরা পড়ায় অসমাপ্ত রাখিয়া পরবর্তী শব্দটি লিখিয়াছেন কিন্তু ভুল অংশ বর্জন করেন নাই।

(ঘ) বিরামচিহ্ন সম্পর্কে অসতর্কতা ও নিয়মহীনতা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পুথির ৫৫খ—৫৬ক পৃষ্ঠার ৩৯সং চর্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ধ্রুবপদসূচক ধ্রু/ধ্র (দুরকম বানানে লিখিত) অনেক ক্ষেত্রে বাদ পড়িয়াছে। অবশ্য এগুলি অসতর্কতাজনিত লিপি প্রমাদ হইলেও এগুলির জন্য পাঠভেদের গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু কোন কারণে অন্ত্যমিলের অসঙ্গতি এবং বিরামচিহ্নের অনুপস্থিতি একসঙ্গে ঘটিলে মূলের শুদ্ধ পাঠ সম্পর্কে অবশ্যই সন্দেহ জাগে। দ্রষ্টব্য ৩৪সং চর্যার ১ম ও ৪র্থ চরণ, পুথির ৪৯ক পৃষ্ঠায়।

(ঙ) অসতর্কতা লিপি-রীতিতেও লক্ষণীয়। ব্যঞ্জনবর্ণের উপরে বিন্দুচিহ্ন বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত যুক্ত বর্ণের সূচক। অনুস্বার বুঝাইবার জন্যও চিহ্নটি ব্যবহৃত। অন্যদিকে বর্গের পঞ্চম বর্ণও যুক্ত ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য ২৫ক পৃষ্ঠার থম্বাঠাণা, ২৫খ পৃষ্ঠার কিম্পি প্রভৃতি। পুথিতে উ-কার সাধারণত বর্ণের নিচে ব-ফলার মত। কিন্তু মাঝে মাঝে আধুনিক উ-কার চিহ্নও (ু) ব্যবহৃত। দ্রষ্টব্য পুথির ১৪ক, ২২ক পৃষ্ঠা। অ-বর্ণের নিচে কদাচিৎ আধুনিক 'ু'-কার চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। পুথির ৫২ক পৃষ্ঠার অ্হারী=অহারী। ইহার কারণ নির্ণয় দুরূহ। ই-কারের বাঁদিকের দণ্ড চিহ্নটি কখনও সরল কখনও অর্ধবৃত্তাকার, প্রায় এ-কারের মত। ই-কারের মাত্রার উপরকার চেতনটিও কখনও বেশ বড় কখনও খুবই ছোট। চৈতনটি খুব ছোট এবং বাঁদিকের দাঁড়িটি অর্ধবৃত্তাকার হইবার ফলে ই-কার অনেক সময় এ-কার বলিয়া ভ্রম হয় এবং পাঠনির্ণয়ে বিভ্রান্তি ঘটায়। উদাহরণত ৬৫ক পৃষ্ঠার (৪৭ সং চর্যার শেষ পংক্তি) উঠি/উঠে পাঠভেদ।

(চ) লিপিতে কদাচিৎ রাগ এবং/অথবা কবির নাম বাদ পড়িয়াছে। ইহার ফলে ৬৫ক পৃষ্ঠার ধামপাদের ৪৭ সং চর্যাটিকে শাস্ত্রীমহাশয় গুঞ্জরী পাদের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(ছ) লিপিকরের উচ্চারণ প্রবৃত্তি কদাচিৎ বানানেও প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ৫৮খ পৃষ্ঠার 'খেড়া'। অন্যত্র, এই গীতিতেও শব্দটি খেলা, খেলই প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও, একই শব্দের একই গীতিতে ভিন্ন ভিন্ন বানানে লিপিকৃত হওয়ার নিদর্শন অবিরল। ইহা স্বভাবতই লিপিকরের অসতর্কতা (অজ্ঞতা ?) নির্দেশ করে। ৪খ পৃষ্ঠার জাই/জাঅ, চৌরি/চোরে, ১২খ পৃষ্ঠার বিষণ/বিমন, ২৩খ পৃষ্ঠার দীসঅ/দিসই

৪৮ক পৃষ্ঠার সো/সৌ/ষো, ২৬খ পৃষ্ঠার তান্তি/তান্তী ; এমন উদাহরণ অজস্র। ইহার কিছু কিছু হয়ত তৎকালীন উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু এই জাতীয় লিপিকরণের মধ্যে যে অসতর্কতা প্রকট তাহা অস্বীকার করা চলে না।

২। লিপিকরের অসতর্কতাজনিত লিপিপ্রমাদ ছাড়াও প্রাচীন পুথির পাঠনির্ণয়ের চিরাচরিত কয়েকটি অসুবিধা চর্যার পুথির ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। ইহার মধ্যে প্রধান বর্ণসাদৃশ্য। চর্যার পুথিতে উ/ড়, ট/ঢ/ঢ়, ব/র, উ-কার/ব-ফলা প্রায় সদৃশ। অবশ্য ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যও বিদ্যমান। তবুও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই বর্ণসাদৃশ্যের জন্যও পাঠান্তর সমস্যাও দেখা দিয়াছে। দ্র. পৃষ্ঠা ৪খ গাইউ/গাইড়, সনাইউ/সনাইড় ; ১ম পৃষ্ঠার দিট/দিঢ়, ৩১খ পৃষ্ঠার মুসার চারা/মুসা বচারা, ১৪ক পৃষ্ঠার সুঙ্গা/স্বঙ্গা প্রভৃতি। এ ছাড়া লিপিকরের লেখার দোষে কয়েকটি বর্ণে সাদৃশ্য দেখা দিয়াছে, পাঠ বিভ্রম ঘটিয়াছে। উদাহরণত ৫৩খ পৃষ্ঠার গলপাস/গলযাস, ৩০খ পৃষ্ঠার বাসনা পুড়/বাসনা যুড় (প/য সাদৃশ্য)। ৬খ পৃষ্ঠার ঘড়ুলি/সড়ুলি (ঘ স সাদৃশ্য) ইত্যাদি।

৩। পাঠান্তরের কারণ হিসাবে পদবিভাগের সমস্যা সুবিদিত। চর্যার ক্ষেত্রেও একাধিক স্থানে এ সমস্যা দেখা দিয়াছে। ৬১খ পৃষ্ঠার 'বাণতকাকোএ' শাস্ত্রীর পদবিভাগ অনুযায়ী—বাণত কা কোএ, কিন্তু সুকুমার সেনের পদবিভাগ—বাণতকা কোএ। আবার কেহ কেহ পাঠ ধরিয়াছেন বাণত কাকোএ। সুতরাং পাঠান্তর অবশ্যম্ভাবী।

৪। বর্ণসাদৃশ্য ও পদবিভাগ সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যাইত টীকার নির্ভুল পাঠনির্ণয় সম্ভব হইলে। তাহা তো সম্ভব নয়ই, বরং মূলগীতি ও টীকা দুটি ভিন্ন পুথি হইতে লিপিকৃত হওয়ায় পাঠান্তর সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

[এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও পুথিচিত্র সতর্কতার সহিত পাঠ করিয়া, অন্যান্য সম্পাদকগণের গৃহীত পাঠ, টীকা, তিব্বতী অনুবাদ, ছন্দমিল প্রভৃতি বিচার করিয়া পাঠনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি। বিতর্কিত স্থলে পাঠ গ্রহণের যুক্তি, অন্যান্য সম্পাদকগণের গৃহীত পাঠের সহিত পার্থক্যও নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অংশে কয়েকটি সংকেত-সূচী এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়—পা.=পাঠান্তর, পাঠনির্ণয় ; শা.=শাস্ত্রী ; সু.=সুকুমার সেন ; নী =নীলরতন সেন।

১

১রাগ পটমঞ্জরী লুই পাদানাং১

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥ ধ্রু ॥

দিঢ়২ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥ ধ্রু॥
সঅল৩ [স মা] হিঅ৩ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই৪ ॥ ধ্রু॥
এড়িএউ৫ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্ন৬ পাখ ভিতি লাহু রে পাস॥ ধ্রু॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা। ·
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা৭ ॥ ধ্রু॥ [পুথির পৃষ্ঠা ১খ]

পা. ১-১. (অন্যত্র রাগ ও কবির নাম গীতারম্ভে থাকিলেও এক্ষেত্রে রাগের নাম গীতিশেষে এবং কবির নাম ভণিতা ও টীকায় পাওয়া যায়।) সাদৃশ্য রক্ষার জন্য মুদ্রিত। ২. শা. দিট : পুথিতে ট/ঢ়/ঢ বর্ণগুলি প্রায় সদৃশ। সু. লিপির এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াও দিট পাঠ দিযাছেন। টীকানুসারে দিঢ সঙ্গত। ৩-৩. পুথিতে মূলত সমাহিঅ ছিল। পাতার সূত্র প্রবেশ ছিদ্রটি ভাঙ্গিয়া বাড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রথমে 'মা' লুপ্ত হয়। শা. স [মা] হিঅ। বর্তমানে 'স'ও প্রায় লুপ্ত। ৪. অন্ত্যমিলের জন্য এবং পূর্ব চরণের করিঅই-এর সাদৃশ্যে মরিঅই সম্ভব। ৫. সু. এড়িএউ পাঠ সম্ভব স্বীকার করিযাও এড়িএড় পাঠ দিয়াছেন। ৬. পুথিতে সুস্পষ্ট সুন্ন। শা. সু. সুনু। ৭. পুথিতে বইণ। টীকা, অন্ত্যমিল ও প্রসঙ্গ অনুসারে বইঠা সঙ্গত। লিপিকর ঠ এবং আ-কারের মধ্যে আঁকড়িটি বড করিয়া ফেলায ণ মনে হয়।

অ ন্ব য় : কাযা তরুবর, পাঁচটি [তাহার] ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট [হইল]। দৃঢ় করিযা মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই ভণে (=বলেন) গুরুকে পুছিয়া (=জিজ্ঞাসা করিয়া) জান। সকল সমাধিদ্বারা কি করা যায়? সুখ-দুঃখেতে নিশ্চিত মরা হয় (=মৃত্যু নিশ্চিত)। ছন্দের (=বাসনার) বন্ধন, করণের (=ইন্দ্রিয়ের) পারিপাট্যের আশা এড়ানো হউক (পরিহার কর)। শূন্যতা পক্ষের দিকে পাশ লও (=দৃষ্টি দাও)। লুই ভণে (= বলেন) আমি সজ্ঞায় দেখিয়াছি। ধমণ চমণ যুগ্ম পিঁড়িতে বসিয়াছি।

টী কা টি প্প নী : কাআ…… ডাল=কায়াতরুর পাঁচটি শাখা। এই পাঁচটি শাখা বৌদ্ধ পঞ্চস্কন্ধ (রূপাদয়ঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ, টীকা)। রূপ, বেদনা সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধ। দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়ে 'ভূমিকা : মূল দার্শনিক ভিত্তি' অংশে আলোচনা দ্র. (পৃ. ৬৪)। বি <অপি (আদিস্বরলোপ এবং ঘোষীভবন ; নির্দেশক অব্যয়রূপে বি-এর প্রয়োগ অবহট্‌ঠের চিহ্নবহ)। ডাল —দেশি শব্দ বলিয়া অনুমিত। সং ভ্রু (=বৃক্ষ), দারু (=কাষ্ঠ) হইতে ইহার উদ্ভব সম্ভব (ODBL p. 494)। সুকুমার সেন শব্দটির উদ্ভব অর্বাচীন সংস্কৃতে এবং সেই হিসাবে ইহা অসিদ্ধ (Unorthodox) তৎসম বলিয়া মন্তব্য

করিয়াছেন (ভা. ই. ১৯৫)। চীএ=চিত্তে (অধি.)। পইঠো <প্রবিষ্ট। চর্যায় নিষ্ঠান্ত পদের বিবর্তিত রূপ অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত, কদাচিৎ উ-কারান্ত। ও-অন্তক রূপ বিরল। চঞ্চল......কাল=জগৎসংসার বস্তুত মিথ্যা। অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্ত কালজ্ঞান সৃষ্টি করে। তাহা হইতে বস্তু-জ্ঞানের উদ্ভব। দিঢ় <দৃঢ়। করিঅ <*করিত্বা=কৃত্বা, =করিয়া, (অসমা.)। (সুনীতিবাবু এই জাতীয় অসমাপিকার ব্যুৎপত্তি 'ত্বা'-জাত বলিয়া মনে করেন ; ODBL p. 1006-11.) সুকুমার সেন এগুলিকে নিষ্ঠান্ত পদজাত বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ *করিত (=কৃত)> করিঅ। অবশ্য তিনি ভিন্নমতও, ত্বা> ই অ/ই আ—প্রকাশ করিযাছেন। দ্র. (ভা. ই. পৃ. ৩৩০, ৩৫২)। পরিমাণ= পরিমাণ কর, অনুজ্ঞা ; <প্রমাণয়, পরিমাণয়। গুরু=গুরুকে ; কর্মকারকে শূন্যবিভক্তি। পুচ্ছিঅ=জিজ্ঞাসা করিয়া ; <*পৃচ্ছিত্বা=পৃষ্ট্বা (অসমা.)। সমাহিঅ <সমাধিভিঃ। কাহি=কি ; কস্য> কস্স> কাস> কাহ+ই (নিশ্চয়ার্থক)। করিঅই=করা হয় (কর্মভাব বাচ্য) ; <*কর্যতে (=ক্রিয়তে)। মরিআই=মরা হয় (কর্মভাব বাচ্য) ; <*মর্যতে (=ম্রিয়তে)। এড়িএউ= এড়ানো হউক ; √এড় দ্রাবিড়মূল (? ODBL p. 478)। ছান্দক=বাসনার ; ছন্দ> ছান্দ+ক (৬ষ্ঠী)। করণক=ইন্দ্রিয়ের ; করণ+ক (৬ষ্ঠী)। পাটের পারিপাট্যের ; পাট+এর (৬ষ্ঠী)। সুন্ন, সুন্নু <শূন্য। পাখ <পক্ষ। ভিতি <ভিত্তি ; =দিকে, তু° চারিভিতে=চারি দিকে। লাহু=লও ; √লা+হু (অনুজ্ঞা)। পাস <পার্শ্ব। এড়ি· ···পাস=বাসনার চরিতার্থতা ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া শূন্যতাজ্ঞানের আশ্রয় লও। আমহে: আমি ; অস্মাভিঃ> অম্হাহি> অম্হহিঁ> অম্হে, আম্হে। মূলত পদটি বহু ব. ও করণকারকের হইলেও চর্যার যুগ হইতে একবচনে ও কর্তায় প্রযুক্ত। সাণে=সজ্ঞায়, ইশারায় ; সজ্ঞা> সণ্ণা> সাণ। দিঠা <দৃষ্ট। ধমণ, চমণ= ইড়া ও পিঙ্গলার বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর। বেণি=যুগ্ম ; *ত্রীণি (ত্রীণির সাদৃশ্যে)> বেণি। পাণ্ডি=পিঁড়ি ; পাট্টিক (?)> পট্টিঅ> পাটি> পাড়ি> পাঁড়ি> পাণ্ডি। বইণ=বইঠা <উপবিষ্ট> বইট্‌ঠ> বইঠা।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য গীতিটিতে চর্যার দার্শনিক পটভূমি, ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি ও সাধন পদ্ধতির সুন্দর নিদর্শন মেলে। গুরুর উপর নির্ভরশীলতা, আচার অনুষ্ঠান বাহুল্যে বিরাগ ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহাসুখ লাভের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। প্রথম দুই পংক্তিতে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ ও অবিদ্যাবিক্ষুব্ধ চিত্তকর্তৃক জগৎ-সংসারের প্রতিভাস সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্বের কথা ব্যক্ত। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তিতে গুরু-নির্দেশিত পথে মহাসুখ লাভের উপদেশ। অতঃপর দুই পংক্তিতে সমাধি প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকরত্ব ও মৃত্যুর অনিবার্যতার কথা বলা হইয়াছে। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদির মধ্য দিয়া যাহা লভ্য তাহা পরিত্যাগ

করিয়া শূন্যতাজ্ঞানের আশ্রয় লইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে পরবর্তী দুই পংক্তিতে। শেষের ভণিতায় লুই বলিতেছেন তিনি ইহা জানিয়াছেন তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ভিতর দিয়া, ইড়া পিঙ্গলাকে সুষুম্না পথে পরিচালিত করিয়া।

দ্র. গীতিটিতে দুইবার ভণিতা আছে, ৪র্থ পংক্তিতে ও ৯ম পংক্তিতে। দ্বিতীয় ভণিতাটি ১০ম পংক্তিতে থাকা স্বাভাবিক ছিল। ৯ম পংক্তি ১০ম পংক্তির স্থানে বসিলে অর্থগত কোন অসঙ্গতি হয় না। চর্যায় অবশ্য ৯ম পংক্তিতে ভণিতার রীতি বিরল নহে।

২

রাগ গবড়া$_{১}$ কুক্কুরী পাদানাং$_{২}$

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই$_{৩}$।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥ ধ্রু ॥
আঙ্গণ$_{৪}$ ঘরপণ$_{৫}$ সুণ ভো বিআতী।
কানেট চৌরি$_{৬}$ নিল অধরাতি ॥ ধ্রু ॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ$_{৮}$ ॥ ধ্রু ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই$_{৯}$ ডরে ভাঅ।
রাতি ভইলেঁ$_{১০}$ কামরু জাঅ ॥ ধ্রু ॥
অইসন$_{১১}$ চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ$_{১২}$।
কোড়ি মঝেঁ$_{১৩}$একু হিঅহিঁ$_{১৩}$ সমাইউ$_{১৪}$ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪থ]

পা. ১. ফটোচিত্র অস্পষ্ট। মিলাইয়া দেখা গেল না। ২. শা., সু. কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু পুথিতে সঙ্গীতারম্ভে কবির নাম নাই। অন্য গীতির সাদৃশ্যে ভণিতা ও টীকা হইতে প্রদত্ত। ৩. অন্ত্যানুপ্রাস ও ৮ম চরণের জাঅ-এর সাদৃশ্যে জাঅ সম্ভব। চর্যায় এই জাতীয় পদগুলির ই-অন্তক ও অ-অন্তক উভয়-রূপই বিদ্যমান। এই গীতির লিপিকর সম্ভবত ই-অন্তক রূপে অভ্যস্ত ছিলেন। ৮ম পাঠান্তর দ্র.। ৪. টীকা. অঙ্গণ। ৫. সু. ঘরয়ণ। ৬. পুথি চৌরি; ৬ষ্ঠ চরণে চোরে। টীকায় যথাক্রমে চৌরেণ এবং চোরেণ। কেন এই পার্থক্য বোঝা যায় না। ৭. টীকা. সসুরা। ৮. পুথিতে মাগঅই লিখিয়া ই কাটা। ৯. শা. কাড়ই; ড়/উ লিপি সাদৃশ্যে এই বিভ্রম। ১০. শা. ভইলে। ১১. টী. অইসনি; লিঙ্গসৌষম্যের জন্য অইসনি প্রশস্ত। ১২. শা. গাইড়। পূর্বে ৯ দ্র.। ১৩. শা. একুড়ি অহিঁ। ১৪. পুথিতে সনাইউ। ম স্থানে ন লিপি প্রমাদ। শা. সনাইড়; পূর্বে ৯, ১২ দ্র.। সু. গীতিতে সনাইউ লিখিয়াও শব্দকোষে সমাইউ।

অ ন্ব য় : তুলিকে (=মাদি কাছিমকে) দুহিয়া পিটে (=পাত্রে) ধরান যায় না। বৃক্ষের তেঁতুল কুম্ভীরে খায়। হে বিআতী (=বধূ) শোন, [উভয়কে] অঙ্গন ও গৃহের দিকে [লইয়া যাও]। অর্ধরাত্রে চোরে কানেট (কর্ণভূষণ) নিল (=চুরি করিল)। শ্বশুর নিদ্রা গেল, বধূটি জাগে। কর্ণভূষণ চোরে নিল, কোথায় গিয়া মাগা যায় (=খোঁজা যায়)। দিবসে বধূটি কাক ডরে ভয় পায় রাত্রি হইলে কামরূপ যায়। এইরূপ চর্যা কুক্কুরীপাদ গায়। কোটি মধ্যে [যদি ইহা] একটি হৃদয়েও প্রবেশ করে।

টী কা টি প্প নী : দুলি=মাদি কচ্ছপ। প্রা. দুলী <দুড়ী। এখানে তাত্ত্বিক অর্থ দুই বা দ্বৈতজ্ঞান। দুহি=দোহন করিয়া, নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া (অসমা); <* দুহিত্বা=দুগ্ধবা। নষ্ট করা বা নিঃস্বভাবীকৃত করা অর্থে দুহ্‌ ধাতুর ব্যবহার ৩৩ সং চর্যায় দ্র.। পিটা=দুগ্ধভাণ্ড বা কেঁড়ে; গূঢ়ার্থে নাভিমূলে অবস্থিত মণিপুরচক্র। ধরণ ন জাঅ=ধরান যায় না। যৌগিক বা বহুভাষিক কর্মভাব বাচ্য। (ধরণং ন যাতি)। আধুনিক কালে এইরূপ প্রয়োগ বঙ্গালীতে লক্ষণীয়। রুখের=[দেহরূপ] বৃক্ষের। বৃক্ষ >রুক্‌খ>রুখ+এর (ষষ্ঠী)। তেন্তলি--তেঁতুল <তিন্তিড়ি, তাত্ত্বিক অর্থে বোধিচিত্ত। খাঅ=খায় < খাদ্যতে। আঙ্গন=বিরমানন্দের স্থান। ঘরপণ=ঘরে, ঘরপানে (?) মহাসুখচক্রে। বিআতী=বিবাহিত স্ত্রীলোক, [a fertile woman ; * বিয়াতিকা (= বিয়াতা) >বিআতী; অর্ধতৎসম, E. D. B. Sen. Vol II p 654] ড. বাগচীর মতে বিজ্ঞপ্তি হইতে বিআতী, এখানে অর্থ অবধূতিকা। কাণেট= কর্ণভূষণ, এখানে প্রকৃতি দোষ, <কর্ণবেষ্ট। চৌরি=চোরে; এখানে সহজানন্দ। রাতি - রাত্রি; সহজানন্দে বিলীন হইবার পূর্ব মুহূর্ত, নিবৃত্তি। দিবস=প্রবৃত্তি; চিত্তের জাগ্রতাবস্থা। সুসুরা=শ্বশুর; শ্বাস। বহুড়ী= <*বধূটিকা, বধূটী। জাগঅ=জাগে; <*জাগ্রতি=জাগর্তি। কা গই=কোথায় যাইয়া। গই < *গমিত্বা=গত্বা। মাগঅ=মাগে, অনুসন্ধান করে; < * মাগতি=মার্গ্যতে। কাউই ডরে= কাকের ভয়ে। কাউআ বঙ্গালীতে প্রচলিত। ডরে=ভয়ে; <দর। ভাঅ=ভীত হয়; < *ভায়তি=বিভেতি। কামরু=কামরূপ; মহাসুখ চক্র। জাঅ < যায়তে। অইসন=এমন; < *অবাদৃশ; * আদৃশ+ই (স্ত্রী)। পাএঁ < পাদেন। গাইউ=গাওয়া হইল; < * গাথিত। কোড়ি= কোটি, একু=একের (ষষ্ঠীতে 'কু' < এক+কু); হিঅহিঁ=হৃদয়ে; হৃদয় > হিঅ+হিঁ (৭মী)। সমাইউ=প্রবেশ করে; <*সমায়িত=সমায়াতঃ।

ব্যা খ্যা সং কে ত : গীতিটির আদ্যোপান্ত হেঁয়ালি ভাষায় রচিত। বাচ্যার্থের অন্তরালে তান্ত্রিক পারিভাষিক অর্থ উদ্দিষ্ট। টীকাতেও বলা হইয়াছে— 'সন্ধ্যাভাষয়া প্রকটয়িতুমাহঃ'।

গুরুর উপদেশে কুম্ভক যোগ দ্বারা ইড়া পিঙ্গলাকে বশীভূত করিয়া বোধি-

চিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহজানন্দ লাভের কথাই গীতিটিতে ব্যক্ত। দুইকে দোহন করিলে অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হইলে শক্তিকে আর মণিপুর চক্রে ধরিয়া রাখা যায় না। তাহা উর্ধ্বগামী হয়। কুম্ভক যোগাভ্যাসে সংবৃতিবোধিচিত্ত নষ্ট হয়। চিত্তের সংবৃতি অবস্থায় অবধূতিকা ভীত হয় কিন্তু প্রকৃতি দোষমুক্ত সহজানন্দ অবস্থায় অবধূতিকা মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। গীতিটিতে সন্ধ্যাভাষার চূড়ান্ত। ভণিতাতেও পদকর্তা গোপনীয়তার ইঙ্গিত দিযাছেন।

৩

রাগ গবড়া বিরুবা পাদানাং

এক সে শুণ্ডিনীণি১ দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি২ বান্ধঅ॥ ধ্রু॥
সহজে থির করি বারুণি২ সান্ধে৩।
জেঁ অজরামর হোই দিঢ়৪কান্ধঃ৫॥ ধ্রু॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥ ধ্রু॥
চউশঠি ঘড়িয়ে দেট৬ পসারা।
পইঠেল গরাহক।৭ নাহি নিসারা॥ ধ্রু॥
এক ঘড়ুলী৮ সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল॥ ধ্রু॥ [পুথির পৃষ্ঠা ৬ক-খ]

পা. ১. পুথিতে শব্দশেষে নীণি। ন-এর দ্বিত্ব সম্ভবত লিপিকরের ন/ণ, ই/ঈ সম্পর্কে দ্বিধার ফল। শেষ পর্যন্ত একটি বর্জন করিতে ভুলিয়াছেন। :টী. সুণ্ডিণী। ২. শা. বারুণী। ৩. অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য সান্ধ শুদ্ধপাঠ বলিয়া অনুমিত। ৪. শা. দিট। ৫. শা. ':' বর্জন করিয়া সংশোধনের পক্ষপাতী। ৬. পাঠ দেট হইলেও অর্থের দিক দিয়া সন্দেহমুক্ত নহে। প্রতিলিপিতে দেত। শাস্ত্রী শব্দসূচীতে অর্থ দিযাছেন দৃষ্ট। তিব্বতী অনুবাদে অর্থ দত্ত, বাগচীর পাঠ দেল। টীকাতে পদটির উল্লেখ নাই তাই সেদিক দিয়াও সংশোধন অনুমান কবা গেল না। ৭. গরাহক-এর পরে একটি দাঁড়ি চিহ্ন আছে। চিহ্নটি বিচ্ছিন্ন তাই আ-কার ধরিয়া গরাহকা পড়া যায় না। ৬ষ্ঠ চরণেও গরাহক। চিহ্নটি অকারণ। ৮. শা. স. ডুলী; নী. সডুলী। লিপি অনুযায়ী সড়ুলীও পড়া যায়। স ও ঘ-এ পার্থক্য আছে তবে এ ক্ষেত্রে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। টীকা ঘড়ুলী।

অন্বয়: এক সে শুণ্ডিনী দুইকে ঘরে সান্ধায় (=প্রবেশ করায়)।

চিকণ বাকল দ্বারা বারুণীকে বান্ধে। সহজানন্দে স্থির করিয়া বারুণীতে প্রবেশ কর যাহাতে দৃঢ় স্কন্ধ [হইয়া] অজরামর হয়। দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখিয়া গ্রাহক আপনিই বহিয়া আসিল। চৌষট্টি ঘড়ায় পশার দেওয়া আছে, গ্রাহক প্রবেশ করিল [কিন্তু] নিঃসার (=নির্গমন) নাই। একটি ছোট ঘড়া (গাড়ু), সরু তাহার নল। বিরুআ বলেন স্থিরভাবে চালাও।

টী কা টি প্প নী : শুণ্ডিনী=শুঁড়ি জাতীয় স্ত্রীলোক; গূঢ়ার্থে অবধূতিকা দুই=দুইকে, কর্মে শূন্য বিভক্তি। দুইকে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলাকে। ঘরে=মধ্য-নাড়ীতে। সান্ধঅ=প্রবেশ করায, সাঁধায়। সন্ধায়তি>সন্ধাঅই>সন্ধাঅ, সান্ধঅ। চীঅণ=চিকণ=চিক্কণ, অবিদ্যামলশূন্য। চিকণ শব্দটি দুধে সিদ্ধ সুপারির বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত। দ্র. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান। মদ চিযান=মদ্য প্রস্তুত করা। বাকলঅ=বল্কলদ্বারা। বল্কল>বাকল+৩য়ার এন>এ>অ। বাকলএ>বাকলঅ। বাকল তিব্বতী অনুবাদে chain rtsi'= সুরামণ্ড yeast। বাকড়=মদ্য প্রস্তুতের উপাদান বিশেষ (E. D. B.)। বাকড়=চাউল (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস); ইহাও মদ্য প্রস্তুতের উপাদান। বারুণী=মদ্য; সুখপ্রমোদস্বরূপ বোধিচিত্ত। বান্ধঅ=বান্ধে; *বন্ধয়তি= বধাতি>বন্ধঅই>বন্ধঅ>বান্ধ। সহজে=সহজানন্দে। সান্ধ=প্রবেশ করাও; সন্ধয়>সন্ধঅ>সান্ধ। জেঁ=যাহাতে, <যেন। হোই=হয়; ভবতি> ভোদি>ভোই>হোই। দিঢ়কান্ধ<দৃঢ়স্কন্ধ। রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহকে যোগসাধনাদ্বারা দৃঢ় করিয়া, দিব্যদেহে পরিণত করিয়া, যোগী দৃঢ়স্কন্ধ হইয়া জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন। দশমি দুআযত=দশমদ্বারে। যোগ মতে দেহে দশটি দ্বার কল্পিত। দশমদ্বাব পথে দেহামৃত সোমরস নিম্নে ক্ষরিত হয। যোগ প্রক্রিযায সেই দশমদ্বার বন্ধ করিতে পারিলে যোগী নিজে সেই রস পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। যোগ সাধনায় দশমী দুয়ার প্রসঙ্গ প্রাযশই ব্যবহৃত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও আছে—

ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মনপবন তাত কৈল বন্দী॥
দশমী দুযারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলো মো সে যোগবাট॥ —রাধা বিরহ

আলোচ্যক্ষেত্রে দশমদ্বার সম্ভবত মহাসুখচক্রে প্রবেশদ্বার। এখানে বৌদ্ধধর্ম ও যোগসাধনার সংমিশ্রণে এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার। দুআরত=দ্বারে। দ্বার>দুয়ার+ত (৭মী)<ত্র। ৭মীর 'ত' অন্ত হইতে আগত বলিয়া অনেকের অনুমান। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে অন্ত>অাঁৎ হয়; 'ত' হয় না। স্থানবাচক প্রত্যয় 'ত্র' বা 'তসিল' (তঃ) হইতে 'ত'-এর উদ্ভব সমীচীন মনে হয। দেখইঅ =দেখিয়া, < * দৃক্ষয়িত্বা<দেক্‌খ্ইআ<দেখইআ। আইল<আয়াত+ইল্ল।

গরাহক<গ্রাহক (বিপ্রকর্ষ)। চউশঠী=চতুঃষষ্টি। ঘড়িয়ে=ঘটিতে ; ঘটী>ঘড়ি+এ (৭মী)। দেট=দেত। পাঠ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ আছে। টীকায শব্দটিব উল্লেখ নাই। শাস্ত্রী শব্দসূচীতে অর্থ দিযাছেন 'দৃষ্ট'। তিব্বতী অনুবাদে অর্থ 'দত্ত'। দেত=দেওয়া আছে, <দত্ত। পসারা=পণ্যসামগ্রী ; <প্রসাব। পইঠেল=প্রবেশ কবিল, প্রবিষ্ট<পইট ঠ+ইল্ল। পদটিকে বিশেষণ রূপেও ব্যাখ্যা করা চলে। চর্যা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইল-যুক্ত নিষ্ঠান্ত পদের বিশেষণ রূপে প্রযোগ প্রচুব। বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে প্রবিষ্ট ; গ্রাহকের বিশেষণ। নিসারা=বহির্গমন, <নিঃসার। ঘড়ুলী=ছোটঘড়া, গাড়ু। ঘট+লী (ক্ষুদ্রার্থে)>ঘড়লী>ঘড়ুলি, ঘড়ুলী। নাল=নল। ভনন্তি গৌরবে বহুবচন।

ব্যা খ্যা সং কে ত : গীতিটিতে মদ্য বিক্রয়ের রূপকে যোগসাধনার কথা ব্যক্ত হইযাছে। দেহামৃত সোমবস সহস্রাব পদ্মে রক্ষিত হয এবং সেখান হইতে শঙ্খিনী নামক সরু বক্র নলপথে নিম্নগামী হয। যোগমতে শঙ্খিনীর এই মুখই দশম দ্বার। এই দ্বার বন্ধ করিয়া সোমরস রক্ষা করা প্রযোজন। ইড়া পিঙ্গলাকে মধ্যনাড়ী অবধূতিকায প্রবিষ্ট কবিযা এবং দেহামৃত সোমরসকে সহস্রার পদ্মে রক্ষা করিয়া, সহজানন্দ লাভ করিযা দৃঢ়স্কন্ধ হইযা অজরামর হওয়া যায। বোধিচিত্ত সহজামৃতের সন্ধান পাইযা, চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্ম নির্মাণচক্র হইতে সরু নলযুক্ত ছোট ঘটিতে (মহাসুখচক্রে) প্রবেশ করিল। পূর্বকালে মদের দোকানের সম্মুখে চিহ্ন থাকিত। তাহা দেখিযা গ্রাহকেরা দোকানে প্রবেশ করিত। আলোচ্য-পদে বোধিচিত্তই গ্রাহক ; দশমীদুয়ার চিহ্ন। বোধিচিত্ত নিজেই দেহামৃত সোম রসের আশায নির্মাণচক্র হইতে মহাসুখচক্রে প্রবেশ করে। এইভাবে সিদ্ধিলাভ হইলে আর পূর্বাবস্থায প্রত্যাবর্তন ঘটে না।

৪

রাগ অরু। গুণ্ডরী পাদানাং॥

তিঅড্ডা১ চাপী জোইণি২ দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশ ঘাণ্টে৩ করহুঁ৪ বিআলী॥ ধ্রু॥
যোইণি৫ তঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥ ধ্রু॥
খেপহুঁ৪ জোইণি৬ লেপ ন জায়।
মণিকুলে বহিআ ওড়িআণে সমাঅ৭॥ ধ্রু॥
সাসু ঘরেঁ ঘালি কোঞ্চা তাল।
চান্দসুজ্জ বেণি পথা হাল৮॥ ধ্রু॥

ভণই গুডরী, অম্হে কুন্দুরে বীরা।
নরঅ১০ নারী মঝেঁ উভিল চীরা ॥ ধ্রু ॥ [পুথির পৃষ্ঠা ৭খ]

পা ১. টীকা তিঅড়া। ২. ৫. ৬. শা. জোইনি। ৩. শা. ঘাণ্ট। ৪. নী. করহুঁ, খেপহুঁ। ৭. পুথি ও শা. সগাঅ। শুদ্ধপাঠ সমাঅ? ৮. শা. সু. কাল। ৯ নী গুডডরী। ১০. সু. সরঅ। পুথিতে স্পষ্ট নরঅ।

অন্বয়: জঘন চাপিয়া যোগিনী আলিঙ্গন দাও। কমল কুলিশ সংযোগে বিকালী [কাল (জ্ঞান) রহিত] কর। যোগিনী তোমাকে বিনা আমি ক্ষণমাত্রই বাঁচি না, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া কমলরস পান করি। ক্ষেপ (স্বস্থান) হইতে [উৎক্ষিপ্ত] যোগিনী মোহলিপ্ত হয় না; মণিকুল বহিয়া ওড়িয়াণে (=ঊর্ধ্বস্থানে) প্রবেশ করে। শ্বাস ঘরে (অথবা শাশুড়ীর ঘরে) বক্র তালা আঁটিয়া চন্দ্রসূর্য দুই পক্ষকে খণ্ডন কর। গুডরী বলেন, আমি কুন্দুরে বীর: নর-নারী মাঝে চীর (= বস্ত্র) ঊর্ধ্বে উঠিল।

টীকা টিপ্পনী · তিঅড্ডা = ত্রিনাড়ী; 'ললনা-রসনা-অবধূতিকা নাড্যঃ'—টীকা। আক্ষরিক অর্থ—ত্রিকোণ, ত্যাড়া। তান্ত্রিক গুহ্য অর্থে যোনি, জঘন। তিব্বতী অনুবাদে অনুরূপ অর্থ প্রদত্ত। <ত্রিবৃতক, অথবা <ত্রিপুটক। জোইণি = <যোগিনী। দে = দাও, <দেহি। অঙ্কবালী = আলিঙ্গন; <*অঙ্কপালিকা (=সঙ্গম)। টীকা অনুসারে অঙ্ক = স্বচিহ্ন, স্বরূপতা; বালী = পালক। কমল কুলিশ = পদ্ম ও বজ্র। বৌদ্ধতন্ত্রে কখনও কখনও কমল কুলিশ যথাক্রমে স্ত্রী ও পুং জননাঙ্গের প্রতীকরূপে কল্পিত। ঘাণ্ট = সংযোগ, ঘাঁটঘাঁটি; ঘণ্ট> ঘাণ্ট+এ (ঞয়া) করহুঁ = করিও; কর+হুঁ (অনুজ্ঞা, নাসিক্যীভূত। টীকায় অনুজ্ঞার অর্থ প্রদত্ত: করহুঁ = করি অর্থাৎ হুঁ উত্তম পুরুষের বর্তমান কালের বিভক্তি রূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে।) বিআলী = <বিকালী; কালরহিত। তঁই <*ত্বয়েন = ত্বয়া। বিনু = বিনা; (অনুসর্গ)। খণহি = ক্ষণমাত্র; <ক্ষণস্মিন্। জীবমি = বাঁচিযা থাকি, উত্তম পুরুষের একবচনের বিভক্তি মি; অনুরূপ পীবমি। মুহ<মুখ। প্রথম চারিটি পংক্তিতে দেহমিলন ও প্রেমারতির যে চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়, যদিও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির গূঢ় ইঙ্গিতই এখানে মুখ্য। খেপহুঁ = খেপ অর্থাৎ স্বস্থান যোগ হইতে; <*ক্ষেপভ্যাম্ = খেপেভ্যঃ। অপাদানে হু/হুঁ অবহটঠের চিহ্ন বহ। দ্র. ২৭ চর্যার বঅণহু। লেপ ন জাঅ = লিপ্ত হয় না। মণিকুলে = মণিকুল হইতে। বহিঁআ = প্রবাহিত হইয়া; <*বহিত্বা। ওড়িআণে = উড্ডীয়াণে, মহাসুখচক্রে। সমাঅ = প্রবেশ করে; <সমায়াতি। সাসু = শাশুড়ি, শ্বাস; <শ্বশ্রূ, শ্বাস। ঘালি = স্থাপন করিয়া; প্রাঃ √ঘল্ল = ফেলা অথবা ছুড়িয়া দেওয়া। এখানে লাগানো অর্থে ব্যবহৃত। কোঞ্চা = বক্র, দৃঢ়, কুঞ্চিত (?)। তাল = তালা। চান্দ<চন্দ্র; সুজ<সূর্য। চান্দসুজ = দ্বৈতজ্ঞান।

পথা = <পক্ষ। হাল = ফাল = ফাড়, খণ্ডন কর, স্ফটিত কর। হাল শুদ্ধ পাঠ হইলে কর্ষণ করা অর্থে √হল্ হইতে ব্যুৎপত্তি ধরা চলে। কর্ষণ করতে এক অর্থে কাড়িয়া ফেলা। গুডরী—পদকর্তার নাম। গানের শীর্ষে গুণ্ডরী, মধ্যে গুডরী এবং টীকায় গুড্ডরী। অম্‌হে = আমি; ১ সং চর্যা দ্র। কুন্দুরে = যোগ বিশেষ + এ (৭মী)। উভিল = ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা হইল। ঊর্ধ্ব > উব্‌ভ > উভ + ইল (নামধাতু)। চীরা = বস্ত্রখণ্ড।

ব্যা খ্যা সং কে ত: হেঁয়ালি ভাষায় তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায় গীতিটির মধ্যে। বৌদ্ধ তন্ত্রের শক্তি যোগিনীর মণিমূল হইতে মহাসুখচক্রে প্রবেশের পদ্ধতিরও বর্ণনা আছে এই গীতিটিতে। তান্ত্রিক সাধনায় শিব ও শক্তির মিলন, বৌদ্ধতন্ত্রে যাহা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলন রূপে বর্ণিত, তাহা অনেক সময়ই নারী-পুরুষের দেহমিলনের রূপেও ব্যক্ত হইত। আলোচ্য গীতিটি তাহার নিদর্শন।

ত্রিনাড়ী চাপিয়া (অর্থাৎ তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতে) পরিশুদ্ধাবধূতিকা যোগিনী সাধককে তাহার নিজের স্বরূপ (অঙ্কবালী) দান করেন। অর্থাৎ তান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়া সাধক সিদ্ধির পথে অগ্রসর হন। চিত্তকমল শূন্যতারূপ বজ্র বা পরমজ্ঞান লাভ করিয়া কালজ্ঞান রহিত হয়। সাধক তখন মহাসুখচক্রে অবস্থিত কমলমধু পান করেন অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করেন। সাধকের বোধিচিত্তের জাগরণ ঘটিলে তাহা আর মোহলিপ্ত হয় না; তাহা মণিমূল বাহিয়া ঊর্ধ্বমুখী হয়। শক্তি জাগ্রত হইলে বিভিন্ন চক্র বা পদ্মের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহা মহাসুখচক্রে উপনীত হয়। সিদ্ধাচার্য যেন নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—যৌগিক পদ্ধতিতে শ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া দ্বৈতজ্ঞান দূর কর। পদকর্তা যৌগিক সাধনায় সিদ্ধ (কুন্দুরে বীর), তাই তিনি যোগী ও যোগিনীর মধ্যে ও অষ্টগুণৈশ্বর্যাদি যোগীন্দ্রচিহ্ন উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

৫

রাগ গুর্জরী$_1$ চাটিল্লপাদানাং ॥

ভবণই$_2$ গহণগম্ভীর$_3$ বেগে বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী ॥ ধ্রু ॥
ধামার্থে চাটিল$_4$ সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামিলোঅ নিভর তরই ॥ ধ্রু ॥
ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি$_6$ জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ়ি$_7$ টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ$_8$ ॥
সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।

নিঅড্ডী৯ বোহি দূর ম জাহী ॥ ধ্রু ॥
জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী ।
১০পুচ্ছ তু১০ চাটিল অনুত্তরসামী ॥ ধ্রু ॥   [পুথির পৃষ্ঠা ৯ক খ]

পা. ১ সু. গুঞ্জ্ঁরী ; নী. গুর্জ্জরী । ২. নী. ভবনই । ৩ পুথিতে গম্ভীরা লিখিয়া আ-কার কাটা । ৪. চাটিব লিখিযা উপরে ল লেখা । ৫. শা সু. গটই । ৬. টীকানুসারে (পাটকেন) =পাটি । ৭ শা. সু. দিটি ; নী ফিডি । ৮. শুদ্ধপাঠ কোডিঅ ? ফটোচিত্র অস্পষ্ট । ৯ শা নিযড্ডি । ১০-১০ শা. পুচ্ছতু ।

অ ন্ব য় : ভবনদী গহনগম্ভীর বেগে প্রবাহিত । দুইতীর চিখিল (কর্দমাক্ত) মাঝে থই নাই । ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো গড়ে (=নির্মাণ করে) । পারগামী লোকেরা নির্ভরে তরিযা যায় (=পার হয) । মোহতরু ফাড়া হইল, পাটের সহিত জোড়া হইল, অদ্বয-[জ্ঞানরূপ] দৃঢ টাঙ্গী [দ্বারা] নির্বাণ [পথে প্রেরণের নিমিত্ত দৃঢ] করা হইল । সাঁকোতে চড়িলে দক্ষিণবাম হইও না । নিকটেই বোধি, দূরে যাইও না । যদি তোমরা সকলে পারগামী হইবে [তবে] অনুত্তর-স্বামী চাটিলকে জিজ্ঞাসা কর ।

টী কা টি প্প নী : ভবণই বাহী=ভবসংসারকে নদীর সহিত তুলনায় বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদের আভাস পাওযা যায । বৌদ্ধদর্শনে কোন কিছুর স্থায়ী অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না । সমস্ত কিছুই প্রতিমুহূর্তে প্রতি অংশে পরিবর্তিত হইতেছে । নদী প্রবাহে প্রতিটি জলকণা একে অন্য হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল , তবুও নিযত পরিবর্তনশীল সেই জলকণাসমূহের প্রবাহে যেমন নদীর ধারণার উৎপত্তি, সেইরূপ নিযত পরিবর্তনশীল স্বতন্ত্র ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহে ভবের অস্তিত্ববোধ জাগ্রত । ভবণই <ভবনদী । বেগেঁ<বেগেন (তৃতীয়া) ; সবেগে । বাহী=বাহিত । দুআন্তে · থাহী=বুদ্ধদেব দুই চরম পন্থা অর্থাৎ চরম ভোগ ও পরম কৃচ্ছ্র সাধনের পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ইহাই বৌদ্ধদর্শনে 'মধ্যমা প্রতিপদ' নামে পরিচিত । পংক্তিটিতে ইহারই ইঙ্গিত । দুআন্তে=দুই তীরে । চিখিল=কর্দমাক্ত ; <(অপভ্রংশ) চিখিল্ল । থাহী=থই । *স্থাঘিক>থাহিঅ>থাহী । ধামার্থে<ধর্মার্থে । সাঙ্কম=সাঁকো, <সঙ্ক্রম । গঢ়ই=গড়ে ; <গঠতি, *গ্রথতি । নিভর< নির্ভর । তরই=পার হয় , <তরতি । তান্ত্রিক পদ্ধতির দিক দিয়া ভবনদী দেহমধ্যস্থিত নাড়ীগুলি সম্পর্কে উক্ত বলিয়া মনে হয় । দুই তীর কর্দমাক্ত অর্থাৎ বাম দক্ষিণের দুইতীর বিষয়াসক্তির দিকে লইয়া যায় । মধ্যপথ অর্থাৎ পরম সত্যের স্বরূপ গভীর । ইড়া ও পিঙ্গলাকে মধ্যপথ সুষুম্নাতে চালিত করার তান্ত্রিক পদ্ধতির ইঙ্গিত । সাঁকো সংবৃতি ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের মিলনসেতু ; অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত হইতে পারমার্থিক বোধিচিত্তে গমনের উপায় । ফিড্ডআ=ফাড়া হইল<স্ফাটিত । পটি=পাটি=পাট, পীঠ ; পারমার্থিক

বোধিচিত্ত। পট্টিক >পাটিঅ>পাটি। জোড়িঅ=জোড়া হইল। যুক্ত অর্থে প্রাকৃতে উদ্ভূত √জোড়=ইত (=ক্ত)=জোড়িত>জোড়িঅ। আদঅ=অদ্বয়; আদিতে 'অ' স্থানে 'আ' আদিস্বরে প্রস্বরের (Stres accent-এর) ফল বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইহার প্রাচুর্য। দিঢ়ি=দৃঢ়; স্ত্রীলিঙ্গ। টাঙ্গীব বিশেষণ, তাই লিঙ্গ-সৌষম্যে দিঢ়ি স্ত্রীলিঙ্গ। এইরূপ লিঙ্গ-সৌষম্য চর্যার যুগে প্রচুর লক্ষণীয়। আদঅ দিঢ়ি টাঙ্গী=অদ্বয়রূপ দৃঢ় কুঠার। শূন্যতা ও করুণা, প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থা, যুগনদ্ধ (=শিবশক্তির মিলিতাবস্থা)-রূপ কুঠারের দ্বারা। নিবাণে<নির্বাণে। কোহিঅ=কোড়িঅ=দৃঢ় করিও (?), <কুটিত। সাঙ্কমত=সাঁকোতে। 'ত' (৭মী) ৩ সং চর্যার দুয়ারত টীকা দ্র.। চড়িলে=ইলে যুক্ত অসমাপিকা। দাহিণ…হোহী=দক্ষিণ ও বাম দিকের ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে সুষুম্নাপথে চালিত করিয়া ও দক্ষিণবাম ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ সম্পর্কে সচেতন হও। তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত। হোহী=হইও. <*ভবহি। নিঅড্ডী=নিকটে; বোহি=বোধি। ম=<মা; না। জাহী=যাইও;< যাহি। নিয়ড্ডি…জাহী—সিদ্ধি সহজলভ্য; জটিল পন্থা পরিত্যাজ্য। জই<যদি। তুম্হে=তোমরা। *তুষ্মাভিঃ (=যুষ্মাভিঃ)>তুম্হহি>তুম্হে। মূলত ৩য়া ও বহুবচন হইলেও প্রাচীন যুগ হইতেই ১মার একবচনে ব্যবহৃত; তু° আম্হে। লোঅ=লোক; বহুবচন জ্ঞাপক। হোইব=হইবে, <ভবিতব্য। পুচ্ছতু=জিজ্ঞাসা কর। পুচ্ছ (<পৃচ্ছ)+তু (বা অতু); মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞা। চর্যায় তু বা অতু যুক্ত না করিয়াই মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞার ব্যবহার লক্ষ করা যায় যেমন, পুচ্ছ, বাহ ইত্যাদি। সংস্কৃতে তু প্রথমপুরুষ অনুজ্ঞায় প্রযুক্ত। 'তু' অর্থে তুমিও হইতে পারে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে পদবিভাগ হইবে পুচ্ছ তু এবং পংক্তিটির অর্থ হইবে জিজ্ঞাসা কর তুমি চাটিল, অনুত্তর স্বামীকে। সম্ভবত চর্যার যুগে তু=তুমি এবং প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'তু' মিলিয়া মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার বিভক্তি 'তু'-এর সৃষ্টি করিয়াছিল। টীকায় পৃচ্ছথ আছে এবং তদনুযায়ী বাগচী পুচ্ছহ পাঠের পক্ষপাতী। অনুত্তরসামী=শ্রেষ্ঠ সাঁই বা গুরু। গুরুবাদের ইঙ্গিত। কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য চর্যায় নদীর চিত্রকল্প, সাঁকো নির্মাণ ও সাঁকো পারাপারের রূপকে তান্ত্রিক পদ্ধতি ও গুরুর উপদেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গীতিটির প্রথম দুটি ছত্রে বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত থাকিলেও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনাই ইহাতে মুখ্য। দুই নাড়ীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্যপথের দ্বারা মহাসুখ লাভের বর্ণনাই গীতিটির ব্যঞ্জনা।

বহির্জগতের পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই। ভবপ্রবাহ প্রাতিভাসিক। নিয়ত বিষয়তরঙ্গের উত্থান-পতনে এই প্রবাহ গহন এবং বিবিধ দোষ সংস্পর্শে ইহা গভীর। এই ভবপ্রবাহ পারাপারের জন্য অর্থাৎ ইহার কবল হইতে মুক্ত হইবার

জন্য বিষয়াসক্তির দুই তীর পরিত্যাগ করিষা অতল মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইবে। বাম দক্ষিণ দুই দিকের দুই নাড়ীকে মধ্যপথে চালিত করিতে হইবে। সংবৃতি বোধিচিত্ত হইতে পারমার্থিক বোধিচিত্তে গমনের জন্য চাটিল সাঁকো প্রস্তুত করিয়াছেন। অর্থাৎ গুরু চাটিলের উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া সংবৃতি বোধিচিত্তকে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত কবা যাইবে। পার গমনেচ্ছু সাধকেরা সেইভাবেই পারে যাইতেছেন। অদ্বয়জ্ঞানের দৃঢ় কুঠার দ্বারা মোহতরু ছেদন করিষা পারমার্থিক বোধিচিত্তের সহিত সংযুক্ত করিষা সেতুকে 'নির্বাণ' করা হইয়াছে। (সেতুই নির্বাণ, সিদ্ধিস্বরূপ।) সাধনায় সিদ্ধিলাভ দুরূহ নহে। দেহের ভিতরই সিদ্ধি। জটিল আচার-অনুষ্ঠানের পন্থার প্রয়োজন নাই। আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের প্রতি বিরূপতা ও শেষ দুই পংক্তিতে গুরুর উপর নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

দ্র. গীতিটিতে কোন স্পষ্ট ভণিতা নাই। পদমধ্যস্থ চাটিল পদকর্তা বলিয়া অনুমিত।

৬

বাগ পটমঞ্জবী ভুসুকু পাদানাং ॥

কাহেরি১ ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল২ হাক৩ পড়অ চৌদীস ।। ধ্রু ।।
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাডঅ ভু[সু]ক৪ অহেরী ।। ধ্রু।।
তিণ ন৫ চ্ছুপই৬ হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ন জাণী ।।ধ্রু ।।
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো ।। ধ্রু ।।
তরগঁন্তে৭ হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া৮ হিঅহি৯ ণ পইসঙ্গই১০ ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ১১ক]

পা. ১. ব্যাকরণের দিক দিয়া সন্দেহজনক হইলেও পুথিতে স্পষ্ট কাহেরি। টীকা কাহের। শুদ্ধপাঠ কাহেরে। ২. শা. সু. বেটিল। ৩. সু. ডাক। ৪. পুথি ভুকু। ৫. সু. ন বাদ দিয়াছেন। ৬. নী. ছুপই। ৭. শা. তরঙ্গন্তে; সু. তরসঁন্তে। এখানে লিপিতে কিছু অস্পষ্টতা আ আধুনিক সঁ-এর মত লিখিত। টীকা তরংগতে। ৮. শা. হিঅ হি। ১০. পুথিতে পয়ইসঙ্গ লিখিষা য় কাটা।

অ ন্ব য় : কাহাকে লইয়া কাহাকে ছাড়িয়া আছ কিসে। [বৃত্তি অনুসারে আছি কিসে। চৌদিক বেড়িয়া হাক পড়িল। আপনার মাংসে হরিণ বৈরী। ভুসুকু আখেটি ক্ষণমাত্র ছাড়ে না। হরিণ তৃণ স্পর্শ করে না, জল পান করে না। হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না। হরিণী হরিণকে বলে, শুন হরণকারী (হরিণ) তুমি, এ বন ছাড়িয়া হও ভ্রান্ত (ভ্রমণশীল)। তরঙ্গতে (ত্বরিত গমনে) হরিণের ক্ষুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে [এই তত্ত্ব] মূঢ়ের হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

টী কা টি প্প নী : কাহৈরি = কাহাকে। চর্যায় সর্বনামের ক্ষেত্রে রি সম্বন্ধপদের এবং রে কর্মকারকের বিভক্তি। কর্ম-সম্প্রদানে 'রে' বিভক্তি প্রাচীন রীতি। বর্তমানে 'রে' কেবল বঙ্গালীতে ব্যবহৃত। চর্যাতে রে-যুক্ত পদেরই প্রাচুর্য। কস্য > কাহ + ঐরি (= এরে, ঐরে কর্ম)। 'হৈ' যুক্ত সর্বনাম চর্যায় সুলভ নহে ; 'হো' বা 'হে' যুক্ত পদই পাওয়া যায়,— তোহোর, মোহেরা ইত্যাদি। ঘিণি = গ্রহণ করিয়া ; *গৃহ্লীত্বা = (গৃহীত্বা) > ঘিণিঅ > ঘিণি, ঘেণি। মেলি = ছাড়িয়া, পরিত্যাগ করিয়া। অপভ্রংশে ত্যাগ করা অর্থে √মেল্-এর প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় ছাড়িয়া যাওয়া বা বিদায় অর্থে মেলানি শব্দের প্রয়োগ আছে। 'মেলি'র ব্যুৎপত্তি *মেলিত্বা > মেলিঅ > মেলি। অচ্ছহু = আছো, বৃত্তি অনুসারে, আছি। সে ক্ষেত্রে শুদ্ধপাঠ হওয়া উচিত অচ্ছহুঁ। বাংলায় √আছ্-এর উদ্ভব √অস্ হইতে ধরা উচিত নহে। বৈদিক যুগেই অস্ত্যর্থক ধাতু হিসাবে 'অস্তি'র পাশাপাশি 'অচ্ছতি' রূপ পাওয়া যায়। সুতরাং √অচ্ছ হইতেই বাংলা √আছ্ এর উদ্ভব ধরা উচিত। অচ্ছ + হু (বর্তমান কাল, মধ্যম পুরুষে) ; অচ্ছহুঁ পাঠ ধরিলে—অচ্ছ + হুঁ (বর্তমান কাল, উত্তম পুরুষ)। কীস = কি করিয়া, কিসে। < *কিস্য = কস্য। বেঢ়িল = বেষ্টিত + ইল্ল > বেড্ঢিল > বেঢ়িল (বিণ্)। -ইল যুক্ত অতীত কালের রূপ বিশেষণে প্রযুক্ত। ভাষার প্রাচীনতার লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এমন প্রয়োগ প্রচুর। হাক < প্রা. হক্ক। পড়অ = পড়ে ; পততি > পড়ই > পড়অ ; চৌদীস < চতুর্দিশ। অপণা = নিজের ; *আত্মনস্য = আত্মনঃ > অপ্পণাহ > অপণা। মাংসেঁ = মাংস + এঁ (< এন, ত্বা) হরিণা = হরিণ (পুং) ; < হরিণকঃ। কর্তৃকারকে পুংলিঙ্গে 'আ' বিভক্তি লক্ষণীয়। আ—ক্ষুদ্রার্থ বা স্বার্থিক ; কঃ হইতে আগত। আধুনিক কালে কদাচিত এইরূপ পাওয়া যায় যেমন হাঁসা, হাঁসী = হংস, হংসী। খনহ = ক্ষণমাত্র ; < ক্ষণস্য। ছাড়অ = ছাড়ে ; < ছর্দতি। অহেরি = শিকারী ; আখেটিক > আহেড়িঅ > আহেরী > আহেরি > অহেরি। তিন < তৃণ। চ্ছুপই = স্পর্শ করে। ক্ষুভ্যতি > চ্ছুবই > চ্ছুপই। প্রাকৃতে কয়েকটি নূতন ধাতুর উদ্ভব ঘটিয়াছিল ; স্পর্শ অর্থে √ক্ষুভ্ তাহার অন্যতম (দ্র. ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৭১, ১১শ সং)। পিবই < পিবতি। পাণী < পাণীয়। তৃণ ও পাণীয় = বিষয়াসক্তি। জাণী < জানিত। হরিণা……

জাণী = চিত্তহরিণ এখনও নৈরাত্মা হরিণীব উদ্দেশ জানে না। অর্থাৎ মুক্তির সন্ধান জানে না। বোলঅ = বলে ; বদতি > বোলই > বোলঅ। হরিআ = হরণকারী। হরিক > হরিঅ > হরিআ। বিষয় সুখাদি নিজের নহে তবু তাহা ভোগ করে এই অর্থে। বণ = বিষযাসক্তিরূপ বন। ছাড়ী = ছাড়িযা (অসমা.) ; ছর্দিত্বা > ছাড্ডিঅ > চ্ছাড়ী। হোহু = হও ; < ভবথঃ। ভান্ত = দূরগত ; < *ভ্রমন্ত (?)। তরগঁন্তে = শীঘ্র যাওয়াতে ; < ত্বরংগতে। খুব = < ক্ষুর ; চিত্তের সাংবৃতিক রূপ। দীসঅ -- দেখায় ; দৃশ্যতে < দিস্‌সই > দীসই > দীসঅ। মূঢ়া > মূঢ়স্য। হিঅহি = হৃদয়ে। হৃদয় > হিঅঅ > হিঅ + হি (৭মী)। পইসঈ = প্রবেশ করে, < প্রবিশতি, অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য পইসঅ হইতে পারে।

ব্যা খ্যা সং কে ত : গীতিটিতে হরিণ শিকারের রূপকে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চর্যাগীতির দার্শনিকতার ভাববাদী স্বরূপ বা Idealism-এর প্রকাশও এখানে লক্ষণীয়। চঞ্চল বা সংবৃতি বোধিচিত্ত এখানে হরিণ এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তহরিণী রূপে কল্পিত। চিত্ত যখন পরিত্যাজ্য বিষয়াসক্তি ও প্রাতিভাসিক জ্ঞানকে আঁকড়াইযা ধরিযা থাকে তখনই চতুর্দিক হইতে বিপদের বেড়াজাল তাহাকে আক্রমণ করে। হরিণ নিজের মাংসেই নিজের বৈরী, অর্থাৎ নিজেই সে চিত্তকে অবিদ্যাচ্ছন্ন করে। ভুসুকু (পদকর্তা) ক্ষণমাত্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গুরুর উপদেশরূপ বাণ দ্বারা চিত্তকে প্রহার করেন। ইহার ফলে চিত্ত জাগ্রত হয, (পানাহার —) বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তকে (হরিণীকে) লাভ করিবার জন্য তখন সে ব্যাকুল হয। কিন্তু এখনও সে তাহার সন্ধান জানে না। নৈরাত্মারূপী হরিণীর বাণী এখন শোনা যায়, —সে বাণী ভবমোহ পরিত্যাগ করিযা দূরে যাইবার বাণী,—'এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্ত।' এই আহ্বান বাণী শুনিযা তীব্র গতিতে হরিণ মহাসুখ লাভের পথে যাত্রা করে। তখন তাহার আর ক্ষুর অর্থাৎ চিত্তের সাংবৃতিক রূপ পরিদৃশ্য হয় না। ভুসুকু বলেন, যাহারা মোহমগ্ন তাহাদের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে না।

৭

রাগ পটমঞ্জরী কাহ্ন১ পাদানাং ॥

অলিএঁ২ কালিএঁ বাট৩ রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন৪ বিমন ভইলা ॥ধ্রু॥
কাহ্ন৫ কহিঁ৬ গই করিব নিবাস।
জো মণ৭ গোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তে তিনি তে তিনি৮ তিনি হো ভিন্না৮।

ভণই কাহ্নু[৯] ভব পরিচ্ছিন্না ॥ ধ্রু ॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু[১০] বিমণ[১১] ভইলা[১২] ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি ণিঅড়ী[১৩] জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্নু[১৪] মো হিঅহি[১৫] ন পইসই ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ১২খ]

পা. ১-৪, ৫. ৯. ১০, ১৪. শা কাহ্নু। ২. টী. আলি। ৩. স্নু. বাটা; বাটার পর একটু ফাঁক দিয়া এ-কার এবং আ-কার-এর মাঝামাঝি একটি চিহ্ন আছে। ৬. পুথি কহিঁর। র অনাবশ্যক মনে হয়। ৭. শা. মন। ৮-৮ মূলে তিনি হো ভিন্না থাকিলেও টীকা ও অর্থানুসারে তিনি অভিন্না পাঠ সঙ্গত মনে হয়। গানের শ্রোতরূপ 'তিনি অভিন্না' সুরের টানে 'তিনি হো ভিন্না' হইয়াছে এবং লিখিত রূপেও তাহাই হইয়াছে। ১১. শা. স্নু. নী. বিমন। ১২. পুথি ভইঈলা। ১৩. শা নিঅড়ি। ১৫. শা. সোহিঅহি।

অ ন্ব য়ঃ আলি কালিতে বাট (পথ) রুধিল। তাহা দেখিয়া কাহ্নু বিমন হইল। কাহ্নু কোথায় গিয়া করিবে নিবাস? যে মনগোচর, সে উদাস। তাহারা তিন, তাহারা তিন, তিনই ভিন্ন (অথবা বৃত্তি অনুসারে, তিনই অভিন্ন)। কাহ্নু বলেন, ভব [সংসার] পরিচ্ছিন্ন [রূপে প্রতিভাত হয়]। যাহারা যাহারা আসিল তাহারা তাহারা গেল। আনাগোনায় কাহ্নু বিমন (বিশুদ্ধ মন) হইল। দেখিয়া সেই কাহ্নি [বলেন] জিনপুর নিকটেই বটে (রহিয়াছে)। কাহ্নু বলেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

টী কা টি প্প নী : আলি কালি = ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের বৌদ্ধ তান্ত্রিক নামান্তর। এঁ <এন, (এয়া); আলি কালি দ্বারা। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা ধর্মমত অধ্যায়ে দ্র.)। বাট — পথ; বর্ত্ম। রুন্ধেলা + রুদ্ধ করা হইল; *রুন্ধিত = (রুদ্ধ, √ রুধ্ + ক্ত) + ইল্ল + আ। তা = তাহা; তস্য > তাহ > তা। দেখি = দেখিয়া; *দৃক্ষিত্বা (= দৃষ্ট্বা) > দেক্খিঅ > দেখি। বিমন = বিশুদ্ধ মন, দুঃখিত (?)। ভইলা = হইল; <*ভবিত (= ভূত) + ইল্ল + আ (সম্ভ্রমার্থে)। কহিঁ = কোথায়। <*কধি অথবা কস্মিন > কসসিং > কহিং > কহিঁ। গই = যাইয়া; <*গমিত্বা = (গত্বা)। করিব = করিবে; *করিতব্য = (কর্তব্য) > করিঅব্ব > করিব। ভবিষ্যৎকালে মধ্যমপুরুষে —ইব, প্রাচীনতার লক্ষণ। জো = যাহা; <যঃ। মনগোঅর = <মনগোচর। সো = তাহা; <সঃ। উআস <উদাস। তে = তাহারা; <তে। তিনি = তিন; ত্রীণি > তিন্নি > তীনি > তিনি। হো — নিশ্চয়ার্থক। যে = যাহারা; <যে। আইলা = আসিল; আয়াত > আআঅ > আঅ + ইল্ল + আ। গেলা <গত + ইল্ল + আ। অবণাগবণে = আনাগোনায়, আসা যাওয়াতে; <অয়নক গমনক। নিঅড়ী = নিকটে;

নিকট>নিঅড়+ঈ (৭মী)। জিনউর = জিনপুর, মহাসুখভূমি। বট্টই = আছে; <বর্ত্ততে। হিঅহি পইসই—৬সং চর্যা দ্র.।

ব্যাখ্যা সংকেত: গীতিটির প্রথম দুই পংক্তির ব্যাখ্যা দুইভাবে করা যায়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়া ইহার অর্থ, আলিকালি দ্বারা (দ্বৈতজ্ঞান দ্বারা) পথ (পরমার্থের পথ, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পথ) রুদ্ধ হইল। সাধন পদ্ধতির দিক দিয়া ইহার অর্থ, আলিকালি দ্বারা পথ রুদ্ধ করা হইল অর্থাৎ আলিকালিকে একীকৃত করিয়া অবধূতি পথ দৃঢ় করা হইল। অবধূতির বহির্গমন পথ রুদ্ধ দেখিয়া কাহ্ন বিমন, বিশুদ্ধমন হইলেন। চর্যাগীতিতে আলিকালি মূলত ইড়া পিঙ্গলার নামান্তর। গীতিটির পরবর্তী অংশে দার্শনিকতার দিকে ঝোঁক বেশি। সেইদিক দিয়া এবং বৃত্তি অনুসারে প্রথম ব্যাখ্যাটি বেশি সমীচীন মনে হয়। কাহ্ন নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কোথায় যাইয়া বাস করিবে? অর্থাৎ মন বিশুদ্ধতায় প্রতিষ্ঠিত হইলে কোথাও যাইবার প্রয়োজন হয় না। যে যোগী মনগোচর অর্থাৎ জ্ঞান মার্গ (যুক্তি তর্ক ইত্যাদির) উপর নির্ভরশীল সে সত্যপথ সম্পর্কে উদাস, অজ্ঞ। যাহারা তিন বা বহুরূপে প্রতিভাত তাহারা বস্তুত অভিন্ন। একটি মিথ্যা অস্তিত্ববোধ দ্বারা আমরা সকলকে পৃথক বা পরিচ্ছিন্ন দেখিতেছি। এই ভবসংসারের অস্তিত্ব সংবৃত্তি সত্য মাত্র। কিছুই এখানে স্থায়ী নহে। যাহারা আসে তাহারাই যায়। মূলত কিছুই সত্য নহে। আসাটাও নহে যাওয়াটাও নহে। এই সমস্ত জানিয়া কাহ্নু পরিশুদ্ধমন হইলেন। তখন কাহ্নু বুঝিলেন জিনপুর (মহাসুখভূমি) দূরে নহে। কিন্তু তাহা এখনও হৃদযে প্রবেশ করে নাই।

আলোচ্য চর্যায় সত্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চিত্ত সাংবৃতিক ও পারমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ। চিত্তের এই দ্বৈবিধ্য অনুসারে আপাতদৃষ্টিতে সত্যও দ্বিবিধ। মায়াচ্ছন্ন চিত্তে মিথ্যাই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। জগৎসংসার তখন বহুধা বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্নরূপে দেখা দেয়। কিন্তু পরমার্থবিদ যোগীর এই ভেদবুদ্ধি থাকে না। ভেদবুদ্ধিহীন যোগীর হৃদয়েই মহাসুখধামের উপলব্ধি ঘটে।

৮

রাগ দেবক্রী কম্বলাম্বর পাদানাং।

সোনে ভরিতী১ করুণা নাবী।
রূপা থোই ২নহি কে২ ঠাবী॥ ধ্রু॥
৩বাহ তু৩ কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বহুড়ই৪ কইসেঁ॥ ধ্রু॥
খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী৫।
৩বাহ তু৩ কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী৬ ॥ ধ্রু ॥

মাঙ্গত চন্হিলে৭ চউদিস৮ চাহঅ ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ।। ধ্রু ।।
বাম দাহিণ চাপী মিলি মিলি মাগা৯ ।
বাটত মিলিল মহাসুহ সঙ্গা১০ ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ১৩খ—১৪ক]

পা. ১. ফটোচিত্র অস্পষ্ট। শা. ভরিতী। শুদ্ধপাঠ ভরিলী? ২-২ পুথি মহিকে। টীকার স্থানভেদং নাস্তি অনুযায়ী নহি পাঠ সম্ভব এবং প্রশস্ত। মহিকে = মহীর; প্রসঙ্গানুসারে অচল নহে। সে ক্ষেত্রে 'কে' হয় ষষ্ঠীর বিভক্তি, যাহা চর্যায় বিরল। চর্যায় ষষ্ঠীতে 'ক' পাওয়া যায়। ৩-৩. শা. বাহতু। ৪. শা. বহুউই। ৫. শা. কাচ্ছি ৬. শা. পুচ্ছি। ৭ শা. চন্হিলে; সু চহ্নিলে। পুথির 'ন্ হ্' যুক্তাক্ষরটি সন্দেহমুক্ত নহে। ৮. পূর্ববর্তী চন্হিলে এবং পরবর্তী চাহঅ পদদুটির 'চ' হইতে চউদিস-এর 'চ' একটু স্বতন্ত্র। মনে হয় লিপিকর প্রথমেই 'উ' লিখিয়া তাকে 'চ'-এ পরিবর্তিত করিয়াছেন। পরে আবার উ লিখিয়াছেন। ৯. পুথিতে মাগা। কিন্তু অন্ত্যমিলের জন্য মাঙ্গা হইতে পারে। দ্র. ৭ম পংক্তির মাঙ্গত। ১০. পুথিতে স্পষ্ট সুঙ্গা। শাস্ত্রীর সংশোধন টীকানুসারে (সংগং) – 'সঙ্গা' সমীচীন। সু. স্বঙ্গা। নী. সুঙ্গা/স্বঙ্গা দুই পড়া যায় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। পুথির উ-কার এবং ব-ফলার মধ্যে সাদৃশ্য সত্ত্বেও পার্থক্যও স্পষ্ট। ব্যঞ্জনের নিচে ব-এর মত একটি ত্রিকোণ চিহ্ন যুক্ত হয় উভয় ক্ষেত্রে। কিন্তু ব-ফলার ত্রিকোণটি ফাঁকা আর উ-কারের ক্ষেত্রে ত্রিকোণটি কালিভরা। অবশ্য পুথিতে আধুনিক উ-কারের মত চিহ্নও (ু) আছে। দ্র. ১৪ক পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তির শেষ 'মু' বর্ণের উ-কার।

অ ন্ব য় : সোনায় ভরিল করুণা নৌকা। রূপা থুই নাহি কোন ঠাঁই। কামলি, গগন উদ্দেশে বাহিয়া চল, [দেখি] গতজন্ম কি করিয়া ঘুরিয়া আসে। খুঁটি উপড়ান হইল, কাছি মেলা হইল। বাহিয়া চল, কামলি, সদ্গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া। মার্গে চড়িলে চতুর্দিকে চাহে (দেখে)। কেড়ুয়াল নাই, কে কি করিয়া বাহিতে পারে। বাম দক্ষিণকে চাপিযা মার্গের (পথের) সঙ্গে মিলাইয়া বাটেই (পথেই) মহাসুখসঙ্গ মিলিল।

টী কা টি প্প নী : সোনে = সোনাদ্বারা অথবা শূন্যতাজ্ঞান দ্বারা। শ্লেষ অলংকার। •একটি অর্থ স্বর্ণ, অন্য শূন্যতা। স্বর্ণ > সোন ; শূন্য > সুন > সোন + এ < এন। ভরিতী = ভরা, পূর্ণ ; *ভরিত = (ভৃত, √ভৃ + ক্ত) + ঈ (স্ত্রী)। লিঙ্গ সৌষম্যের উদাহরণ ; নারী স্ত্রীলিঙ্গ তাই। চর্যাগীতিতে নিষ্ঠান্ত (past participle) বিশেষণগুলি সাধারণত ইল্ল যুক্ত রূপে ব্যবহৃত, যেমন ৪র্থ পংক্তির গেলী। সেই হিসাবে ভরিলী পাঠও সম্ভব। করুণানাবী = করুণারূপ নৌকা ; রূপক অলংকার। < নাবিকা (ক্ষুদ্রার্থে)। রূপা = রৌপ্য অথবা রূপ-চেতনা ;

শ্লেষ অলংকার। থোই = থুই, রাখিতে, <স্থপিতুম্ - স্থাতুম্। কে = কোন, <কঃ। ঠাবী = ঠাইঁ, স্থান>ঠান>ঠাইঁ, ঠাবী। ঠাই>ঠাবী সম্ভবত অন্ত্য-মিলের জন্য অথবা ব-শ্রুতি। বাহতু = বাহিয়া চল, অনুজ্ঞা, দ্র. পুচ্ছতু টীকা ৫ সং চর্যা। গঅন = গগন, তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া মস্তিষ্কস্থ সহস্রার পদ্মে শিবের সহিত মিলিত করিয়া দেওয়াই সাধনার লক্ষ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে অনুরূপভাবে বোধিচিত্তকে মহাসুখ চক্রে প্রেরণই লক্ষ্য। এই মহাসুখ চক্রই গগন। উবেসেঁ = উদ্দেশে, উদ্দেশ উএস>উবেস (বে. শ্রুতি) + এ (অধি)। গেলী<গত + ইল্ল + ঈ (স্ত্রী)। এখানে স্ত্রীলিঙ্গ অপ্রয়োজনীয়, কারণ জাম পুংলিঙ্গ। জাম = জন্ম, জন্ম>জন্‌ম>জাম। বহুড়ই - পুনরাবর্তিত হয়, <ব্যাঘুটতি। কইসেঁ = কেমন করিয়া, <কদৃশন্। খুঁন্টি খুঁটি (দেশী ?)। উপাড়ী = উৎপাটিত করিয়া. উৎপাটযিত্বা>উপ্পাডিঅ>উপাড়ি, উপাড়ী। মেলিলি - মেলা হইল বা ছাড়া হইল। প্রাকৃতে 'মিল্ল' ধাতু মুক্ত করা বা শিথিল করা অর্থে প্রযুক্ত, মিল্ল>মেল। কাচ্ছি = দড়ি, রশি, কক্ষিকা> কচ্ছিআ>কাছি। সদ্গুরু - সদ্গুরুকে। বিভক্তিহীন কম। পুচ্ছি = জিজ্ঞাসা করিয়া, দ্র. পুচ্ছিঅ, ১ম চর্যা। মাঙ্গত - মার্গে, পথে, বিরমানন্দ মার্গে। নৌকার গলুই অর্থে প্রাকৃতে মগ, মঙ্গো. শব্দের ব্যবহার আছে। নৌকার গলুই অর্থেও গ্রহণ করা যায়। মাঙ্গ + ত (৭মী)<ত্র, দ্র. ডুআবত ৩ সং চর্যা। চন্‌হিলে = চড়াহিলে চটিলে - চড়িলে, (অসমা.), অপভ্রংশ ধাতু √চড্ + ইত + ইল্ল + এ। চাহঅ চাহিয়া দেখ চক্ষস্ব>চাহঅ>চাহ, অনুজ্ঞা। কেড়ুয়াল বৈঠা, দাঁড়, কুপীটপাল>কঈডবাল>কেড়ুআল। বাহবকে পারঅ = বাহিতে পারে. পূর্বাপর অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া ইহাই সমীচীন। কিন্তু বাহবকে - বাহবকে - বাহিতে, অর্থাৎ কে-যুক্ত অসমাপিকা। ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করা দুরূহ। বাহিবার জন্য, কে নিমিত্তার্থে, কৃত>কে, হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহাতে অর্থ সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। বাহকে—বাহিবার জন্য। বাহিতব্য> বাহব + কে গৌণকর্ম সম্প্রদানে। পারঅ = পারে, <পারয়তি। বামদাহিণ = বামদক্ষিণের ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়। চাপী = চাপিয়া<চাপয়িত্বা। বাটত = পথে, অবধূতিকা মার্গে। বাট<বর্ত্ম + ত (৭মী) দ্র. ডুআবত (৩ সং চর্যা)। মিলিল <মিলিত + ইল্ল। সঙ্গা = সঙ্গ।

ব্যাখ্যা সংকেত:—গীতিটিতে নৌকা বাহিবার রূপকল্পে তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে। সোনা এবং রূপা শব্দ দুইটি দ্ব্যর্থক। একটি অর্থ সোনা এবং রূপা, অন্য অর্থ শূন্যতা এবং রূপচেতনা অর্থাৎ জগতের মিথ্যা অস্তিত্বের জ্ঞান। সাধারণ অর্থে, সোনায় করুণা-নৌকা পূর্ণ হইল। রূপা রাখিবার স্থান নাই। আধ্যাত্মিক অর্থে, শূন্যতাজ্ঞানের দ্বারা করুণা-নৌকা পূর্ণ হইল, শূন্যতা করুণায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইল, জগৎ সংসারের রূপের, মিথ্যা অস্তিত্বের জ্ঞান দূরীভূত হইল। পদকর্তা

নিজেকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, মহাসুখধামরূপ গগন উদ্দেশে নৌকা চালাও, জন্মান্তরহীন নির্বাণ লাভ হইবে। খুঁটি = আভাস দোষ অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত সৃষ্ট মিথ্যাজ্ঞান। কাছি = শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সূত্র। পদটির ব্যঞ্জনা, জগৎ সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কিত মিথ্যাজ্ঞান এবং শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত বিদ্যাসূত্র মুক্তির প্রতিবন্ধক। শূন্যতা-গগনের উদ্দেশে চিত্ত-নৌকা বাহিতে হইলে ঐ বন্ধনগুলি হইতে চিত্তকে মুক্ত করা প্রয়োজন। পথে চড়িলে, অর্থাৎ সিদ্ধির উদ্দেশে সাধন-পথে যাত্রা করিলে চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। সদ্‌গুরুবচনরূপ হাল না থাকিলে নৌকা বাওয়া যায় না। বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী—ইড়া পিঙ্গলাকে চাপিয়া পথের (মধ্য নাড়ী সুষুম্নার) সহিত মিলাইয়া দিলে গমন পথেই মহাসুখের সঙ্গলাভ হইবে।

গীতিটিতে প্রথম দিকে দার্শনিকতা-ভিত্তিক জগৎ-সংসারের মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া শূন্যতাজ্ঞানে চিত্ত পূর্ণ করার কথা। পরবর্তী অংশে গুরুর উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোধিচিত্তকে মহাসুখচক্রে উত্তীর্ণ করার কথা বলা হইয়াছে।

৯

রাগ মঞ্জরী কাহ্নুপাদানাং।

এবংকার দৃঢ়১ বাখোড় মোড্ডিউ২।
বিবিহ বিআপক বান্ধন তোড়িউ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু৩ বিলসঅ আসবমাতা।
সহজ নলিনীবণ৪ পইসি নিবিতা ॥ ধ্রু ॥
জিম জিম করিণা করিণিরেঁ রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল৫ বরিসঅ ॥ ধ্রু ।
ছড়গই৬ সঅল সহাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ ॥ ধ্রু ॥
দশবল৭ রঅণ হরিঅ দসদিসেঁ৮।
৯বিদ্যাকরি দমকুঁ৯ অকিলেসেঁ১০ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ১৫ ক-খ]

পা. ১. সু. পুথিতে টুট আছে বলে মনে করেন, যদিও তাহার মতে শুদ্ধপাঠ দৃঢ়। ২. অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য মোড়িউ পাঠ সম্ভব। ৩. শা. কাহ্নু। ৪. শা বন। ৫. শা. মঅ গল ৬. টীকা ছড়িগই। ৭. পুথিতে দশবব। সু. দশবর। শা. দশবল। টীকা ও প্রসঙ্গানুসারে দশবল প্রশস্ত। ৮. শা. দশদিসে ৯-৯. পুথির পাঠ মুদ্রিত। লিপিপ্রমাদ অনুমেয়। টীকা ও অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া বিদ্যাকরি স্থলে অবিদ্যাকরি সমীচীন। দমকুঁ-র অর্থ স্পষ্ট নয়, পাঠ সংশয়িত। সু দম জা। ১০. সু. অহিলেসেঁ।

অন্বয়ঃ এ-বংকার [রূপ] দৃঢ় বাখোড় (স্তম্ভ) মর্দিত হইল। বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করা হইল। কাহ্ন আসবমত্ত হইয়া বিলাস করেন, সহজরূপ নলিনী বনে প্রবেশ করিয়া নিবৃত হন। যেমন যেমন করী করিণীকে ঈর্ষা করে (আসক্তি হেতু আক্রমণাত্মক আচরণ করে, মদবর্ষণ করে) তেমনি তথতারূপ মদকল বর্ষিত হয়। সকল ষড়্‌গতি স্বভাবত শুদ্ধ ; ভাবাভাব কেশাগ্রমাত্র (অণুমাত্র) ক্ষুব্ধ (অবিশুদ্ধ) নহে। দশদিক হইতে (অথবা দশদিকে বিস্তৃত) দশবলরত্ন আহরণ করিয়া [অ-] বিদ্যা করীকে দমন কর অক্লেশে।

টীকা টিপ্পনীঃ এ-বং- ইডা ও পিঙ্গলা নাডীদ্বয়ের বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর। এখানে গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ দ্বৈতজ্ঞান। বাখোড়= হাতী বাঁধিবার স্তম্ভ, <বংশখণ্ড (?) ; বা<দ্বা (দুই) + খোড়<প্রাং খোড= স্তম্ভ. আধুনিক বাংলা ও হিন্দীতে খুঁটা (দ্র. চর্যাগীতিকোষ পৃ. ৩০)। মোড্ডিউ (মোড়িউ)=মর্দিত হইল ; <মর্দিত। এবং ··মোড্ডিউ = গ্রাহ্যগ্রাহক ভাবরূপ দ্বৈতজ্ঞানের স্তম্ভ মর্দন করা হইল। বিবিহ=<বিবিধ। বিআপক –<ব্যাপক ; বিপ্রকর্ষ। তোড়িউ= ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল ; ত্রোটিত> তোডিঅ>তোডিউ। বিবিহ·· ·· তোড়িউ =অবধূতি মার্গের বিঘ্ন-স্বরূপ বিবিধ ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করা হইল। বিলসঅ = লীলা করেন ; <বিলসতি। আসব মাতা=<আসব-মত্ত। পইসি – প্রবিষ্ট হইয়া ; প্রবিশ্য>পইসিঅ>পইসি। নিবিতা=নির্বৃতি লাভ করিলেন, নির্বিকল্পাকারে ক্রীড়ামত্ত হইলেন ; <নিবৃত্ত। জিম=যেমন , *যেমন্ত, *যিমন্ত>জেম, জিম। করিণা=হস্তী। করিণিরেঁ–করিণীকে। রিসঅ–মদবর্ষণ করে। শব্দটি ঈর্ষা হইতে উদ্ভূত। টীকায় 'ঈর্ষামদং বহতি'। মদমত্ত করী ও করিণীর মিলনকালে পারস্পরিক ঈর্ষারূপ আসক্তিজনিত আচরণ। তিম=তেমন ; তুং জিম। তথতা – নির্বাণ, পালি. তথত্ত। মঅগল=<মদকল। তথতাজ্ঞানরূপ মদকল। বরিসঅ=বর্ষণ করে , <*বরিষতি (=বর্ষতি) স্বরভক্তি। ছড়গই=ষড়্‌গতি। ষড়্ উপায়ে সৃষ্ট যাবতীয় জীবজগৎ—"অণ্ডজা জরায়ুজা উপপাদুকাঃ স্বংস্বেদজা দেবাসুরাদিপ্রকৃতিকাঃ সর্বেভাবাঃ"—টীকা। সঅল=< সকল। সহাবে=<স্বভাবে। সুধ=<শুদ্ধ। সহাবে সুধ=স্বরূপত পরিশুদ্ধ। ভাবাভাব=অস্তিত্ব অনস্তিত্ব। বলাগ=কেশাগ্র, অণুমাত্র ; <বালাগ্র। ছুধ <ক্ষুব্ধ। ছড়গই···ছুধ=যাবতীয় বস্তু, জীবজগৎ স্বরূপত শুদ্ধ, ভবসংসারের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের জ্ঞানে অণুমাত্র বিভিন্নতা নাই, অণুমাত্র অশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। দশবলরঅণ=দশবলরত্ন, তথতা জ্ঞানরূপরত্ন। হরিঅ=আহরণ করিয়া ; <*হরিত্বা= (হৃত্বা)। দশদিসে—দশদিক হইতে অথবা দশদিক বিস্তৃত। দশদিশ+এঁ (অপাদানে অধিকরণ বিভক্তির প্রয়োগ ; অনুরূপ জামে কাম (২৩) অথাৎ জন্ম হইতে কর্ম।) [অ-] বিদ্যা করি=অবিদ্যারূপ করীকে। দমকু= দমন কর। দমকুঁ অনুজ্ঞা ভাব জ্ঞাপক ; কিন্তু কুঁযুক্ত অনুজ্ঞা ব্যাকরণের দিক

দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। কুঁ কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবে অবিদ্যাকরীর সহিত যুক্ত হইলে সঙ্গতি রক্ষিত হয়। কিন্তু কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবেও কুঁ খুব স্বাভাবিক নহে। চর্যায় একবার মাত্র কুঁ আছে। তাহাকে ৬ষ্ঠী বলাই উচিত। অকিলেসে = অক্লেশে, (স্বরভক্তি)।

ব্যা খ্যা সং কে ত : মত্তহস্তীর রূপকে এখানে তত্ত্বকথা বর্ণিত। গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাবরূপ দুইটি স্তম্ভ এবং নানা প্রকার ব্যাপক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মত্তহস্তীরূপ কাহ্নুপাদ মহাসুখ কমল বনে প্রবেশ করিয়া নির্বৃতি লাভ করেন। করিণীকে দেখিয়া করী যেমন মদকল বর্ষণ করে, কাহ্নুপাদও সেইরূপ নৈরাত্মারূপী করিণীকে দেখিয়া তথতারূপ মদকল বর্ষণ করেন। বিশ্বের সমস্ত কিছুই মূলত পরিশুদ্ধ। আমাদের অবিদ্যাজনিত অভ্যাসবশত বস্তুনিচয়ের তথতাস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং অবিদ্যা করীকে দমন করিতে হইবে। চিত্ত এখানে মত্তহস্তী রূপে কল্পিত। অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত তথতাজ্ঞান ভুলিয়া যায়। সেই চিত্তই নৈরাত্মারূপিণী করিণীর প্রেমে তথতা মদবর্ষণ করে এবং মহাসুখ কমলবনে প্রবেশ করিয়া নির্বৃতি লাভ করে(তু০ ১৬ সং চর্যা)।

১০

রাগ দেশাখ কাহ্নুপাদানাং১।

নগর বাহিরি২ রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
৩ছই ছোই৩ জাহ৪ সো বাহ্ম৫ নাড়িআ॥ ধ্রু॥
আলো৬ ডোম্বি তোএসম করিবেঁ৭ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্নু৮ কাপালি জোই লাগ৯॥ ধ্রু॥
এক সো পদমা চৌসঠ্ঠী১০ পাখুড়ী।
তহিঁ১১ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥ ধ্রু॥
১২হা লো১২ ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
অইসসি১৩ জাসি ডোম্বি ১৪ কাহরি নাবেঁ॥ ধ্রু॥
তান্তি বিকনঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা১৫।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া১৬॥ ধ্রু॥
তু লো ডোম্বী হাউ১৭ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী॥ ধ্রু॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ১৮।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ॥ ধ্রু॥

[পুথির পৃষ্ঠা ১৬ক-খ]

পা০ পুথিতে গীতারম্ভে কবির নাম নাই (তু০ ১,২ চর্যা)। অন্য গীতির

সাদৃশ্যে টীকার 'কৃষ্ণপাদাঃ' হইতে প্রদত্ত। ২. পুথি বারিহি ; স্পষ্ট লিপিবিপর্যয়। টীকায় 'তস্য বাহ্যে' = বাহিরে = বাহিরি। ৩-৩. শুদ্ধপাঠ ছোই ছোই ? ৪. শা. সু. জাই। ৫. সু. 'ব্রাহ্মণ' সংশোধনের পক্ষপাতী। টীকা ব্রহ্মণ। ৬. টীকা অলো। ৭. 'করিব' শুদ্ধপাঠ ? ৮. পুথি কহ্ন ; লিপি প্রমাদ ? ৯. অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য লাঙ্গ সঙ্গত। ১০. সু. চৌসঠী। ১১. সু. তাহঁ (মুদ্রণপ্রমাদ ?)। ১২-১২ সু. আ লো। ১৩ শুদ্ধপাঠ আইসসি (?)। ১৪. লিপিতে ডোম্বি-র ই-কারের সামনের দাঁড়িটি বাদ পড়িয়াছে। নী. ডোম্বী। ১৫. লিপিপ্রমাদ ? টীকায় চাঙ্গিতম = ঝুরি, চাঙ্গাড়ি। অন্ত্যানুপ্রাস, অর্থ এবং শব্দটির আধুনিক রূপের দিক দিয়া 'চঙ্গড়া' বাঞ্ছনীয়। নী. চঙ্গেতা। ১৬. শা. নড়এড়া। সু° নডএত্তা। ১৭. শা. সু. হাডে ; তাহাই সঙ্গত মনে হয়। ১৮. পুথিতে মোলানণ ন কাটা।

অন্বয়ঃ নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোর কুড়ে [ঘর]। ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাও তুমি সেই ব্রাহ্মণ নেড়াকে (চপল/বালক ব্রাহ্মণকে)। ওলো ডোম্বি, তোর সঙ্গে আমি সাঙ্গা করিব। [কারণ] কাপালিক যোগী কাহ্ন নির্ঘৃণ ও উলঙ্গ। এক সেই পদ্ম, চৌষট্টি তাহার পাপড়ি, তাহাতে চড়িয়া নাচে ডোম্বী ও বাপুড়ী। ওলো ডোম্বি তোকে সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আসিস্ যাস্ ডোম্বি, কাহার নায়ে ? তন্ত্রী বিক্রয় করে ডোম্বী, আর না চাঙ্গাড়ি (আর বিক্রয় করিস্ না)। তোর জন্য ছাড়ি নটপেটিকা (নাট্যসজ্জা)। তুই ডোম্বী আর আমি কাপালিক। তোর জন্য আমি হাড়ের মালা গ্রহণ করিলাম (পরিলাম)। সরোবর ভাঙ্গিয়া ডোম্বী খায় মৃণাল। সেই ডোম্বীকে মারি, তাহার প্রাণ লই।

টীকা টিপ্পনীঃ বাহিরি = বাহিরে (৭মী)। রেঁ = সম্বোধনে। নাসিক্যীভবন অকারণ। তোহোরি = তোর। তব > তো + হ (হো, নিশ্চয়ার্থক) = তোহ ; অথবা তুভ্যম্ > তোহ ; *তবস্য > তোহ। তোহ + রি (৬ষ্ঠী, স্ত্রী) ; কুড়িআর সঙ্গে লিঙ্গসৌষম্যে। কুড়িআ = কুড়েঘর ; < কুটিকা। ছোই = ছুইয়া (অসমা) *ক্ষুভিত্বা > ছুইঅ > ছোই ; (দ্র. ছুপই টীকা ৬ চর্যা)। জাহ = যাও, অনুজ্ঞা। পাঠান্তর জাই = যায় ; < যাতি। সো = সেই ; < সঃ। নাড়িআ = নেড়া ; < *নগ্নটিকা ; সদ্য উপবীতধারী ব্রাহ্মণ বালকও নেড়া। সেই দিক দিয়া নেড়া ব্রাহ্মণ = বালক ব্রাহ্মণ। অন্যভাবে, লাড়িক > লাড়িঅ > নাড়িঅ > নাড়িআ। লড় = স্নেহ পদার্থ দ্র. ৪৫ সং চর্যা। ব্রাহ্ম(ণ) নাড়িয়া = বালকের মত চপল চিত্ত ; সংবৃতি বোধিচিত্ত। তোএ = তো < তব + এ (৩য়া)। সম = সহিত। করিবে = করিব ; ৭ সং চর্যা দ্র°। ম = মো < মম, আমি অর্থে। সাঙ্গ = স্বামীস্ত্রীরূপে বাস, সাঙ্গা ; < সঙ্গ। নির্ঘিণ < নির্ঘৃণ। কাপালি = কাপালিক ; টীকার মতে,-'ক' (= মহাসুখ) পালন করেন যিনি তিনি কাপালিক। জোই = < যোগী লাগ = লাঙ্গ = উলঙ্গ ; নগ্ন > নঙ্গ (বিপর্যাস) > লঙ্গ > লাঙ্গ অথবা উলঙ্গ > লঙ্গ

(আদিস্বরলোপ) >লাঙ্গ। পদমা<পদ্ম (বিপ্রকর্ষ)। চৌষঠ্‌ঠি<চতুঃষষ্টি। পাখুড়ী=পাপড়ি ; <পক্ষটিকা অথবা<পংখুড়ি (M.I.A দেশীশব্দ ODBL III 57)। তহি=তাহাতে ; <তস্মিন অথবা<তধি। চড়ি=চড়িয়া, (অসমা) ; <*চড়িত্বা ; অপভ্রংশ √চড়্। নাচঅ=নাচে ; নৃত্যতি>নাচই >নাচঅ। বাপুড়ী=বেচারি, পদকর্তা নিজে · বপ্র> বাপ্+উ=বাপু+টি ; অথবা<*বপ্রপুটিকা : ২০ সং চর্যায় বাপূড়া টীকা দ্র.। হালো=সম্বোধনে। তো=তোকে ; <ত্বাম্। পুছমি=জিজ্ঞাসা করি ; পৃচ্ছামি। অইসসি অইসসি=আসিস, <আবিশসি। জাসি=যাস ; <যাসি। কাহরি=কাহার কস্য—কাহ্+রি (৬ষ্ঠী, স্ত্রী)। নাবেঁ -নৌকায় ; নাব+এঁ (<এন, ৎয়া)। হালো নাবে—ইহার তাৎপর্য, তুমি সংবৃতি বোধি চিত্তরূপ নৌকায় আর যাতায়াত কর না। যদিও জিজ্ঞাসা, তথাপি তাৎপর্যত নঙ্ অর্থক উক্তিই উদ্দিষ্ট। তান্তি=তাঁত ; মিথ্যা মানসসৃষ্ট সূত্রাদি ; <তন্ত্রিকা। বিকণঅ=বিক্রয় করে ; <বিক্রীণাতি। অবর=<অপর। চঙ্গতা=ঝুড়ি, চাঙ্গারি, প্রাকৃতে চঙ্গবের কাষ্ঠপাত্র। অবধীতে চঙ্গই, চঙ্গবা শব্দদুটি অনুরূপ অর্থে পাওয়া যায়। বাংলায় ঝুড়ি অর্থে চাঙ্গাড়ি বা চাঙ্গারি-র ব্যবহার আছে। নেপালীতে ঝুড়ি অর্থে চনেরা বা চঁগেরা শব্দের ব্যবহার আছে। তাত্ত্বিক অর্থ—বিষয়াভাসরূপ ঝুড়ি। তোহোর=তোর ; দ্র. তোহোরি ১ম পংক্তি। অন্তরে=তরে, (অনুসর্গ)। ছাড়ি—ছর্দিত>ছড্ডিঅ>ছাড়ি। নড়এড়া= সাজ-পোষাকের বাকস <নটপেটক। তান্তি · নড়এড়া –পদকর্তা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাই ডোম্বী, যিনি অবিদ্যারূপ তন্ত্রী এবং বিষয়াভাসরূপ ঝুড়ি বিক্রয় করেন, তিনি আর পদকর্তার (কাহ্নের) নিকট তাহা করেন না। পদকর্তা জগৎ সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাই তিনি মিথ্যা অভিনয়ের নট-পেটিকা পরিত্যাগ করিযাছেন। তু= তুমি, তুই, ত্বম্>তুঅং>তু। হাউ=হাউঁ- আমি ; অহম্>অহকম্=হকম্=হউ, হাউ। ঘলিলি=গ্রহণ করিয়াছি। প্রাকৃতে গ্রহণ করা অর্থে √ঘে-র ব্যবহার আছে। ঘলিল শব্দটি উক্ত ধাতু হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব ; অথবা=গৃহ্লীত (-গৃহীত)+ইল্লা=ই (উত্তম পুরুষ)। হাড়েরি= হাড়ের ; হাড়+এর (৬ষ্ঠী)+ই (স্ত্রী), মালীর সহিত লিঙ্গসৌষম্যে। মালী =মালিকা। সরবর=দেহরূপ সরোবর। ভাঞ্জীঅ=ভাঙ্গিয়া (অসমা) : - ভঞ্জিত্বা (=ভঙ্‌ক্ত্বা)। খাঅ=খাদ্যতে=খাদ্যতি। মোলাণ=মৃণাল= মেণাল=মোলাণ (বিপর্যাস)। মারমি=মারয়ামি। লেমি=নয়ামি। পরাণ =প্রাণ (স্বরভক্তি)।

ব্যাখ্যা সংকেত: গীতিটিতে যে রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে তৎকালীন জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকের কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ডোম, শবর ইত্যাদি নিম্নজাতীয় লোকদের বাসস্থান ছিল গ্রামের বা নগরের বাহিরে,

উচ্চ শ্রেণীব লোকদের স্পর্শ বাঁচাইয়া। সেযুগের সমাজ-জীবনেব অস্পৃশ্যতার স্পষ্ট ইঙ্গিত। এইরূপ ইঙ্গিত অন্য চর্যাতেও আছে (২৮)। অথচ ডোম্বী, শববীদেব সঙ্গে উচ্চ জাতের লোকদেব অবৈধ সম্পর্কও যে ছিল তাহাবও ইঙ্গিত গীতিটিতে স্পষ্ট। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, কাহ্নপাদেব কয়েকটি গীতে ডোম্বীব সহিত মিলনেব কথা ব্যক্ত হইযাছে। তুং ১৮, ১৯ সং চর্যা। তৎকালীন জীবনযাত্রায ব্যসন হিসাবে নৃত্যের প্রচলন নাটুয়া বৃত্তি এবং সাজ-পোষাক পবিয়া নাট্যাভিনয এবং ডোম প্রভৃতি জাতিব জীবিকা হিসাবে তাঁত ও ঝুড়ি বিক্রয কবিবাব কথাও জানা যায়।

তাত্ত্বিক দিকে গীতিটিতে সহজ সিদ্ধিলাভেব কথা বর্ণিত। কাপালিক যোগী ও ডোম্বীব মিলনেব রূপকেব অন্তবালে সংবৃতি বোধিচিত্তকে প্রকৃতি প্রভাস্ববতায উন্নীত কবার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। পাবিভাষিক বা সন্ধ্যাশব্দগুলিব তাত্ত্বিক অর্থ ব্যাখ্যা কবিলেই গীতিটিব মূলতত্ত্ব সহজভাবে বোঝা যায। আলোচ্য চর্যায ব্যবহৃত সেই শব্দগুলিব বিশেষ অর্থ নিম্নোক্ত প্রকাব

নগব — রূপচেতনা বা বিষযাসক্তি। রূপচেতনা বা বিষযাসক্তিই সংবৃতি বোধিচিত্তেব আশ্রয, তাই ইহা নগব রূপে কল্পিত। ডোম্বী চিত্তেব প্রকৃতি-প্রভাস্বব অবস্থা। চযাগীতিগুলিতে ডোম্বী, শববী ইত্যাদি শব্দগুলি যদিও প্রজ্ঞা ও উপাযকে অবধূতিমার্গে মিলিত কবিবাব ফলে মণিমূলে জাগ্রত শক্তিব অপর নাম রূপে ব্যবহৃত তবুও এইগুলি আবাব বিবৃত বোধিচিত্তকেও বোঝায। অর্থাৎ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজ্ঞা ও উপাযেব মিলন এবং তদ্গত প্রজ্ঞা ও উপাযেব অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা একাকাব হইযা গিযাছে। ডোম্বী অনেক সময সংবৃতি বোধি-চিত্তকেও বোঝায। আলোচ্য কবিতায শেষ দিকে ডোম্বী সংবৃতি বোধিচিত্ত রূপে কল্পিত। টীকাতেও তাই আছে 'ডোম্বিনী দ্বিধাভেদমাহ'। ব্রাহ্মণ নাড়িযা — সংবৃতি বোধিচিত্ত। পদমা (পদ্ম) — নির্মাণচক্রস্থিত চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্ম, যেখানে প্রজ্ঞা ও উপাযেব (পুরুষ ও প্রকৃতিব) প্রথম মিলন। বাপুড়ী — উপায, পুরুষ। নাব = সংবৃতি বোধিচিত্তরূপ নৌকা। তান্তি = মিথ্যা মানসসৃষ্ট জ্ঞানসূত্রাদি। চঙ্গড়া = বিষযাসক্তিরূপ চাঙ্গাড়ি। নডএড়া মিথ্যা অভিনযেব বা অবিদ্যাসঞ্জাত জ্ঞানেব পেটিকা, সংসাবাসক্তি। সবরব দেহরূপ সবোবব। মোলাণ বোধি-চিত্তরূপ মৃণাল।

পবিশুদ্ধ অবধূতিকা ডোম্বী রূপাদি বিষযসমূহ-রূপ নগরেব বাহিবে বাস কবেন। তিনি সাধারণ ইন্দ্রিয়াদিব বোধের অগম্য। তাই তাঁহাকে অস্পৃশ্য বলা হইয়াছে এবং যেন সেই জন্যই তিনি নগব হইতে দূরে বাস কবেন। তিনি মাঝে মাঝে সংবৃতি বোধিচিত্তকে স্পর্শ করিয়া যান অর্থাৎ সিদ্ধিব পথে আহ্বান করেন। (তুং ৬ সং চর্যায় নৈরাত্মারূপিণী হবিণী হরিণরূপ বোধিচিত্তকে বিষয়াসক্তিব জীবনেব বিপদ সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিযা অন্য বনে চলিয়া যাইবার উপদেশ

দিযাছেন।) পদকর্তা কাহ্ন কাপালিক যোগী ; তিনি নির্ঘৃণ, উলঙ্গ অর্থাৎ লজ্জা ঘৃণার অতীত। তাই তিনি ডোম্বীর সঙ্গলাভে উৎসুক। তিনি ডোম্বীর সহিত চৌষট্টি দলযুক্ত পদ্মে একসঙ্গে নাচিতে পারেন। ডোম্বীর সহিত মিলনের অর্থ তান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রজ্ঞা ও উপাযের মিলন। কিন্তু আলোচ্য কবিতায মিলনের যে-ধরনেব বর্ণনা লক্ষ্য কবা যায তাহাতে মনে হয দেহমধ্যস্থিত শক্তি ক্রমে বাহ্যিক বক্তমাংসেব দেহধারী সাধন-সঙ্গিনীতে পরিণত হইযাছেন। ডোম্বী সম্ভবত সাধন-সঙ্গিনী। ডোম্বীকে জিজ্ঞাসা কবা হইতেছে, তুমি কাহার নৌকায যাতাযাত কর? অর্থাৎ তুমি আর সংবৃতি বোধিচিত্তরূপ নৌকায় যাতায়াত কব না। ডোম্বী আর তাঁত (মিথ্যা জ্ঞানসূত্র) এবং চাঙ্গাড়ি (বিষযাসক্তি) বিক্রয করে না। ডোম্বী পবিশুদ্ধ চিত্ত, তাই তাহার সহিত সাধন-পথের ঐ বিঘ্নগুলির কোন সম্পর্ক নাই। পদকর্তা সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি করিযাছেন তাই তিনি পৃথিবীর সহিত তাঁহাব অভিনযেব-মত-মিথ্যা সম্পর্কের নটপেটিকা পরিত্যাগ করিযাছেন এবং হাডের মালা পবিযা পূর্ণ কাপালিক যোগী সাজিযাছেন। জগতেব অস্তিত্বই যখন মিথ্যা তখন বাঁচা মবা অভিনয তুল্যই বটে। তু°—a poor player / That struts and frets his hour upon the stage, / And then is heard no more, (Macbeth Act V. Sc V.) অপবিশুদ্ধ চিত্তরূপ ডোম্বী দেহসরোবর ভাঙ্গিযা পরিশুদ্ধ চিত্তরূপ মৃণাল ভক্ষণ করে। সুতরাং তাহাকে হত্যা করিযা তাহাব প্রাণ লইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে নিঃস্বভাবীকৃত করিতে হইবে। অপবিশুদ্ধ ডোম্বীকে পবিশুদ্ধ অবধূতিকায পরিণত করিতে হইবে।*

১১

রাগ পটমঞ্জরী কৃষ্ণাচার্যপাদানাং ॥

নাডি শক্তি দিঢ১ ধরিঅ খট্টে২।
অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কাপালী যোগী পইঠ অচারে।
দেহ ন অরী বিহরএ একারেঁ৩ ॥ ধ্রু ॥
আলি কালি ঘণ্টা৪ নেউর চরণে।
রবি শশী কুণ্ডল কিউ৫ আভরণে ॥ ধ্রু ॥

* মূল গীতিসংগ্রহে মনে হয় ১০ গীতির পর আর একটি গীতি ছিল। এই গীতিটির টীকাশেষে উল্লিখিত আছে 'লাড়ী ডোম্বী পাদানাম্ সুনেত্যাদি। চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।' মুনিদত্ত যে কোন কারণেই হউক পদটির ব্যাখ্যা করেন নাই। লিপিকরও তাই পদটি উদ্ধৃত করেন নাই।

রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।
পরম মোখ লবএ মুত্তিহার ।। ধ্রু ।।
মারিঅ সাসু[৬] নণন্দ ঘরে সালী[৭]।
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালী ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ১৮ ক-খ]

পা. ১. শা. দিট, ১ সং চর্যায পা. ২. দ্র.। ২. পুথিতে খদ্ধে। টীকানুসাবে খট্টে। শা. খট্টে। অন্ত্যানুপ্রাসে কিছু অসঙ্গতি থাকিযা যায। সু খদে। ৩.=একাকারে। টীকা—একাকাব তয়া বিহবতি। ৪ সু. ঘণ্ডা ৫. শা. কিউ। ৬. শা. শাসু। ৭. শা. শালী।

অ ন্ব য়ঃ নাড়ী শক্তিকে দৃঢভাবে খাটে (শূন্যতায়) ধরা লইল। অনাহত ডমরু বীরনাদে বাজে। কাহ্ন কাপালিক যোগী [যোগ আচারে প্রবিষ্ট (হইলেন)। (তিনি) দেহনগরী একাকারে বিহার করিতেছেন। আলি কালিকে চরণে ঘণ্টা নূপুর এবং রবিশশীকে কুণ্ডল আভরণ করা হইল। রাগ দ্বেষ মোহকে (দগ্ধ করিয়া তাহার) ক্ষার লওযা হইল (=অঙ্গে লেপন করা হইল) এবং পরম মোক্ষ মুক্তাহাব লাভ হইল। শাশুড়ীকে মারিযা, ননন্দকে ঘরে বন্ধ কবিয়া, মায়াকে মাবিযা কাহ্ন কাপালিক হইলেন।

টী কা টি প্প নী : নাড়ি শক্তি=বত্রিশনাড়ী, তন্মধ্যে প্রধানা অবধূতিকা। ধবিঅ <*ধরিত=ধৃত। খট্টে=খাটে<খট্টে, অথবা শূন্যতায অর্থে, খ-ত্বে> খট্টে। অনহা ডমরু=অনাহত ডমরু। যৌগিক পদ্ধতিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বাব রুদ্ধ কবা হয়, সমস্ত নাড়ী আযত্তে আনা হয় তখন দেহেব মধ্যেই একটি ধ্বনি উত্থিত হয, তাহাব নাম অনাহত ধ্বনি। কাহ্ন কাপালিক যোগাচাবে প্রবিষ্ট হইযাছেন। তিনি অবধূতিকাকে শূন্যতায় দৃঢ করিয়া ধরিয়া রাখিযাছেন, অনাহত ধ্বনি উঠিতেছে। বাজএ=বাজে, <বাদ্যতে। বিহরএ=বিহার করে, <বিহরতি। একারেঁ=একাকারেঁ=অদ্বয়ভাবে, <একাকারেণ। দেহ একারেঁ=কাহ্ন অদ্বযভাবে (একাকারে) দেহনগরী বিহার করিতেছেন। আলি কালি রবিশশী=ইডা পিঙ্গলার বৌদ্ধ তান্ত্রিক নামান্তর। বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ধর্মমত অধ্যায় দ্র.। আলি ··আভরণে=আলিকালিকে চরণের ঘণ্টা নূপুর ও রবিশশীকে কর্ণাভরণ করা হইযাছে অর্থাৎ ইহারা সম্পূর্ণ আযত্তে আসিযাছে। নেউর<নূপুর। কিউ কিঅ<কৃত। অ>উ শৌরসেনী প্রভাবজাত। দেশ< দ্বেষ। ছার<ক্ষার। মোখ<মোক্ষ। লবএ=লাভ করা হয়। লভ্যতে>লব্‌ভই >লভই>লবএ। রাগ মুত্তিহাব=রাগ দ্বেষাদি পোড়াইযা ছাই করিয়া তাহা-দ্বারা অঙ্গ বিলিপ্ত করিয়া কাহ্ন কাপালিক পরম মোক্ষরূপ মুক্তিহার (মুক্তাহার বা মুক্তিরূপ হার) পরিযাছেন। মারিঅ=মারিয়া; <মারয়িত্বা। সাসু=শাসু= (১) শ্বাস, (২) শাশুড়ী। নণন্দ—(১) ননদ, (২) নন্দনকারী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি।

শালী- -(১) শ্যালিকা, (২) শাল দিয়া অর্থাৎ বন্ধ করিয়া, নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া। মাঅ=মায়া। মারিআ পূর্ব পংক্তিতে মারিঅ রূপে লিখিত। ভইঅ=হইল, <*ভবিত=ভূত। কবালী=কাপালিক; ৩য় পংক্তিতে কাপালী রূপে লিখিত।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : গীতিটিতে কাহ্ন কি প্রকারে যোগী হইযাছেন, সেই পদ্ধতির বর্ণনা। কাযসাধনা, যোগাচার, নাড়ীগুলিকে আয়ত্তে আনা, রাগদ্বেষ মোহাদি বিনষ্ট করা, শ্বাস সংযম, চক্ষুরাদি আনন্দ-বিধাযক ইন্দ্রিযগুলির দমন ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্য দিয়া মাযাকে ধ্বংস করিয়া কাহ্ন কাপালিক হইয়াছেন। কাপালিকেরা দেহসজ্জার জন্য নূপুর ইত্যাদি ধারণ করেন। রূপকের মধ্য দিয়া এখানে তাহা ব্যক্ত হইযাছে,—আলিকালি ইত্যাদি নূপুর-আভরণ, রাগদ্বেষাদির ভস্ম দেহাচ্ছাদন, মোক্ষরূপ মুক্তাহার গলার মালা।

গীতিটিতে একদিকে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বর্ণনার প্রাধান্য, দার্শনিকতাব ইঙ্গিত কিছুই নাই; অন্যদিকে শাশুড়ী, ননদ, শ্যালী ইত্যাদি পরিবেষ্টিত বাঙ্গালী পারিবারিক জীবন-চিত্র লক্ষণীয়।

১২

[রাগ][১] ভৈরবী কৃষ্ণপদানাং

করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নয়বল[২]।
সদ্‌গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল।। ধ্রু ।।
ফীটউ [৩] দুআ [৪]মাদেসি রে[৪] ঠাকুর।
উআরি[৫] উএসঁ[৬] কাহ্ন[৭] নিঅড়[৮] জিনউর।। ধ্রু ।।
পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মরাড়ি ইউ[৯]।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা[১০] ঘোলিউ[১১]।। ধ্রু ।।
মতিএঁ[১২] ঠাকুরক পরিণিবিত্তা[১৩]।
অবস[১৪] করিঅ ভববল জিতা।। ধ্রু ।।
ভনই কাহ্ন আম্হে ভলি[১৫] দাহ[১৬] দেহুঁ।
চউঠ্‌ঠি কোঠা গুণিআ লেহুঁ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ১৯ক-খ]

পা. ১ পুথিতে নাই। ২. শা নঅ বল। ৩. সু কীটউ। টীকা. ফীট। ৪-৪. শা. মাদেসিরে। সু. মা দেসি রে। ৫. শা তআরি। ৬. শা. উএস। ব্যাকরণ অনুসারে উএসেঁ সঙ্গত। ৭. শা. কাহ্নু। ৮. নী. নিঅড়। ৯. পুথিতে মরাড়িইউ থাকিলেও উহাই শুদ্ধপাঠ কিনা সন্দেহজনক। মরাড়িউ বা মারিউ শুদ্ধপাঠ হইতে পারে। ১০. শা. পাঞ্চজনা। ১১. শুদ্ধপাঠ ঘালিউ (?)। ১২.

পুথিতে মলিএঁ। লিপিপ্রমাদ অনুমিত। টীকা মতিএমিতি, সুতরাং শুদ্ধপাঠ মতিএঁ। ১৩ শা. পরিনিবিত্তা। সু. পরিণেবিত্তা। পরি অংশের লিপি সংশযমুক্ত নহে। র-এর ই-কারের সামনের দিকের দাঁড়িটি নাই। পরী পাঠও সম্ভব। টীকা 'পরিনির্বাণারোপিতং কৃতং'। ১৪. শা। অবশ। ১৬ = ভাল। ১৫ = দান।

অন্বয়ঃ করুণাকে পিড়ি করিযা নববল (দাবা) খেলি। সদ্‌গুরু বোধে (উপদেশে) ভববল জেতা হইল। দুইকে দূরীভূত করা হইল, ঠাকুরকে (রাজাকে) মারা (মাৎ করা) হইল। উপকারিকের (গুরুর) উপদেশে কাহ্নু নিকটেই জিনপুর (দেখিলেন)। প্রথমে তুড়িযা বোড়েকে মারা হইল, গজবরকে তুলিযা পাঁচজনকে ঘায়েল করা হইল। মন্ত্রীদ্বারা ঠাকুরের পরিনির্বৃতি করিয়া অবশ (অচল) করিযা ভববল জেতা হইল, (অথবা মন্ত্রী দ্বারা ঠাকুরের পরিনির্বৃতিব ফলে অবশ্যই ভববল জেতা হইল।) কাহ্নু বলেন, আমি ভাল দায = পণ বা দান দিই। চৌষট্টি কোঠা গণিযা লই।

টীকাটিপ্পনীঃ পিহাডি – পিঁড়ি করিযা, ছক হিসাবে পাতিযা; পীঠ > পিঢ > পিডঢ > পিহড় (বিপর্যাস), অথবা পীঠ > প্রা০ পিঠর > পিহড়। *পিহাড়িত্বা > পিহাডি, নামধাতু: অসমা। খেলহুঁ – √খেল্ + হুঁ (< অহম্; উত্তমপুরুষের বর্তমানকালে ক্রিযাবিভক্তি)। নঅবল – দাবা। < নববল। টীকায 'চতুর্থানন্দবলম্'। চতুর্থ অর্থে নব = ন আধুনিক বাংলাতেও চলে। চতুর্থানন্দ = সহজানন্দ (ধমমত অধ্যায দ্র.)। বোহেঁ = উপদেশ দ্বারা, < বোধেন। জিতেল = জেতা হইল; < জিত + এল (= ইল)। ভববল = বিষযাভাস, ভবসংসারের অস্তিত্বের জ্ঞান। ফীটউ = ফেটা হউক, দৃঢ় করা হউক, নিঃস্বভাবীকৃত করা হউক। ভ্রংশ অর্থে প্রা ফিট্ট ধাতু + অউ (অউ বা উ কর্মভাববাচ্যের অনুজ্ঞার বিভক্তি)। দুআ = দুই; < *দ্বক। আভাসদ্বয, দ্বৈতজ্ঞান। প্রথম দুই শূন্য। চিত্তকে শূন্য অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য এই চারিস্তরে বিভক্ত করা হইযাছে। প্রথম তিনটি দোষযুক্ত, সমল, চতুর্থটি দোষ-বিমুক্ত, প্রকৃতি-প্রভাস্বর। মাদেসি = মর্দন কর; মাৎ কর; < মর্দয়সি। রে = সম্বোধনে। ঠাকুর = তৃতীয় শূন্য বা মহাশূন্য। প্রথম দুটি শূন্যকে মারিয়া পরে তৃতীয় শূন্যকেও মারা হইল। এই তিনটি শূন্য বিনষ্ট হইলে গুরুর উপদেশে নিকটেই জিনপুর অর্থাৎ মহাসুখধাম দৃষ্ট হয়। উআরি = < উপকারিক; গুরু। উএসঁ উএসেঁ < উপদেশেন। নিঅড় < নিকট। জিনপুর = মহাসুখধাম। পহিলে = প্রথমেই; প্রথ (ম) + ইল্ল > পহিল্ল > পহিল + এঁ (< এন, ৩যা)। তোড়িয়া = তুড়িয়া, তাড়াইযা যাইযা. অথবা তুলিয়া; ত্রোটযিত্বা > অথবা তোলযিত্বা >। বড়িআ = বোড়ে; < বটিকা। টীকানুসারে ১৬০ প্রকার প্রকৃতি-দোষ। চিত্তের প্রথম তিনটি স্তরের সহিত যুক্ত ৮০ প্রকার প্রকৃতি-দোষ দিবারাত্রিভেদে ১৬০ প্রকার হয়। মরাড়িইউ = মারিউ = মারা

হউক. <*মারিত+উ (কর্মভাববাচ্যে, অনুজ্ঞা।) পদটির সঠিক পাঠ সন্দেহমুক্ত নহে। প্রসঙ্গানুসারে অর্থ বোঝা গেলেও ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। শব্দটি মারিউ হইলে ব্যুৎপত্তি পূর্বোক্ত প্রকার। মরাড়িইউ বা মরাডিউর অর্থ শাস্ত্রী 'মটকাইয়া দাও' করিয়াছেন। মটকানো শব্দটি সং. মুট থেকে উৎপন্ন (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। মরাড়িইউ-এর সম্ভাব্য ব্যুৎপত্তি *মুটকায়িত, *মটকাযিত>মরাড়িইউ (মরাড়িউ ?)। গঅবরেঁ=গজবর দ্বারা, সর্বশূন্যতারূপ তথতাচিত্তরূপ গজেন্দ্র দ্বারা। গজবর>গঅবর+এঁ (<এন)। পাঞ্চজনা= পাঁচজনাকে, পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের অহংকারাদি প্রত্যয়কে। ঘলিউ— ঘোলান হউক। <প্রা. ঘোল্লিত প্রসঙ্গানুসারে ঘালিউ পাঠ প্রশস্ত। ঘালিউ= ঘায়েল করা হউক। ঘাতিত+ইল্ল>ঘাযিল>ঘালিঅ (বিপর্যাস)+উ কর্মভাববাচ্য অনুজ্ঞা)। মতিএঁ=মন্ত্রী দ্বারা, প্রজ্ঞাবুদ্ধি দ্বারা, <মতি+এঁ (<এন, ত্যা) অথবা মন্ত্রী>মতি+এঁ। ঠাকুরক=ঠাকুরকে অথবা ঠাকুরের, 'ক' ২যা অথবা ৬ষ্ঠীর বিভক্তি। পবিনিবিত্তা=পরিনির্বৃতি করিয়া। অবশ= অচল অথবা অবশ্য। ভলি<*ভদ্রিক। শুদ্ধ যদি 'ভাল' হয় তবে <ভদ্রক। দাহ>দায=পণ, জুয়ার Stake। চউষঠ্‌ঠি কোঠা=দাবার ছকে ৬৪ কোঠা (ঘর) থাকে। এখানে ৬৪ দলযুক্ত নির্মাণচক্রের পদ্ম। তু° এক সো পদমা চউষঠ্‌ঠি পাখুড়ী (১০)।

<u>ব্যাখ্যা সংকেত</u>: গীতিটিতে দাবা খেলার রূপকে তত্ত্বকথা বর্ণিত। স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভাস্বর করুণারূপ চিত্তকে দাবার ছক হিসাবে পাতিয়া পদকর্তা দাবা খেলিতেছেন। সদ্‌গুরু উপদেশে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। সহজসাধনার গুরুর উপর নির্ভরশীলতা এখানে লক্ষণীয়। প্রথমে চিত্তের শূন্য ও অতিশূন্যরূপ সমল দুই অবস্থাকে দূরীভূত করা হইল, পরে তৃতীয় শূন্য বা মহাশূন্যকে নিরাকৃত করা হইল। অতঃপর কাহ্ন সদগুরুর উপদেশে নিকটেই মহাসুখধামের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলেন। দাবা খেলায় যেমন একে একে প্রতিপক্ষের ঘুঁটি ধ্বংস করিয়া জয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হয় এও যেন তেমনি। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করিয়া পদকর্তা বলিতেছেন, প্রথমে বোড়ে অর্থাৎ চিত্তের প্রথম তিন অবস্থার সহিত যুক্ত ১৬০ প্রকার প্রকৃতি-দোষ ধ্বংস করা হইল। পরে প্রজ্ঞাদ্বারা অবিদ্যাকে পরিনির্বাণে আরোপিত করা হইল অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্তকে ক্রমে প্রকৃতি প্রভাস্বর চিত্তে পরিণত করা হইল। এইভাবে দাবা খেলায় জয়লাভ হইল, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল।

১৩

রাগ কামোদ কৃষ্ণা[চার্য্য] পাদানাং১ ।

তিশরণ নাবী কিঅ অঠকমারী২ ।
নিঅ দেহ করুণা ৩শূন মেহেলী৩ ॥ ধ্রু ॥
তরিত্তা ভবজলধি জিম করি মাঅ সুইণা৪ ।
মঝ বেণী ৫তরঙ্গ ম৫ মুনিআ ॥ ধ্রু ॥
পঞ্চ তথাগত কিঅ কেড়ুআল ।
বাহঅ কাঅ কাহ্নিল মাআজাল ॥ ধ্রু ॥
গন্ধপরসর [স]৬ জইসো তইসো ৭ ।
নিংদ৮ বিহুনেঁ৯ সুইণা১০ জইসো১১ ॥ ধ্রু ॥
চিঅ কণ্ণহার১২ সুণত মাঙ্গে ।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

পুথির পৃষ্ঠা ২০খ]

পা. ১. পুথিতে কৃষ্ণাপাদানাং। ২. পুথি অঠকমারী। টীকা অঠকুমারী। ৩ ৩. শা. শূনমে হেরী। শূনমে -শূন্যে ; মে=তে ধরিয়া শাস্ত্রী ঐ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। মে=তে পরবর্তী হিন্দির বিভক্তি। মহিলা বা স্ত্রী অর্থে মেহেলী চর্যায় প্রযুক্ত (দ্র. ৫০ চর্যা) পুথির মেহেলী=মহিলা তত্ত্বানুগতও। সু. মেহেলী পাঠ করিয়াও পা. টীতে মন্তব্য করিয়াছেন, মেহেরীও পড়া যায়। ৪. শা. সু. সুইনা। ৫-৫. শা. নী. তরঙ্গম। ৬. পুথি পরসর। টীকার 'গন্ধ রস স্পর্শাদি' অনুসারে সংশোধন। ৭-৭. পুথিতে স্পষ্ট জইসো তইসৌ। সৌ লিপিপ্রমাদ। অন্ত্যানুপ্রাসের জন্যও তইসো সঙ্গত। শা. জইসেঁা তইসেঁা। ৮ শা. নিন্দ ; সু. নিংদ। ৯. শা. নী. বিহুনে। ১০. শা. সুইনা। ১১. সু. জইসো। ১২. শা. কণ্ণহার।

অ ন্ব য় : ত্রিশরণকে নৌকা করা হইল, অষ্টকে মারিয়া। করুণা [হইল] নিজদেহ। শূন্য [হইল] মহিলা। মায়াস্বপ্নের মত এই ভবজলধি পার হওয়া গেল। মধ্য বেণীতে আমি তরঙ্গ অনুভব করিলাম। পঞ্চ তথাগতকে কেড়ুয়াল করা হইল। কাহ্ন এবার কায় বাহিয়া মায়াজাল [পার হয়]। গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমনি [থাকুক], নিদ্রা বিহনে স্বপ্ন যেমন। চিত্ত-কর্ণধার শূন্যতা মার্গে [উঠিয়া] কাহ্ন চলিলেন মহাসুখ সঙ্গমে।

টী কা টি প্প নী : তিশরণ<ত্রিশরণ, মূলত বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। সহজযানে কায়, বাক, চিত্তের শরণ অর্থাৎ মহাসুখ কায়। ণাবী=নৌকা, <নাবিকা, (ক্ষুদ্রার্থে)। কিঅ<কৃত। অঠক মারী=আট-কে মারিয়া, অষ্টবিধ বিকল্পাত্মক জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া। টীকার পাঠ অঠকুমারী, তদনুসারে অর্থ, অষ্টবুদ্ধৈশ্বর্যাদি

সুখ। শাস্ত্রীর 'অঠক মারী' এই পদবিভাগে আপত্তি জানাইয়া কেহ কেহ অঠ-কমারী বা অঠ কমারী এইরূপ পদবিভাগের পক্ষপাতী। কামরা অর্থে কমারী গ্রহণ করিয়া অর্থ দাঁড়াইয়াছে, 'আট কামরাযুক্ত'। বিদেশী শব্দজাত কামরা অর্থে কমারী চর্যার যুগে অসম্ভব কষ্ট-কল্পনা। অব্যবহিত পূর্বে কিঅ শব্দের ব্যবহার থাকায় কিঅ অঠক মারী এই ধরনের পদবিভাগ ব্যাকরণসম্মত নহে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করেন। বস্তুত 'কিঅ' পদের অন্বয় পূর্ববর্তী নারীর সহিত, অঠক-এর সহিত নহে। সেইভাবে ধরিলে অর্থসঙ্গতিতে অসুবিধা হয় না। (শব্দ দ.)। নিঅ দেহ নিজ দেহ। শূন<শূন্য। মেহেলী (মেহেরী) মাহলা, স্ত্রী। <মেহেলিকা, অবাচীন সংস্কৃত. EDB P 779। তিশরণ মেহেলী মহাসুখ কায়কে নৌকা করা হইল, অষ্ট বিকল্পজ্ঞান ধ্বংস করিয়া। নিজদেহ হইল করুণা, শূন্যই স্ত্রী অর্থাৎ নিজের দেহেই করুণা ও শূন্যের যুগনদ্ধ রূপ উপলব্ধ হইতেছে। তরিত্তা উত্তীর্ণ হইয়া. <*তরিত্বা, তরিত উত্তীর্ণ। জিম যেমন<*যিমন। মাঅ<মায়া। সুইণা<স্বপ্ন>সুপিণ>সুইন, সুইণা। বেণী যুক্ত, দুই। মঝ বেণী মধ্য বেণী, দুই-এর মধ্যপথ, অবধূতিকা। ম= আমার দ্বারা (আমি) <ময়া। মুনিআ- উপলব্ধি করা গেল. <*মুনিত, মনিত মত। তরিত্তা মুনিআ মায়াময় স্বপ্ন সদৃশ ভবজলধি পূর্বোক্ত নৌকায় পার হইয়া, মধ্য বেণীতে অর্থাৎ অবধূতিকায় মহাসুখ (তত্ত্ব) উপলব্ধি করা গেল। পঞ্চতথাগত পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ, বাংলাদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আদি দেবতা বজ্রসত্ত্ব। বজ্রসত্ত্বের জ্ঞানময় দেহের ভিতরে পাঁচটি গুণ-স্বরূপ পাঁচটি জ্ঞানের কল্পনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি জ্ঞান সম্পর্কে বজ্রসত্ত্বের সচেতনতা, পঞ্চধ্যান। এই পঞ্চধ্যান পাঁচটি দেবতারূপে কল্পিত হইয়া পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চতথাগতে পরিণত হন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মমতে এই পঞ্চদেবতা দেহের মধ্যে অবস্থিত। দেহের মধ্যেই এই পঞ্চতথাগতের উপলব্ধি দেহের আসল স্বরূপকে চেনা। ইহাতেই দেহের বিশুদ্ধি। কেড়ুয়াল—দাঁড়; (৮ সং চর্যা দ্র.)। বাহঅ - বায়, পার হয়, <বাহয়তি। কাঅ<কায, কায়নৌকা। কাহ্নিল= কাহ্ন+ইল (আদর বা অবজ্ঞার্থে)। পঞ্চতথাগত · মায়াজল=পঞ্চতথাগতকে দাঁড় বানাইয়া অর্থাৎ দেহমধ্যে তাহাদের তত্ত্ব অবগত হইয়া কাহ্ন কায়ারূপ নৌকায় মায়ামোহরূপ সমুদ্র পার হয়। জইসো - যেমন, যাদৃশ>জইস>জইসো। তইসো- তইসো>তাদৃশ। নিংদ <নিদ্রা। বিহুনে=বিনা; <*বিভুন। গন্ধপরস· জইসোঁ=এমতাবস্থায় গন্ধ স্পর্শ রস যেমন তেমনি থাকে কিন্তু আমাদের নিকট তাহা জাগ্রৎস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কণ্ণহার=<কর্ণধার। সাঙ্গে= সঙ্গমে।

ব্যা খ্যা সং কে ত: আলোচ্য গীতিটিতে নৌযাত্রার রূপকে মহাসুখসিদ্ধির কথা বর্ণিত। বিশ্বজগৎ সম্পর্কিত বিকল্পজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া মহাসুখকায়কে নৌকা

করিয়া ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্তী অবধূতি মার্গ অবলম্বন করিলে মায়াস্বপ্ন সদৃশ এই ভবজলধি সহজেই পার হওয়া যায়। বিশ্ব সংসারের অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা মিথ্যা, এই দার্শনিক তত্ত্ব এবং দুইয়ের মধ্যবর্তী অবধূতি মার্গ অবলম্বনের মধ্যে তান্ত্রিক পদ্ধতির ইঙ্গিত লক্ষণীয়। দেহের বিভিন্ন স্থানে পঞ্চতথাগতের অবস্থান অবগত হওয়া সাধনার অঙ্গ। পঞ্চতথাগতকে তাই দাঁড় রূপে গ্রহণ করিয়া নৌকা বাহিবার কথা বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে বিশ্বসংসার জাগ্রৎস্বপ্ন বলিয়াই প্রতিভাত হয় এবং মহাসুখ তরঙ্গ উপলব্ধি করা যায়। এইভাবে নৌকা চালনার জন্য অবিদ্যামুক্ত চিত্তকে কর্ণধার করিয়া মহাসুখের দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

১৪

ধনসী রাগ১ ডোম্বীপাদানা ।

গঙ্গা জউণা২ মাঝে রে বহই নাই৩।
তহিঁ৪ বুড়িলী৫ মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই ॥ ধ্রু
বাহতু৫ ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল৬ উছারা।
সৎগুরু পাঅপএঁ৮ জাইব পুণু জিণউরা ॥ ধ্রু।
পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণ দুখোলেঁ সিংচহুঁ৯ পাণী ন পইসই সান্ধি১০ ॥ ধ্রু।
চন্দ সুজ্জ দুই চকা সিঠি সংহার পুলিংদা১১।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন রেবই৫ বাহতু৫ ছন্দা ॥ ধ্রু।
কবড়ী১২ ন লেই বোড়ী১৩ ন লেই সুচ্ছড়ে পার করেই।
জো রথে চড়িলা১৪ বাহবা ণ জাই১৪ কুলেঁ১৫ কুল বুড়ই ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ২২ ক]

পা. ১. অন্য চর্যায় রাগ শব্দটি পূর্বে অথ রাগ ধনসী এইভাবে লিখিত। ২ শা. জড়ুনা। সু জউনা। ৩ শা. নাঈ। মূলপাঠ নই? টীকাটিপ্পনী দ্র.। ৪. সু. তহি। ৫. পুথি খুব স্পষ্ট নহে। চুড়িলীও পড়া চলে। শা. বুড়িলী। সু. বুড়িলী পাঠ গ্রহণ করিয়া চুড়িলী পড়া যায় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। টীকাটিপ্পনী দ্র.। ৫-৫ শা বাহতু। ৬ নী ভইলা। ৭. শা. সু. সদগুরু। ৮ শা. পাঅপএ। ৯ শা. সিঞ্চহুঁ ১০. শা. সু. সান্ধি। ১১. শা. পুলিন্দা। ১২ শা কবড়ী। ১৩. শা. বোড়ী। ১৪-১৪ পুথিতে বাহবণি জাবাই লিখিয়া ণি-এর ই-কার এবং জাবাই এর বা কাটা। সু বাহবা ন জাবাই পাঠ গ্রহণ করিয়াও সংশয়িত। শুদ্ধপাঠ সন্দেহমুক্ত নহে। ১৫ সু. কুলে।

অন্বয় : গঙ্গা যমুনার মাঝে নদী বহে। তাহাতে ডুবন্ত মাতঙ্গী শাবকদিগকে অবলীলায় পার করায়। বাহ তুমি ডোম্বী, বাহ ; পথেই উৎসার (সন্ধ্যা) হইল (বেলা পড়িয়া আসিল)। সদ্‌গুরু প্রসাদে যাইতে হইবে পুনরায় জিনপুর। নৌকার-মার্গে (গনুই এ) পাচটি দাঁড় পড়িতেছে এবং পিটে (ছাতে) কাছি [খুঁটি হইতে খুলিয়া লইয়া] বাঁধা আছে (অর্থাৎ চালনার জন্য নৌকাটি সর্বপ্রকারে প্রস্তুত)। গগন সেঁউতি দ্বারা জল সেঁচিয়া ফেল যাহাতে সন্ধিপথে প্রবেশ করিতে না পারে। চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি সংহার [রূপ] দুই চাকা পুলিন্দায় সংযুক্ত। বাম দক্ষিণের দুই পথ দেখা যায় না। সুতরাং স্বচ্ছন্দে বাহিয়া যাও। পারাপার করিবার জন্য [মাতঙ্গী] কড়িবুড়ী কিছুই লয় না, সহজে পার করায়। কিন্তু যে রথারোহীরা (পারগামী লোকেরা) বাহিয়া না যায়, তাহারা কূলে কূলে ডুবিয়া মরে (লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না)।

টী কা টি প্প নী : গঙ্গাজউনা=দুই দিকের দুই নাড়ী, ইড়া, পিঙ্গলা। মাঝেঁ <মধ্যেন। বহই<বহতি। নাঈ=ক্ষুদ্র নৌকা ; মধ্যনাড়ী, অবধূতিকা. নাবিক >নাবী>নাই। শুদ্ধপাঠ সম্ভবত 'নই' <নদী। গঙ্গা যমুনার মধ্যে তৃতীয় নদী সরস্বতী। বহই ক্রিয়াপদটি নদী বা নৌকা উভয়ের সঙ্গেই অন্বিত হইতে পারে। নদীর সঙ্গেই অন্বয় বেশি প্রশস্ত। পরবর্তী চরণের 'বুড়িলী'-র সহিত সঙ্গতির জন্যও নদী অর্থই সমীচীন। ধ্বনিগত দিকে নই >নাই অসম্ভব নহে। তিব্বতী অনুবাদে পথ বা track 'নই' পাঠ সমর্থক। তবে গীতিটির পরবর্তী অংশে নৌকা বাহিবার বর্ণনা আছে। মুনিদত্তের টীকাতেও 'নৌ' আছে। তহিঁ=তাহাতে : <*তধি. <তস্মিন্। বুড়িলী ডুবন্ত, নিমজ্জিত ; (বিণ, স্ত্রী)। চর্যায় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ইল' যুক্ত রূপ বিশেষণেও প্রযুক্ত ; পাকিল দাড়া, কাটিল ঘাঅত (শ্রীকৃ. কী.)। সংস্কৃত মজ্জ ধাতু স্থানে প্রাকৃতে উদ্ভূত বুড্ড ধাতু>বুড়+ইত+ইল্ল+ঈ (স্ত্রী)। বাংলা ও হিন্দীতে বুড়্ ধাতুর বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে ডুব-এ পরিণত হইয়াছে। পুথির পাঠ চুড়িলী হইতে পারে। তাহার অর্থও স্পষ্ট নহে। চুড়িলী যদি চড়িলীর লিপিপ্রমাদ হয় তবে অর্থ=আরূঢ়া। নাই=নদী ধরিলে এই অর্থ প্রয়োজনীয় নহে। তিব্বতী অনুবাদের **that which enters**=সঠিক নহে বলিয়া শান্তিভিক্ষু মন্তব্য করিয়াছেন। চর্যার টীকায় চঞ্চলা='প্রমত্তাঙ্গী' অর্থ করা হইয়াছে। মাতঙ্গী=প্রমত্তাঙ্গী হস্তিনী সদৃশ নৈরাত্মা। পোইআ=শাবক অর্থাৎ বালযোগী ; *পোতিক>পোঅঅ>পোইঅ>পোইআ। তিব্বতী অনুবাদে মাতঙ্গী পোইআ=**daughter of a low caste man**। এই অনুবাদের সহিত টীকার কোন মিল নাই। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে মাতঙ্গী-পোইআ-কে সমাসবদ্ধ পদ ধরিলে 'পার করেই' অর্থ হয় নিজে পার হয়। গীতিটির মূলভাবের সহিত এ অর্থ খুব সঙ্গত নহে। করেই=করায় ; <কারয়তি। তু=তুমি ; ত্বম্>

তুঅম্>তু, তো। বাটত=পথে, বর্ত্ম>বট্ট>বাট+ত (৭মী)। ভইল—হইল <*ভবিত (=ভূত)+ইল্ল। উছারা=পড়ন্ত বেলা, <উৎসাবক। প'অপএ<পাদপদেন। শ্রীচরণের অনুগ্রহে। অনেকে পা'অপসাএ পাঠ গ্রহণে ইচ্ছুক। তাহা হইলে অর্থ, পাদপ্রসাদে। জিনউরা=জিনপুর, জিন-সিদ্ধপুরুষ, জিনপুর-সিদ্ধিতীর্থ, মহাসুখধাম। পঞ্চ কেড়ুআল ১৩ চর্যা দ্র.। পড়ন্তে পড়িতেছে। √পিড+অন্ত (শতৃ)+এ। পিটত ছাতে, মণিমূলে। পিট+ত ৭মী)। কাচ্ছী—নৌকা বাঁধার দড়ি (বোধিচিত্ত), বোধিচিত্তকে দৃঢ়রূপে মণিমূলে বাধা হইল। কাচ্ছী<*কক্ষিকা। বান্ধী বান্ধা হইল, <*বন্ধিত। গঅণ দুখোলেঁ শূন্যতা বা গগনরূপ সেচনীদ্বারা, দুখোল—দুইখোল, দুটি খোলাদ্বারা প্রস্তুত। পিট—ছাত, সিংচহুঁ—সেঁচিয়া ফেল, সিঞ্চ+হু (অনুজ্ঞা)। পানী জল, <পানীয়। পইসই প্রবেশ করে <প্রবিশতি। সান্ধী=সন্ধিপথ, <সন্ধি। চন্দ পুলিংদা—চন্দ্রসূর্য, সৃষ্টি সংহারের তত্ত্ব, মাস্তুল-সংলগ্ন দুই চাকা, মাস্তুল অদ্বয়-জ্ঞানের প্রতীক। মাস্তুলে পাল মেলিবার (সৃষ্টি) এবং পাল গুটাইবার সংহারের) দুইটি চাকা থাকিত। এই দুই চাকা গ্রাহ্যগ্রাহক রূপ দ্বৈতজ্ঞানের প্রতীক রূপে কল্পিত। অন্যদিকে এই দুই চাকা দুই নাড়ীর প্রতীক। মধ্যবর্তী মাস্তুল সুষুম্নার প্রতীক। মাগ মার্গ। বেরই দেখা যায়। ধাতুমূল অজ্ঞাত। গাথা সপ্তশতীতে অনুরূপ অর্থে বেহই শব্দের ব্যবহার আছে। পাঠান্তর অনুমিত, চেবই<চেতযতি বোঝা যায়। ছন্দা স্বচ্ছন্দে। কবড়ী কড়ি, <কপর্দিক। লেই লয় <*লযতি, নযতি। বোড়ী বুড়ি, বোড্রিক>বোডিডঅ>বোড়ি, বুড়ি। সুচ্ছড়ে স্বচ্ছন্দে। বাহবা বাহিয়া। বুড়ই=ডোবে। বুড়িলীর টীকা দ্র। কবড়ী বুড়ই=পার করিবার জন্য নৈরাত্মা কোন কড়ি বুড়ি লয় না, অর্থাৎ ইহার জন্য কোন কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যাহারা সাধনপথে অগ্রসর হয় না তাহারা কূলে অর্থাৎ দেহের ভিতরে অথবা মিথ্যা মায়ায় ডুবিয়া মরে।

ব্যাখ্যা সংকেত. নৌকা বাহিবার রূপকে এখানে তান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধি লাভের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধনার মধ্যপথ অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যপথ অবধূতি মার্গের (সুষুম্নার) ইঙ্গিত প্রথম পদেই। এই পথেই নৈরাত্মা তাহার সন্তানদের অর্থাৎ যোগীদের সিদ্ধির পথে লইয়া যান। মহাসুখধাম জিনপুর লক্ষ্য, সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া ঐ পথে বাহিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বোধিচিত্তকে মণিমূলে বাঁধা হইয়াছে, পঞ্চতথাগতকে দাঁড়রূপে স্থাপন করা হইয়াছে। গগন বা শূন্যতাজ্ঞানরূপ সেঁউতি দ্বারা বিষয়রূপ জল সেঁচিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুনরায়, মধ্যপথ অবধূতিমার্গের ইঙ্গিত। পুলিন্দা বা মাস্তুল অদ্বয়জ্ঞান-রূপ মধ্যপথ। বাম দক্ষিণের দুই চাকা গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ দ্বৈতজ্ঞান। এই মধ্যপথে চলিলে বাম দক্ষিণের দুই পথ আর দেখা যায় না।

এই পথে চলিবার জন্য কোন কৃচ্ছ্রসাধন বা জ্ঞান মার্গের মূল্য দিতে হয় না। সহজেই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়। কিন্তু যাহারা জানে না তাহারা এই নৌকায় উঠিয়াও বাহিয়া যায় না। ফলেই নিমজ্জিত হয়, রূপের মধ্যে বা দেহের মধ্যে ডুবিয়া মরে। তান্ত্রিক কায়সাধনা, দেহের মধ্যে দেহাতীতের সাধনা। সহজবা- অন্য যাহারা দেহের মধ্যে ডুবিয়া মরে, দেহাতীতের সন্ধান পায় না।

১৫

রাগ রামক্রী শান্তি, পাদানা।

সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লকখণ ন জাই।
জে জে উজু[১] বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঙ্গ॥ ধ্রু॥
কুলেঁ কুল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।
বাল তিল[২] একু বাঙ্ক[৩] ণ ভূলহ রাজপথ কণ্টারা॥ ধ্রু॥
মাআমোহা সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভন্তি ন পুচ্ছসি[৪] নাহা॥ ধ্রু॥
সুনা পান্তর উহ ন দিসই ভান্তি[৫] ন বাসসি জাংতে[৬]।
এষা অঠ[৭] মহাসিদ্ধি সিঝএ উজুবাট জাঅন্তে॥ ধ্রু॥
বাম দাহিন দো বাটা চ্ছাড়ী[৮] সান্তি[৯] বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ন গুমা খড়তড়ি[১০] নো হোই আখি বুজ্ঝিঅ বাট জাইউ॥ ধ্রু॥

[পুথির পৃষ্ঠা ২৩ ক-খ]

পা. ১ নী. উজু। ২. শা. তিণ। ৩. শা. বাকু। সু. বাঙ্গ। পুথির পাঠ বাঙ্গ হইতে পারে তবে প্রসঙ্গানুসারে বাঙ্ক প্রশস্ত। ৪. নী. পুছসি। ৫. শা. ভন্তি। ৬. শা. জান্তে। . সু. অট। ৮. নী. ছাড়ী। ৯ শা. শান্তি। ১০-১০. শা. ঘাটনগুমাখড়তড়ি।

অন্বয়: [সহজানন্দ] স্বসম্বেদ্য ; স্বরূপ বিচারে এই অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করা যায় না। যাঁহারা যাঁহারা এই ঋজুবর্ত্মে গিয়াছেন তাঁহারা অনাবর্ত্তক হইয়াছেন (ফিরিয়া আসেন নাই)। এই সংসারই ঋজুবর্ত্ম (সহজ), ' এই কথা ভাবিয়া] কূলে আসক্ত হইও না। [বালযোগীকে সম্বোধন করিয়া কবির উপদেশ],—হে বালযোগী তিলেক বাঁকে ভুলিও না : রাজপথ (মহাসুখাভিমুখী পথ) কনক মণ্ডিত। মায়ামোহ [রূপ] সমুদ্রে অন্ত এবং থই যদি না বোঝা যায়, আগে যদি কোন নৌকা বা ভেলা না দেখা যায় [তবে কেন] ভ্রান্তিবশত নাথকে (সদ্গুরুকে) জিজ্ঞাসা করিতেছ না। শূন্যতারূপ প্রান্তরের [প্রথমেই] উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু (সাধনপথে) যাইতে ভুল করিও না। এই সহজ পথে গেলে অষ্ট মহাসিদ্ধি সিদ্ধ হয় (লাভ হয়)। শান্তি বলিতেছেন, বাম দক্ষিণের

দুইপথ ছাড়িয়া (মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া) সানন্দে চোখ বুঁজিয়া চলিয়া যাও। পথে ঘাট, গুল্ম, খাদ, তড (অর্থাৎ কোন বাধাই) নাই।

টী কা টি প্প নী. সঅ সম্বেঅণ = স্বসম্বেগু, স্ব > সঅ. সম্বেদন > সম্বেঅণ লক্ষণীয় শান্তিব নামাঙ্কিত ২৬ সং চর্যায় শব্দটি সঅঁ সংবেঅণ এইরূপে পাওয়া যায়। সরুঅ < স্বরূপ। বিআবেঁতে বিচাবেতে। অলকখ অলক্ষ্য। লকখণ < লক্ষণীয়। জাই = যায়, < যাতি। জে- যাহাবা, যে। উজু বাটা = ঋজুবর্ত্মে। বর্ত্মক > বট্টঅ - বাটা। গেলা < গত + ইল্ল + আ। অনাবাটা পথহাবা, প্রত্যাবর্তনহীন অনাবর্ত্মক > অনাবট্টঅ > অনাবাটা। ভইলা = হইল < * ভবিত = (ভূত) + ইল্ল + আ। কুলেঁ কুল মা হোহ কূলে লীন হইও না. বস্তু জগতেব মধ্যে লযপ্রাপ্ত হইও না। টীকানুসাবে কুলেঁব অর্থ—বস্তুজগতে। পরবর্তী কুল শব্দের ব্যাখ্যা, কু বস্তুজগতে, ল — লযপ্রাপ্ত। কূলেঁ সংসাবা সংসাবেব পথই সহজপথ এই কথা ভাবিযা সংসাবে আসক্ত হইও না। বাল বালযোগী, মূর্খ। তিলএকু = তিলেক। বাঙ্ক = বাঁক। ভূলহ — ভুলিও, প্রাকৃতে উদ্ভূত ভ্রম অর্থে 'হ্বল' ধাতু হইতে ভুল + হ (অনুজ্ঞা)। বাজপথ কণ্টাবা বাজপথ, মহাসুখেব পথ কনকমণ্ডিত। টীকানুসাবে অথ, বাজচক্রবর্তী যেমন কনকধাবা পথে ক্রীডোভ্যানে প্রবেশ কবেন, যোগীন্দ্রও সেইরূপ অবলীলায় অবধূতিমার্গে মহাসুখচক্র কমলোভ্যানে প্রবেশ কবেন। কণ্টাবা < কনকধাবা (?)। মাআমোহসমুদাবে মাযা মোহরূপ সমুদ্রে। ভবজ্ঞানই মায়া, মোহ তাহার সহচব। সমুদাব — সমুদ্র (বিপ্রকর্ষ, অর্ধতৎ)। বুঝসি বোঝ, বুঝিও অনুজ্ঞা। থাহ থই, *স্থাবক > থাহঅ < থাহ। অগে অগ্রে। ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মানুসাবে আগে হওয়া উচিত। কিন্তু লিপিতে পূর্বস্বরেব দীর্ঘত্ব দেখান হয নাই। এমন নিদর্শন প্রচুব। ভেলা < ভেলক। দীসঅ দেখা যায, < দৃশ্যতে। ভন্তি < ভ্রান্তি। পুচ্ছসি জিজ্ঞাসা কব, < পৃচ্ছসি, অনুজ্ঞা। নাহ = সদ্গুরু, < নাথ। সুনাপান্তব — শূন্য প্রান্তব, উহ ন দীসই উদ্দেশ না দেখা যায়। উহ = বোধ, উহ ধাতু = বোঝা, (to understand, to think as probable,) হইতে উহ্যম্ > উহম্ > উহ। ভান্তি ন বাসসি = ভুলিও না। যৌগিক ক্রিযা গঠনে বাস ধাতুব প্রযোগ লক্ষণীয়। আধুনিক কালে ভালবাসা ও কদাচিৎ মন্দবাসা বা আঞ্চলিক লাজবাসা— এরূপ কয়েকটি ক্ষেত্র ভিন্ন ইহাব প্রযোগ নাই। মধ্যযুগ পর্যন্ত ইহার ব্যাপক ব্যবহাব ছিল দ্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। জান্তে = জাঅন্তে - যাইতে, যা + অন্ত + এ। এথা - এই, তৎসম। টীকানুসারে অর্থ, এখানে। অট < অষ্ট. ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে আট হওয়া উচিত। লিপিতে দীর্ঘীকরণের অনুপস্থিতিব উদাহবণ. তু. অগে। সিঝএ = লাভ হয়, < সিধ্যতে। বাম দ্ছাডী = বাম দক্ষিণের দুইপথ, ইডা পিঙ্গলা পবিত্যাগ করিয়া। বুলেথেউ = বুল ধাতু বলা এবং ভ্রমণ কবা দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। শান্তি আনন্দে ভ্রমণ করেন

অথবা শান্তি স্পষ্ট করিয়া বলেন। শেষের অর্থটি বেশি সঙ্গত, কারণ চরণটি ভণিতার। বদ>বোল>বুল+থেউ <থিউ <থিঅ<স্থিত=বলে থাকেন। বুল+থেউ=স্থিত, (আধুনিক কালের থাক্ ধাতুযুক্ত যৌগিক ক্রিয়াপদের মত) এ ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে। সংকেলিউ=অবলীলায় ; সম্+ √কেল (খেল)+ইঅ (=ক্ত)= সংকেলিঅ>সংকেলিউ ; ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দের কয়েকটি ক্ষেত্রে উ-অন্তক হওয়ার কারণ শৌরসেনী প্রভাব। গুমা=গুল্ম। খড়তড়ি=খাদ্, তড় অর্থাৎ বাধাবিঘ্ন। বুজ্ঝিঅ=বুজিয়া ; মুদ>মুজ্>বুজ্+ক্তা ; *বুজ্ঝিঅ : বুজ্ঝিআ। জাইউ—যাও ; যাওয়া হউক ; < * যায়তু। ঘাট·· জাইউ—পথে বাধা বিঘ্ন কিছু নাই ; চোখ বুজ্ঝিয়া চলা যায়।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : গীতিটিতে সহজানন্দের স্বরূপ ও তাহা লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা উপলব্ধ হয় না ; তাহা স্ব-সম্বেদ্য। অলক্ষ্য বা অনির্বচনীয় এই সহজানন্দ, স্বরূপ বিচারে ইহাকে লক্ষণীয় বা বোধগম্য করিয়া তোলা যায় না। যাঁহারা এই সহজ পথের পথিক, তাঁহারা আর ফিরিয়া আসেন না, সিদ্ধির পরপারে পৌঁছিয়া যান। জগৎসংসারের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁহাদের আর কোন চেতনা থাকে না। সুতরাং হে মূঢ়, বস্তুজগতের চেতনায় আর লীন হইও না ; সহজমার্গ ত্যাগ করিও না। ক্ষণমাত্রের জন্য বাঁকে ভুলিও না অর্থাৎ সহজমার্গ ভিন্ন অন্য বঙ্কিম পথে যাইও না। রাজা যেমন কনকমণ্ডিত পথে ক্রীড়োদ্যানে প্রবেশ করেন, সেইরূপ কনকমণ্ডিত অবধূতি-মার্গ ধরিয়া মহাসুখ-কমল-বনে প্রবেশ কর। (শাস্ত্রীর মূলপাঠ ছিল বাল ভিণ একু বাকু ইত্যাদি ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, হে বালযোগী, ভব ও নির্বাণ যে পৃথক এরূপ বাক্যে ভুলিও না ইত্যাদি।) অতলান্ত এই মায়ামোহ সমুদ্র ; পারাপারের কোন ব্যবস্থা সহজলভ্য নহে, কিন্তু দিশাহারা হইলে চলিবে না। সদ্‌গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথের সন্ধান জানিতে হইবে। শূন্যতারূপ প্রান্তর সহজে দেখা যায় না, অর্থাৎ সাধনার প্রথম স্তরে সিদ্ধি সুদূরপরাহত থাকে। কিন্তু হাল ছাড়িও না ; এই পথে গেলেই অষ্ট মহাসিদ্ধিলাভ হইবে। বাম দক্ষিণের দুই পথ ছাড়িয়া মধ্যপথ অবধূতিমার্গ অবলম্বন করিয়া শান্তি (পদকর্তা) অবলীলায় সাধনপথে চলিয়াছেন, (কিম্বা শান্তি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন) পথে বাধাবিঘ্ন কিছুই নাই, চোখ বুজিয়া চলিয়া যাও।

গীতিটির প্রথমদিকে চর্যার দার্শনিকতার ভাববাদী স্বরূপ (subjective idealism) ব্যক্ত হইয়াছে। গীতিটির মধ্যে সহজ সাধনার মহিমা, গুরুর উপর নির্ভরশীলতা এবং তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির কথাও লক্ষণীয়।

দ্র. গীতিটির শেষ পদ ৩২ সং চর্যার টীকায় নিম্নলিখিত পাঠে উদ্ধৃত আছে —ঘটমনগুম্মাখড়দতি বোহঅ অক্খি বুঝিআ মাগ চালী।

১৬

রাগ ভৈরবী, মহীধর পাদানাং।

তিনিএঁ১ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।
তা সুনি মার ভয়ংকর রে সঅ মণ্ডল সএল ভাজই ।। ধ্রু ।।
মাতেল চীঅ গঅন্দা ধাবই।
ণিরন্তর২ গঅণন্ত তুসেঁ ঘোলই ।। ধ্রু ।।
পাপ পুণ্য বেণি তিড়িঅ৩ সিকল মোড়িঅ খম্ভাঠাণা৪
গঅণ টাকলী৫ লাগি রে চিত্তা পইঠ ণিবাণা৬ ।। ধ্রু ।।
মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅণ৭ সএল৮ উএখী।
পঞ্চ বিষঅ৯ রে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ।। ধ্রু ।।
খররবি কিরণ সংতাপে১০ রে গঅণাঙ্গণ গই পইঠা।
ভণন্তি মহিত্তা মই এথু বুড়ন্তে কিম্পি ন দিঠা ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ২৫ ক-খ]

পা. ১. শা. সু. তিনিএঁ। ২ শা. সু. নিরন্তর। ৩. টীকানুসারে তোড়িঅ? ৪. পাঠ সংশয়িত। প্রথম বর্ণ শা. খ। এটি খ/থ বা অন্যকিছু স্পষ্ট বলা যায় না। পরবর্তী যুক্তবর্ণটি স্ব/স্ত দুই পড়া যায়। শাস্ত্রীর পাঠ রক্ষিত। ৫. শা. নী. টাকলি। ৬. শা. সু ণিবানা। ৭. শা. সু. বিষয়। ৮. পুথিতে সঅএল লিখিয়া অ বর্জিত। ৯. শা. সু. বিষয়। ১০. পুথিতে এ-কার সাধারণত বর্ণের বাঁ দিকে লিখিত। এখানে বর্ণের উপরে, তাও ঠিক নাগরী রীতিতে নহে। এধরনের এ-কার নেওয়ারী প্রভাবিত?

অন্বয়: [কায়বাকচিত্ত এই] তিনটি পাটেঁ (পীঠে, সহজানন্দে) লাগিল, [সেই সময়ে] ঘনকৃষ্ণ (ঘোর ভয়ঙ্কর) অনাহত ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া ভয়ঙ্কর মার সকল মণ্ডলসহ ভাগিয়া গেল (পলায়ন করিল)। মত্ত চিত্তগজেন্দ্র যাবতীয় তৃষ্ণাকে (দ্বৈতজ্ঞানকে) ধ্বংস করিয়া নিরন্তর গগনান্তে (শূন্যপানে) ধায়। পাপপুণ্যের যুগ্ম শিকল ছিঁড়িয়া, স্তম্ভস্থান মদন করিয়া, গগন শিখর হইয়া (অথবা গগন হইতে উদ্ভূত অনাহত শব্দে প্রেরিত হইযা) চিত্ত নির্বাণ [-রূপসরোবরে] প্রবিষ্ট হইল। ত্রিভুবনের সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া [সে এখন] মহারস পানে মত্ত। [এখন সে] পঞ্চস্কন্ধাত্মক সকল বিষয়ের নায়ক, তাহার বিপক্ষ কাহাকেও দেখি না। খর-রবি-কিরণ সন্তাপে (= মহাসুখরূপ রবির খরতাপে) [চিত্ত গজেন্দ্র] গগনাঙ্গনে (অথবা গগন গঙ্গায়) গিয়া প্রবিষ্ট হইল। মহিত্তা বলেন, এখানে ডুবিলে কিছুই দেখা যায় না

টীকা টিপ্পনী: তিনিএঁ = তিন অর্থাৎ কায় বাক্ চিত্ত। ত্রীণি > তিণ্ণি < তীণি, তিনি + এঁ (করণ, অধিকরণ। পাটেঁ = পীঠে বা সহজানন্দে। লাগেলি = লাগিল ; < * লগ্নিত + ইল + ই (স্ত্রী)। কায় বাক্ চিত্ত সহজানন্দে

যুক্ত হইল অন্য অর্থে, বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী মধ্য নাড়ীতে যুক্ত হইল। (the three planks or the principal nadis দ্র Studies in the Tantras, Dr P C Bagchi, p. 83) অণহ অনাহত ধ্বনি, ১১ সং চর্যা দ্র.। কসণ ভয়ানক, < কৃষ্ণ। গাজই গর্জতি >গজ্জই >গাজই। সুনি শুনিয়া, < * শুনিত্বা শ্রুত্বা। মার- হিন্দু পুরাণের মদনের সাদৃশ্যে কল্পিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে বর্ণিত দুষ্প্রবৃত্তির দেবতা, সাধনার প্রধান শত্রু। '.বাদ্ধধর্মে বর্ণিত এই মারের ধারণা অনেকখানি হইল খ্রীষ্টধর্মে বর্ণিত 'শয়তানের' অনুরূপ. জীবনের যাহা কিছু দুষ্প্রবৃত্তি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্কর্ম, প্রলোভন প্রভৃতি— ইহার সকলের মূলেই মার।" (দ. বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃ ৪৭।) সঅ= সহ < স্বক। মণ্ডল সঅ মণ্ডল সকল। ভাজই পলায়ন করিল, ভজ্যতে > ভজ্জই > ভাজই। ণা সুনি ভাজই অনাহত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মার তাহার সৈন্য সামন্তাদিসহ পলায়ন করিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত মারের বহু সেনা, তাহার মধ্যে প্রধান কাম। মণ্ডল বলিতে এখানে ঐ সৈন্য সামন্তই উদ্দিষ্ট। মাতেল মত্ত, মাতাল, <মত্ত + এল (ইল অথবা <মত্তপালক। গঅন্দা গএন্দা) গজেন্দ্র। ধাবই <ধাবতি। গঅণন্ত – গগনে, শূন্যপানে। তুসে =তৃষ্ণায়, টীকানুসারে দ্বৈতজ্ঞান, < তৃষা + এন। ঘোলই <* ঘোলয়িত্বা। বেণি=দুই. দ্র ১ সং চর্যা। তোড়িঅ তোড়িঅ। <ত্রোটয়িত্বা। সিকল <শৃঙ্খল। মোড়িঅ মর্দন করিয়া মোড়িআ। খম্ভাঠাণা স্তম্ভস্থানক> খম্ভঠাণঅ<খম্ভাঠাণা পাপ খম্ভাঠাণা সংসারের পাপপুণ্যরূপ দুই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যাস্তম্ভ মর্দন করিয়া অর্থাৎ সংসারমোহ ও অবিদ্যাপ্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া। গঅণটাকলি গগন-শিখর, শূন্যতার শেষ স্তর। টীকানুসারে টাকলির পাঠান্তর 'টক' অর্থ, অনাহত ধ্বনি। তিব্বতী অনুবাদেও উক্ত অর্থ উল্লিখিত। টাকলি হস্তী চালাইবার সময় মাহুত কর্তৃক কৃত টকটক শব্দ। অসমীয়া ভাষার ঢকালির সহিত তুলনীয়। চিত্তা – চিত্ত, <চিত্তকঃ। পইঠ< প্রবিষ্ট। ণিবাণা – নির্বাণে (৭মী। মহারস সহজানন্দ। তিহুঅণ < ত্রিভুবন। উএখী উপেক্ষিত> উবেকখিঅ> উএখিঅ>উএখী। পঞ্চ বিসঅ= পঞ্চ স্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়। বিপখ>বিপক্ষ। কোবী<কোহপি। দেখী- <* দৃক্ষিত=দৃষ্ট খররবিকিরণ সংতাপে মহাসুখরূপ রবির খরতাপে। গঅণাঙ্গণ –গগনাঙ্গনে, টীকানুসারে গগন গঙ্গায়। গই – <* গমিত্বা গত্বা। পইঠ> প্রবিষ্ট, ৬ষ্ঠ চরণে পইঠ। ভণন্তি—গৌরবে বহুবচন। মহিত্তা—পাঠান্তর মাহআ, মহিণ্ডা, তিব্বতী লিপ্যন্তর মহেন্দ্র। টীকায় ও গীতিশীর্ষে মহীধর, পদকর্তা। মই>ময়া —আমি অর্থে। এথ— অত্র> এত্থ> এথু। বুড়ন্তে = ডুবিলে, বুড+অন্ত+এ। ১৪ সং চর্যা দ্র। কিম্পি—<কিমপি (আদি স্বরাঘাতের ফলে মধ্যস্বর লোপ)।

ব্যাখ্যা সংকেত আলোচ্য গীতিটিকে সহজানন্দে প্রবিষ্ট চিত্তকে মত্ত গজেন্দ্ররূপে কল্পনা করিয়া চিত্তের মহাসুখলাভের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। (৫ সং গীতিতেও চিত্তকে মত্তহস্তীরূপে কল্পনা করিয়া মহাসুখলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে মহাসুখধাম কমলবনরূপে কল্পিত। আলোচ্য গীতিটিতে মহাসুখধাম জলাশয়রূপে কল্পিত।)

কায়, বাক, চিত্ত এই তিনকে সহজানন্দরূপ পীঠে সংযুক্ত করা হইল (অথবা অন্য অর্থে, বামদক্ষিণের দুই নাড়ীকে মধ্যনাড়ীতে যুক্ত করা হইল), অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে সাধনায় নিরত হইল। এই অবস্থায় দেহমধ্যে অনাহতনাদ শ্রুত হইল এবং সাধনপথের বিঘ্নস্বরূপ মার সৈন্যসামন্ত সমেত পরাভূত হইয়া পলায়ন করিল। মত্ত চিত্ত-গজেন্দ্র পাপপুণ্যরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যারূপ বন্ধনস্তম্ভ মর্দন করিয়া অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞান ও ভবমোহ পরিত্যাগ করিয়া, মাহুতের মুখনিঃসৃত 'টকটক' শব্দে হস্তী যেমন উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হয় সেইরূপ, 'অনাহত ধ্বনিতে' অনুপ্রাণিত হইয়া, সর্বশূন্যরূপ গগনের দিকে ধাবিত হয় এবং নির্বাণ-সরোবরে প্রবেশ করে। তখন সহজানন্দরূপ মহারস পানে মত্ত চিত্ত ভবসংসারের সমস্ত মোহ উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। তখন অবিদ্যামুক্ত চিত্ত পঞ্চস্কন্ধাত্মক সমস্ত বিষয়ের নায়ক হয়, অর্থাৎ বিষয়াদির উপর তখন কোন মোহ থাকে না। সাধনপথে তখন আর কোন বিঘ্ন নাই। প্রখর রবিকর সন্তপ্ত গজরাজ যেমন জলাশয়ে আশ্রয় লয়, মহাসুখরবিকর-সন্তপ্ত চিত্তও সেইরূপ নির্বাণসরোবরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে নিমজ্জিত থাকিয়া নির্বিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১।

রাগ পটমঞ্জরী, বীণাপাদানাং।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী বাকি১ কিঅত অবধূতী ।। ধ্রু ।
বাজই অলো২ সহি হেরুঅ বীণা।
সুণ৩ তান্তি ধনি বিলসই রুণা ।। ধ্রু ।।
আলি কালি বেণি সারি মুণেআ৪ ।।
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ ।। ধ্রু ।।
জবে করহা৫ করহকলে পিচিউ।
বতিস৬ তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ৭ ।। ধ্রু ।
নাচন্তি বাজিল৮ গান্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ২৬খ]

পা. ১. পুথিতে বাকি। সু. চাকি (টীকার চক্রী হইতে) এবং বাগচী (টীকার একীকৃত হইতে) একি সংশোধনের পক্ষপাতী। ২. লিপিকর সম্ভবত ল-এর পরিবর্তে স লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ল করা। ৩. শা. সু. নী. সুন। ৪. পুথিতে স্পষ্ট মুণেআ। স এবং ম এর মধ্যে লিপিগত সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও প্রচুর। অন্ত্যমিলের জন্য মুনিআ পাঠ অসম্ভব নয়। তু° ১৩ চর্যা মুনিআ। ৫-৫ শা. করহক লেপি চিউ। ৬ শা. বত্তিশ। ৭. শা. বিআপিউ। ৮. পুথি বাজিল। শা. বাজিল। সু. রাজিল পাঠ ধরিযাও বাজিল সংশোধনের পক্ষপাতী। টীকায ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বজ্রধর, বজ্রপদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত। বাজিল শুদ্ধপাঠ বলিযা মনে হয়।

অন্বয়: সূর্যকে লাউ [করা হইল] এবং শশী তন্ত্রী [হইযা তাহাতে] সংলগ্ন হইল। অবধূতিকে করা হইল অনাহত বক্র দণ্ড। হে সখি, হেরুকবীণা বাজিতেছে। শূন্যতা [রূপ] তন্ত্রীধ্বনি করুণ শব্দে বিলসিত হইতেছে। আলি কালির যুক্ত সরগম মনে করিযা সমরস সন্ধিতে [আঙ্গুল] গুণিয়া, গজবর (চিত্তগজেন্দ্র) যখন করভকে (=হস্তীশিশুকে) করতলে চাপিলেন, [তখন] বত্রিশ তন্ত্রীধ্বনি সমস্তকে ব্যাপ্ত করিল। বজ্রধর (—বাজিল) নাচিলেন, গান করিলেন দেবী। বুদ্ধনাটক বিষম (=বিপরীত/বিশ্রাম) হইল।

টীকা টিপ্পনী: সুজ<সূর্য। সসি<শশী। লাগেলি -* লগ্নিত+ইল+ই >লগ্নিল>লাগিল>লাগেল (স্ত্রী), তন্ত্রীর সহিত লিঙ্গ সৌষম্যে স্ত্রীলিঙ্গ। তান্তি <তন্ত্রী। অনহা - অনাহত; ১১ সং গীত দ্র.। দাণ্ডী<দণ্ডী। বাকী<বক্রী। কিঅত<কৃত। সুজ অবধূতি—সূর্যকে লাউ এবং চন্দ্রকে তন্ত্রী ও অবধূতিকে বক্র দণ্ড করিযা অনাহত ধ্বনিকারী বীণা প্রস্তুত করা হইল। চন্দ্রসূর্য বাম দক্ষিণের দুই নাড়ী, দণ্ড অর্থাৎ মধ্যপথ বা অবধূতিকার সহিত যুক্ত হইলে অনাহত ধ্বনি উত্থিত হয়। রূপকের অন্তরালে স্পষ্ট তান্ত্রিক পদ্ধতির ইঙ্গিত। বাজই<বাজএ<বাদ্যতে। সহি<সখী। হেরুঅবীণা<হেরুকবীণা। শ্রীহেরুক তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের দেবতা, বীণার নাম তাই হেরুকবীণা। টীকানুসারে, বীণায় 'শ্রীহেরুক' এই চারিটি অক্ষর ঘোষিত হইতেছে। সুন<শূন্য, শূন্যতারূপ। ধনি<ধ্বনি। বিলসই<বিলসতি, মূর্ছিত হইতেছে। রুণা—একটি অর্থে রুণ রুণ শব্দে, অন্য অর্থে করুণায়; প্রথম অর্থে<*রুণ্‌ণ। দ্বিতীয় অর্থে<করুণা, ইচ্ছাকৃত (দ্ব্যর্থকতার জন্য) ধ্বনি সংক্ষেপ। সুণ রুণা—শূন্যতারূপ তন্ত্রীধ্বনি করুণায ব্যাপ্ত হইতেছে। চরণটির ধ্বনি মাধুর্য অপূর্ব। রুণা শব্দটির মধ্যে একদিকে বীণাধ্বনির সাদৃশ্য, অন্যদিকে তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা। আলিকালি=স্বর ও ব্যঞ্জন; ইড়া পিঙ্গলার বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তর। ৭ম চর্যা দ্র.। বেণি—১ম চর্যা .। সারি=সরগম। তিব্বতী অনুবাদে সারি='gña'-non'=neck

pressing। সঠিক অনুবাদ নহে। শান্তিভিক্ষুর ব্যাখ্যানুসারে সারি-শারিক -কোণ অর্থাৎ বীণাবাদনের ছড়/মেজরাফ। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় বাক্যের ক্রিয়া-পদের সঙ্গে ঠিকমত অন্বয় হয় না। টীকায় সারি-সার, শ্রেষ্ঠ আলি কালি বর্ণাক্ষরাণাং মধ্যে সারাক্ষরমকারং'। মুণেআ-মনিত্বা>মনিআ>মুণিআ> মুণেআ। সমরস—বাদন প্রসঙ্গে অর্থ, সুরের সমতা। তান্ত্রিক দিকে সমরস একটি তান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দ। শিব-শক্তির অদ্বয়ত্বের অনুভূতিই সমরস। বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায়ের যোগনদ্ধ বা অদ্বয়ত্বের অনুভূতিই সমরস। মহাসুখের নামান্তর রূপে কল্পিত। সান্ধি-সন্ধি বা ঘাটগুলি। আলিকালি গুণিআ= চরণ-দুটিতে একদিকে যেমন বীণাবাদনের রূপকল্প, অন্যদিকে তেমনি তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির ব্যঞ্জনা। সরগম, বীণাযন্ত্রের ঘাট ইত্যাদি বীণার আঙ্গিক। তেমনি আলিকালি সমরস ইত্যাদি তান্ত্রিক সাধনার অঙ্গীভূত। আলিকালিরূপ সরগম শুনিলে চিত্ত (গজবর) সমরস পানের জন্য অগ্রসর হয়। করহা=গজশিশু, চিত্ত গজেন্দ্রের চঞ্চলতা গজশিশুরূপে কল্পিত, <করভক। করহকলে=কর-ভকলে, করভ কলন করে যে। পিচিউ=চিপিউ (বর্ণ বিপর্যয়)-চাপিউ< চাপিত, চাপা হইল। জবে পিচিউ=যখন চঞ্চলচিত্ত প্রভাস্বর চিত্তদ্বারা আক্রান্ত বা পরাভূত হইল। একতারা বা বীণা বাজাইবার সময় দণ্ডটিকে হাতের দ্বারা চাপার প্রয়োজন হয়, বীণাবাদন সম্পর্কিত বাহ্যিক এই অর্থের অন্তরালে প্রভাস্বর চিত্ত কর্তৃক চঞ্চল চিত্তের পরাভব ব্যঞ্জিত। বতিশ তান্তিধনি-বত্রিশ তন্ত্রীধ্বনি। বত্রিশ নাড়ী হইতে উত্থিত শূন্যতাধ্বনি। তন্ত্রের সাধনা কায়সাধনা, ইড়া পিঙ্গলা ইত্যাদিকে আয়ত্তে আনিলে দেহমধ্যে যে অনাহত ধ্বনি উত্থিত হয় তাহা দেহের বত্রিশ নাড়ীতে ব্যাপ্ত। সএল<সকল। ব্যাপিউ—*ব্যাপিত>ব্যাপিঅ> ব্যাপিউ। 'উ' শৌরসেনী প্রভাবজাত-ব্যাপ্ত করিল। বাজিল=বজ্রধর। দেবী নৈরাত্মা। বিসমা=পরিসমাপ্তি বা বিপরীত, <বিষমা। টীকায় প্রতিশব্দ হিসাবে 'সমং নির্বাণং' লিখিত আছে। বিসমার অর্থ বিপরীত। সাধারণ নৃত্যগীতে পুরুষেরা গায়, মেয়েরা নাচে। আলোচ্য চরণে ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে তাই বিসমা। চরণটির মধ্যে তান্ত্রিক যোগক্রিয়ার গূঢ় পদ্ধতির ব্যঞ্জনা আছে। সাধারণ তান্ত্রিকধারণায় শিব বা পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল এবং শক্তি বা প্রকৃতি সক্রিয়। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে কিছু বৈপরীত্য দেখা যায়। সেখানে প্রজ্ঞা (=শক্তি) নিষ্ক্রিয় এবং উপায় (=পুরুষ, শিব) সক্রিয়। এখানে সম্ভবত তাহারই ইঙ্গিত।

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য গীতিটিতে বীণার অনুষঙ্গে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। শব্দচয়নে অনেক ক্ষেত্রেই দ্ব্যর্থকতার ইঙ্গিত। একদিকে শব্দগুলি বীণা নির্মাণ বা বাদন-প্রাসঙ্গিক, অন্যদিকে সংবৃতি বোধি-চিত্তকে বিবৃত বোধিচিত্তে পরিণত করিবার কথা। গীতিটির মধ্যে তৎকালীন সমাজের নৃত্যগীত ব্যসন ও নাটক অভিনয়ের প্রসঙ্গ লক্ষণীয়।

বীণা প্রস্তুত করিতে লাউ, তন্ত্রী ও দণ্ডের প্রয়োজন। এখানে সূর্য, চন্দ্র ও অবধূতি সেই তিনটির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সূর্য, চন্দ্র ও অবধূতি তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির তিনটি নাড়ীর নামান্তর। ইড়া পিঙ্গলার নিশ্বাস বায়ুকে সুষুম্না পথে পরিচালনা করাই তান্ত্রিক সাধনার সোপান। এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে দেহমধ্যে একপ্রকার ধ্বনি উত্থিত হয়, তান্ত্রিক পরিভাষায় তাহার নাম অনাহত ধ্বনি। এখানে তাই বলা হইয়াছে, সূর্যরূপ লাউ ও চন্দ্ররূপ তন্ত্রী অবধূতিকারূপ দণ্ডে যুক্ত হইল। বীণায় তখন অনাহত ধ্বনি বাজিল। বীণা শ্রীহেরুক নামাঙ্কিত অথবা বীণায় শ্রীহেরুক এই চতুরক্ষর ধ্বনিত হইতেছে। শূন্যতারূপ বীণাধ্বনি করুণায় পরিব্যাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আলি-কালি অর্থাৎ বাম দক্ষিণের দুই নাড়ীরূপ সারিকে (সরগমকে) আয়ত্তে আনিয়া চিত্তের প্রকৃতিদোষ (= সন্ধি) গুলিকে ধ্বংস করিতে পারিলে চিত্ত (গজবাজ) সামরস্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বীণা বাজাইবার সময় বীণাকে যেমন মাঝে মাঝে করপার্শ্বে চাপিতে হয়, করভ বা চিত্তচঞ্চলতাকে সেইরূপ প্রভাস্বর চিত্তদ্বারা চাপ দেওয়া হয় অর্থাৎ পরাভূত করা হয়। এইভাবে সাধনায় অগ্রসর হইলে বত্রিশ নাড়ী হইতে উত্থিত অনাহত ধ্বনি দিকবিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তখন সহজানন্দে প্রতিষ্ঠিত বজ্রধর নৃত্য করেন ও দেবী নৈরাত্মা গান করেন—এইভাবে বুদ্ধনাটকের পরিসমাপ্তি হয় (নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটে, অথবা বিপরীত পদ্ধতিতে বুদ্ধনাটক অনুষ্ঠিত হয়)।

দ্র. গীতিটিতে কোন ভণিতা নাই। প্রসঙ্গ বীণাবাদন তাই সম্ভবত মুনিদত্ত পদকর্তার নাম হিসাবে বীণাপাদ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। পদকর্তার নাম কি বাজিল? ৩৫ সং চর্যার বাজুলে শব্দটি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

১৮

রাগ গউড়া, কৃষ্ণবজ্রপাদানাং।

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুহ লীড়েঁ১ ॥ ধ্রু ॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহারী ভাভরিআলী।
অন্তে কুলিণজণ মাঝেঁ কাবালী ॥ ধ্রু ॥
২তুই লো২ ডোম্বী সঅল৩ বি টলিউ৩।
৪কাজ ণ৪ কারণ সসহর টালিউ ॥ ধ্রু ॥
কেহে[া]৫ কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন৬ লোঅ তোরে কণ্ঠ ণ৭ মেলঈ ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নে৮ গাই তু৮ কামচণ্ডালী।
৯ডোম্বিত আগলি৯ ণাহি১০ চ্ছিণালী ॥ ধ্রু ॥

[পুথিব পৃষ্ঠা ২৮ ক]

পা. ১. টীকা লীলেঁ। ২-২ শা. তঁইলো। ৩-৩ শা. বিটলিউ। ১-৪ শা. কাজণ। ৫. পুথি কেহে লিপিপ্রমাদ, টীকা কেহো। ৬ শা সু নী বিতুজন। ৭ শা সু নী। ৮-৮ শা গাইতু। ৯-৯ শা. ডোম্বি তআগলি। ১০ শা সু. নাহি।

অ ন্ব য়. তিন ভুবন আমাব দ্বাবা হেলায বাহিত (অতিক্রান্ত) হইল। আমি শুইযা আছি মহাসুখ নীড়ে (অথবা মহাসুখ লীলায শুইযা আছি)। ওলো ডোম্বী, কেমন তোমাব চতুবালি? অন্তে (বাহিবে) কুলীনজন, মধ্যে কাপালিক। ডোম্বী, তোমা কর্তৃক সকল বিনষ্ট হইল, কায কাবণ নাই, শশধব (বোধিচিত্ত) টলানো (ধ্বংস) হইল। কেহ কেহ তোমাকে বিরূপ (কটূক্তি) বলে। বিদগ্ধজনেবা তোমাকে কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন কবেন না। কাহ্ন গান কবেন (বলেন), তুমি কামচণ্ডালী অথবা, কাহ্নেব দ্বাবা গীত এই কামচণ্ডালী। ডোম্বী ব্যতিবেকে ছিনাল নাহি (অথবা ডোম্বীব বাড়া ছিনাল কেহ নাই)।

টী কা টি প্প নী. তিণি ভুঅণ – ত্রিভুবন, কায বাক চিত্তের ত্রিভুবন, ১৬ সং চর্যা দ্র. মই আমাকর্তৃক, <মযা। বাহিঅ অতিবাহিত, অতিক্রান্ত, <বাহিত। হেলেঁ = হেলায হলা + এঁ (এযা)। মই হেলেঁ – আমাকর্তৃক হেলায বাহিত বা অতিকান্ত হইল, (কর্মবাচ্য)। হাঁউ – আমি, ১০ম চর্যা দ্র। সুতেলি শযন কবিলাম স্বপ্ন > সুত্ত > সুত + এল ইল। + ই (উত্তম পুরুষেব বিভক্তি, <মি)। মহাসুহলীডেঁ মহাসুখরূপ নীড়ে। টীকায় লীলে, অনুসাবে অর্থ হবলীলায মহাসুখে শযন কবিযা আছি। কইসনি কেমন, * কদৃশন > কইসণ + ই (স্ত্রী, ভাভবিআলি-ব সহিত লিঙ্গসৌষম্যে)। তোহোবি = তোমার, তোব. ১০সং চর্যা দ্র.। ভাভবিআলি = চালাকি, চতুবালি, তিব্বতী অনুবাদে কুটিলকেশ অর্থাৎ আধুনিক বাংলাব বাবরি অর্থে গৃহীত। ড বাগচী ও শান্তিভিক্ষু ঐ অর্থ গ্রহণেব পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে শব্দটিব ব্যুৎপত্তি 'বর্ববীক' (সংস্কৃতাযিত দেশী শব্দ) হইতে। যাহাদের কুটিল কেশ তাহাদের ব্যবহার চতুব, এইভাবে ভাভবিআলি = চতুরালি। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সন্দেহমুক্ত নহে। বর্বরীকাবলি, বর্ববীকপালিক, অথবা অন্য অর্থে ভামভরালিকা হইতে ইহার উদ্ভব অনুমিত (দ্র. EDB. P 712)। অন্তে = বাহিরে অর্থে প্রযুক্ত, টীকায় বাহ্যে। কুলিণ – কুলীন, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও কু-তে লীন এই দুই অর্থে প্রযুক্ত। কাবালী – কাপালিক। ১০ সং চর্যা দ্র.। মহাসুখ রূপিণী ডোম্বীর দুই রূপ শুদ্ধা ও অপরিশুদ্ধা। শুদ্ধারূপে তিনি কাপালিকের অন্তরে এবং অশুদ্ধারূপে তিনি কুলীনজনের বাহিরে লীলা করেন। তঁই = তুমি, তুই; ৪র্থ চর্যা দ্র। বি < অপি। টালিউ, টলিউ = বিনষ্ট, <* টালিত (?)। কাজ < কজ্জ < কার্য। কাজ ণ কারণ – কার্য কাবণ নাই। সসহর = বোধিচিত্ত। তঁই

টালিউ = ডোম্বী, তুমি সকলকে নাশ কর। অপরিশুদ্ধ ডোম্বী বা অবিদ্যার প্রভাবে সকলই নাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে যাহারা কার্যকারণে বিশ্বাসী তাহাদের শশধর অর্থাৎ বোধিচিত্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বিরুআ = বিরূপ বাক্য, কটূক্তি শব্দটির মধ্যে দ্ব্যর্থকতা আছে। বিরুআ কাহ্নপাদের নামান্তরও বটে। বোলই = বলে, <বদতি। বিদুজণলোঅ = বিদ্বজ্জনলোক, বিদুজন<বিদ্বজ্জন। লোঅ বহুত্ব-বোধক। মেলই = ছাড়ে। ৬ সং চর্যা দ্র.। গাই = গায, গায়তি >গাঅই > গাই। ডোম্বিত আগলি = ডোম্বীর চেয়ে বড। অপাদানে 'ত'। আগলি< *অগ্রলিকা। ছিণালী - ভ্রষ্টা, কুলটা : < (অপভ্রংশ) ছিন্নালিআ। গীতিটিতে উল্লিখিত কামচণ্ডালী ডোম্বীব বিশেষণ হইতে পারে। অন্যদিকে কর্মচণ্ডালিকা চর্যাগীতির শ্রেণীবিশেষের নাম। আচার্য বিরুআর নামে 'কর্মচণ্ডালিকা নাম গীতি' রচনাব উল্লেখ আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিরুআ কাহ্নপাদের অন্য নাম। আলোচ্য চর্যাটি কি কর্মচণ্ডালিকা শ্রেণীর ?

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য গীতিটিতে ডোম্বীর সাহচর্যে লব্ধ মহাসুখের স্বরূপ বর্ণনা করা হইযাছে। তু° ১০ এবং ১৯ সং গীতি।

সহজানন্দ লাভ করিতে হইলে কায-বাক-চিত্তের অতীত হইতে হয়। পদকর্তা তাই বলিতেছেন, তিনি কায-বাক-চিত্ত রূপ তিন ভুবনকে অবলীলায় অতিক্রম করিযা আসিযা এখন মহাসুখ-নীডে সুখনিদ্রায় মগ্ন। ডোম্বী বা নৈরাত্মার সাহচর্যেই এই মহাসুখ লভ্য। এই ডোম্বীর দুই রূপ -- শুদ্ধ ও অপবিশুদ্ধ। অশুদ্ধ বা অবিদ্যারূপে ইনি বাহ্যজগতে, রূপজগতে লীলামগ্ন, শুদ্ধরূপে ইনিই আবার কাপালিকের অন্তরে অবস্থানকারী। আপাত অর্থে এখানে ডোম্বীকে কুলটা রমণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তিনি তাই একদিকে যেমন অভিজাত (কুলীন) ব্যক্তিদেব সহিত সম্পর্কিত, অন্যদিকে কাপালিকেব সহিতও তাঁহাব যোগাযোগ। তাত্ত্বিক অর্থে ডোম্বীর দুই স্বরূপই উদ্দিষ্ট। (১০ম গীতেও অনুরূপভাবে ডোম্বীর দুই রূপ এবং তাঁহাব সহিত একদিকে 'ব্রাহ্মণ নাডিআ' অন্যদিকে কাপালিকের সম্পর্কের কথা বলা হইয়াছে।) অশুদ্ধ ডোম্বীর অবিদ্যা-প্রভাবে সমস্তই বিনষ্ট হয়। যাহারা কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী তাহাদের চিত্তও অবিদ্যা-প্রভাবে ধ্বংস হয়। বুদ্ধদেব কার্যকারণ-নিয়মকে মূলীভূত সত্য বলিযা স্বীকার করেন নাই। ইহার পরিবর্তে তিনি 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' মত স্থাপন করিয়াছিলেন। (দ্র দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়)। চরণটির মধ্যে কার্য-কারণতত্ত্ব যে ভ্রান্ত তাহার ইঙ্গিত আছে। ডোম্বীকে কেহ কেহ মন্দ বলে, অর্থাৎ অশুদ্ধ অবধূতিকার প্রভাবে যাহারা দুঃখ ভোগ করে অথবা যাহারা সাধনার গূঢ় তত্ত্ব জানে না তাহারা ইহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু যাঁহারা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা কখনও ইহাকে কণ্ঠ (সম্ভোগচক্র) হইতে বিচ্ছিন্ন করেন না। পদকর্তা ডোম্বীর এই দ্বিবিধ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন ; তাই একদিকে যেমন

তাহার প্রশস্তি গান করিয়া তাহাকে কর্ম-চণ্ডালী (কর্মকুশলা) বলিতেছেন, অন্য-দিকে তাহার অপেক্ষা ভ্রষ্টা রমণী আর কেহ নাই, তাহারও উল্লেখ করিতেছেন।

১৯

রাগ ভৈরবী কৃষ্ণপাদানাং

ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা১ ॥ ধ্রু ॥
জঅ জঅ ২দুংদুহি সাদ২ উচ্ছলিআঁ৩।
কাহ্ন ডোম্বি৪ বিবাহে চলিআ৫ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বি৬ বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু৭ ধাম ॥ ধ্রু ॥
অহিণিসি৮ সুরঅপসঙ্গে জাঅ।
জোইণিজালে রএণি পোহাঅ৯ ॥ ধ্রু ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে১০ জো জোই রত্তো।
খণহ ণ ছাড়অ সহজউন্মত্তো ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ২৯ ক-খ]

পা ১. শা কশালা। ২-২. শা দুন্দুহি সাদ। সাদ সম্ভবত লিপিপ্রমাদ। ৩ নী উছলিআঁ। ৪ শা স্থু. ডোম্বী। ৫. স্থু. চলিলা। ৬ শা ডোম্বী। ৭ পুথিতে আমুণুতু লিখিয়া মু বর্জিত। ৮ টীকা অহনিসি। 'অহি' লিপিপ্রমাদ। ৯ পুথিতে পোহাএ-এর প অন্তরূপ। লিপিকর প্রথমে ভুল করিয়া য লিখিয়া পরে প করিয়াছেন। ১০. স্থু. সঙ্গে।

অ ন্ব য : ভব ও নির্বাণ [হইল] পটহ ও মাদল। মন ও পবন [হইল] জোড়া করণ্ড (=কাঁড়া) ও কসালা (কাঁসি)। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত [হইল], কাহ্ন ডোম্বী-বিবাহে চলিল। ডোম্বী বিবাহ করিয়া জন্ম আহার করিল (=জাতি গেল)। যৌতুক করা হইল অনুত্তরধর্ম (অথবা জাতি গেল কিন্তু অনুত্তরধাম=গৃহ যৌতুক স্বরূপ পাওয়া গেল)। অহর্নিশি অতিবাহিত হয় সুরত প্রসঙ্গে, যোগিনীজালে (=যোগিনীপরিবৃত অবস্থায়) রজনী প্রভাত হয়। ডোম্বীর সঙ্গে যে যোগী রত [হয়], সেই সহজ উন্মত্ত [আর তাহাকে] ক্ষণমাত্র ছাড়ে না।

টী কা টি প্প নী : ভবনির্ব্বাণে=ভব ও নির্বাণ। পড়হ=ঢাক, <পটহ। মাদলা=মাদল, <মর্দলক। মণ পবণ বেণি=মন ও পবন, এই দুইটি। বেণি= দুই, ১ চর্যা দ্র.। করণ্ড=কাঁড়া, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কসালা=কাঁসি, <কাংস্যতাল। কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষে করণ্ডহো শব্দটি এবং মেখলা নামক টীকায় করণ্ডক

(ধর্মকরণ্ডক, বুদ্ধরত্নকরণ্ডক) শব্দ পাওয়া যায়। সেখানে করণ্ডক শূন্যতা-করুণার অভিন্নত্বরূপিণী ধর্মচক্রে উদ্ভূত মহামুদ্রারূপে বর্ণিত এবং বজ্রধরের কণ্ঠাভরণ, সর্ব-সৌখ্যের আধাররূপে কল্পিত। বাহ্যিক অর্থে শব্দটি বিবাহযাত্রায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। তাত্ত্বিক দিকে, করণ্ড শূন্যতা ও করুণার অভিন্নত্বে তান্ত্রিক পদ্ধতির মুদ্রা রূপে কল্পিত। ডুংডুহি = ডুন্দুহি < দুন্দুভি ; বাদ্যযন্ত্র। সাদু = সাদ < শব্দ। উচ্ছলিআঁ < উচ্ছলিত। চলিআ = চলিল < চলিত। বিবাহিআ = বিবাহ করিযা ,< বিবাহিত্বা ; নামধাতু। অহারিউ = আহার করা হইল, নষ্ট করা হইল : *আহারিত > আহারিঅ > আহারিউ, অহারিউ (আদি ভিন্ন অন্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে)। জাম < জন্ম = জাতি। আণুতু = অনুত্তর, শ্রেষ্ঠ। ধাম = ধর্ম ; ধাম = গৃহ। সুরঅ < সুরত। পসঙ্গে < প্রসঙ্গে। জাঅ < যাতি। জোইণিজালে—যোগিনীর সঙ্গে ; টীকায—জ্ঞানরশ্মিনা, জ্ঞানরশ্মির জ্যোতিতে। রএণি = রজনী। ভাষাতাত্ত্বিক নিযমানুসারে রঅণি হওযা উচিত। চর্যায 'অ'-স্থানে 'এ'-র নিদর্শন অনেক আছে ; সঅল/সএল। পোহাঅ = পোযায় ; প্রভাতি > পোহাই > পোহাঅ। জো = যে। জোই < যোগী। রত্তো < রক্ত ; অনুরক্ত অর্থে। খণহ = মুহূর্তের জন্য ; < ক্ষণস্য। ছাড়অ = ছাড়ে ; < ছর্দতি। সহজউন্মত্তো = সহজানন্দে মত্ত।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য গীতিটিতে বিবাহের রূপকে ডোম্বীর সহিত মিলন এবং তাহাব ফলস্বরূপ মহাসুখ লাভের কথা বলা হইয়াছে। চর্যাটিব মধ্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিবাহযাত্রা কিরূপ ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওযা যায। প্রসঙ্গত লক্ষণীয, কাহ্নপাদের দুইটি পূর্ববর্তী গীতিতে (১০, ১৮) ডোম্বীর সহিত অবৈধ মিলনের ইঙ্গিত আছে। আলোচ্য চর্যায বিবাহের কথা।

বিবাহযাত্রা প্রসঙ্গে যেমন বাদ্যভাণ্ড থাকে, সাধনতাত্ত্বিক এই রূপক-বিবাহে তেমনি ভব-নির্বাণ, মন-পবন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র রূপে কল্পিত হইয়াছে। দ্বৈতজ্ঞান-বিমুক্ত সাধনপথারূঢ় কাহ্ন পরিশুদ্ধাবধূতিকা ডোম্বীর সহিত বিবাহের জন্য চলিলেন। দুন্দুভি শব্দ, অনাহত নাদ। ডোম্বীর সহিত বিবাহের ফলে কাহ্নের জাতি গেল, যদিও পরম যৌতুক অনুত্তরধাম লাভ হইল। তাত্ত্বিক অর্থে, ডোম্বী-বিবাহ করিয়া কাহ্ন পুনর্জন্ম 'আহার করিলেন' অর্থাৎ পুনর্জন্মের পথরোধ করিলেন এবং যৌতুকস্বরূপ শ্রেষ্ঠধর্ম লাভ করিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠানের পর মিলন-প্রসঙ্গ। যোগিনীর সাহচর্যে অহর্নিশ সুরত-প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়। নৈরাত্মার সাহচর্যে দিবারাত্রি সহজানন্দে কাটে। একবার যে যোগী ডোম্বীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে একবার এই সাধনপথে সহজানন্দের আস্বাদন পাইয়াছে, সে আর ক্ষণমাত্র এই পথ ছাড়িতে পারে না।

২০

রাগ পটমঞ্জরী কুক্কুরীপাদানাং

হাঁউ নিরাসী ১খমণ ভতারে১ ।
মোহোর বিগোআ কহণ ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
ফেটলিউ২ গো মাএ অন্তউড়ি২ চাহি ।
জা এথু বাহাম৩ সো এথু নাহি ॥ ধ্রু ॥
পহিল বিআণ মোর বাসনযূড়৪ ।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাযূড়া৫ ॥ ধ্রু ॥
জা ণ৬ জৌবণ মোর ভইলেসি পূরা ।
মূল ম খলি৭ বাপ সংঘারা ॥
ভণথি কুক্কুরি৮ পা এ৮ ভব থিরা ।
জো এথু বুঝএ৯ সো এথু বীরা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৩০খ]

পা. ১. শা. খমণভতারে। মিলের জন্য ভতারি সম্ভব। রে-এর এ-কার কিছুটা সরলরেখার মত, বৃত্তচাপের মত নয়। লিপিতে ই-কারের চৈতন বাদ পড়িযাছে ধরিলে ভতারি পাঠ করা চলে। ২. টীকা ফিটলেসু। ৩. পুথিতে স্পষ্ট বাহাম। অর্থানুসারে চাহাম হইতে পারে, কিন্তু এখানে লিপিতে চ-কে ব মনে করিবার সুযোগ নাই। ৪. পুথিতে বাসনযূড়। শা. যূড় পাঠ করিযাও টীকার 'বাসনা পুট' অনুসারে বাসনপূড় পাঠ দিযাছেন। পরের চরণের বাযূড়া-র সহিত অন্ত্য-মিলের সঙ্গতির জন্য ড়-এর পর দাঁড়িটিকে আ-কার ধরিলে চরণ সমাপক দাঁড়ি বাদ পড়িযাছে ধরিতে হয। ৫. পুথি বাযুড়া। টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন বাপূড়া। ৬. টীকা নব। মূলে সম্ভবত 'জা ণঅ জৌবণ' পাঠ ছিল। ৭. শা. সু. ন খলি। নী. ণ খলি। পুথিতে স্পষ্ট মখলি। ৮-৮ শা. পাএ। ৯. শা. বুঝ এঁ।

অ ন্ব য়: আমি নিরাশ [হইয়াছি]; [আমার] ভর্তা খমন (শূন্যমনা ক্ষপণক হইয়াছে)। আমার বিকোপের (প্রণয়কোপের) কথা বলা যায় না। প্রসব করিলাম, মা গো, আঁতুড় [ঘর] চাহি। যাহা এখানে বহন করি তাহা এখানে নাহি, অথবা যাহা চাহি তাহা এখানে নাই। [এই] আমার প্রথম প্রসব, বাসনার পুঁটলি। নাড়ী বিচার করিতে দেখা গেল, সে বাউরা (অপদার্থ)। জ্ঞান-যৌবন (অথবা নব যৌবন) আমার পূর্ণ হইল, মূল দেখিলাম (উচ্ছেদ করিলাম), পিতাকে (মূলকে) সংহার করিলাম (?)। কুক্কুরীপাদ বলেন, এ ভব স্থির ; যে এখানে বোঝে সেই এখানে বীর।

টী কা টি প্প নী : হাঁউ=আমি, ১০ সং চর্যা দ্র.। নিবাসী=আশাশূন্য, নিরাশ, টীকানুসারে 'আসঙ্গ রহিতা'। তিব্বতী অনুবাদে কাম, তৃষ্ণা বা আসক্তিশূন্য। খমণ—আকাশ (খ) বা শূন্যস্বরূপ মন যাহার অর্থাৎ শ্রমণ বা ক্ষপণক। ভতারে স্বামী, <*ভর্তার=ভর্তা+এ (অধি.)। আধুনিক গ্রাম্য প্রয়োগ ভা তার। মোহোর—আমার, মোহো+র (৬ষ্ঠী)। মোহ বা মোহো-এর ব্যুৎপত্তি *মহ্যম্>মোহ, অথবা মম>মো+হ (নিশ্চযার্থে), অথবা *মমস্য>মোহ। তু° তোহোরি ১০, ১৮ চর্যা। বিগোআ 'বিশিষ্ট সংযোগাক্ষর সুখানুভবঃ' টীকা, মিলনসুখ (?), সহজানন্দ, মহাসুখ, বিকোপ (প্রণয়কোপ) >বিগোব > বিগোআ। কহণ ন জাই=কওয়া [=বলা] যায় না। যৌগিক কর্মবাচ্য। আধুনিক কালে এ-জাতীয় প্রয়োগ কেবল বঙ্গালীতেই পাওয়া যায়। ফেটলিউ= মুক্ত হইল, গর্ভমোচন হইল, স্ফেটিত+ইল >ফেটিউ+ইল >ফেটলিউ (বিপর্যাস)। অন্তউড়ি=আঁতুড়ঘর, <অন্তঃকুটী। চাহি=দেখি, টীকায় 'দৃষ্টা', প্রসঙ্গ-অনুসারে— চাই। এথু এখানে, *এত্র (=অত্র) >এত্থ >এথু। বাহাম—বহন করি (গর্ভ ?), পাঠান্তর চাহাম চাই, দেখি। জা নাহি—আপাত অর্থে, যাহা চাই বা বহন করি তাহা এখানে নাই, তাত্ত্বিক অর্থে, যাহা দেখি বা যে বাসনা মনে বহন করি অর্থাৎ বাহ্যিক রূপজগৎ, তাহা লয়প্রাপ্ত। পহিল— প্রথম, পূরণবাচক শব্দ প্রথ(ম)+ইল্ল>পহিল্ল>পহিল। বিআন প্রসব, আধুনিক কালে অশিষ্ট প্রয়োগ। <সং √বী+আন, অথবা <* বিযাপন, বিয• বিমুক্ত. দ্র EDB, vol II, P 654 বাসনযড় বাসনপুট>বাসনপুড় >বাসনযুড়। পাঠ র সনবুড়া হইলে <বাসনা পুটক। বাসনার আশ্রয় অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত-প্রসূত দেহ। বিআরন্তে—বিচার করিতে বা কাটিতে, <বিচারন্তে বা <বিদারন্তে। বিচার/বিদার>বিআর+অন্ত+এ, অসমা, সের —<সা এব, সৈব। বাষুড়া=অপদার্থ। <বাতুলক>বাউলা>বাউরা>বাষুড়া। অথবা <বাযবৃত্তক (?)। = অপদার্থ, বেচারা, <*বপ্রপুটক। জাণ <জ্ঞান অথবা জা ণ যৌবণ যে নব যৌবন। ভইলেসি—হইলে (মধ্যমপুরুষ), চর্যায় এইরূপ প্রয়োগ নিলেসি (৩৯), আইলেসি (৪৪) সবই মধ্যমপুরুষে, কিন্তু মধ্যম পুরুষ ধরিলে এখানে অর্থোদ্ধার হয় না। টীকায় 'ভূতোহসি'। এখানে 'হইল' অর্থ গ্রহণীয়। জা পূরা=যখন নব যৌবন পূর্ণ হইল, অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইল। পূরা—পূর্ণ, <পূরক। মুল=সংবৃতি বোধিচিত্ত। ম খলি<ময়া স্খলিতং, আমার দ্বারা স্খলিত, উচ্ছিন্ন। তিব্বতী অনুবাদে 'fallen down' এবং টীকায় 'নিকৃত্তি', এই অর্থের সমর্থক। টীকার মতে পূর্ববর্তী শব্দ মুল=সংবৃতি বোধিচিত্ত। মূল সংঘারা=সংবৃতি বোধিচিত্ত উচ্ছিন্ন, সুতরাং বাসনা প্রসবের জনকও নিহত। বাপ<(অব•) বপ্প<বপ্র। সংঘারা=সংহার করা হইল। থিরা<স্থির। জো<যঃ। বুঝএ<*বুধ্যতে=বুধ্যাত।

ব্যা খ্যা সং কে ত : গ্রাম্য রমণীর প্রসব বর্ণনার রূপকে এখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণিত। বাহ্যত তাই প্রসব-সম্পর্কিত শব্দাবলী প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে নৈরাত্মা নিজেই নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন। পদকর্তা নৈরাত্মাযোগিনীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার ও নৈরাত্মার উক্তি এক হইয়া গিয়াছে।

মন বিষয়াসক্তিহীন (নিরাসী) হইয়া শূন্যতাজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এরূপ মনই স্বামীস্বরূপ। এরূপ পারমার্থিক বোধিচিত্ত লাভে যে পরম আনন্দলাভ হয় তাহা অনির্বচনীয়। পরবর্তী দুই চরণের আপাত অর্থ, আমি গর্ভমোচন করিয়াছি, আঁতুড় চাহি, কিন্তু যাহা চাই (যে ইচ্ছা মনে বহন করি) তাহা এখানে নাই। অধ্যাত্ম অর্থে, মহাসুখধাম (অন্তউড়ি) লক্ষ্য করিয়া (অগ্রসর হইয়া) চিত্ত প্রকৃতিপ্রভাস্বরত্ব লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছে, তাই চারিদিকে চাহিয়া যাহা কিছু দেখা যাইতেছে— এই রূপজগৎ— তাহা সকলই ভ্রান্তি বা মায়ামাত্র, অস্তিত্বহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আপাত অর্থে পরবর্তী পংক্তিদ্বয়ের বক্তব্য, বাসনা-পুটলি আমার এই প্রথম প্রসব, নাড়ী কাটিতে গিয়া তাহাও নষ্ট হইল। ব্যঞ্জিত অর্থে, বাসনাপুট দেহ মনেরই প্রথম প্রসব অর্থাৎ বাসনাসমষ্টি মনেরই সৃষ্টি, কিন্তু পরে দেহের বত্রিশ নাড়ী বিচার করিয়া জানা গিয়াছে ইহা অতি নীচ পদার্থ, বাসনাপূর্ণ এই দেহ মূল্যহীন। যখন পূর্ণ জ্ঞানোদয় হয় তখনই ইহা জানা যায়। সংবৃতি বোধিচিত্তই পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার মূল ; তাই সেই বাসনার জনক (বাপ) সংবৃতি বোধিচিত্তকে সংহার করা হইল, অর্থাৎ পারমার্থিক বোধিচিত্তে তাহাকে লীন করা হইল। এইভাবে বাসনার মূল উচ্ছেদ করিলে জানা যায়, এই ভব সংসার, যাহা আপাত দৃষ্টিতে চঞ্চল, উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহা বস্তুত অচঞ্চল যিনি এইভাবে বুঝিতে পারেন তিনি বীরপদবাচ্য, সিদ্ধপুরুষ।

গীতিটিতে প্রথম পুত্রবতী একটি গ্রাম্য রমণীর মন ও দারিদ্র্য-দুঃখপূর্ণ বাস্তব পরিবেশের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যঞ্জনায় কবির নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। প্রথম দিকের কয়েকটি চরণে একদিকে বাহ্যিক প্রসব-সম্পর্কিত বর্ণনা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পদে পদে দ্ব্যর্থকতার মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হওয়ায়, দীপ্তিমান চমৎকৃতিতে সহজেই পাঠকচিত্তে একটি রম্যবোধ জাগ্রত হয়। অবশ্য শেষ দিকে, বিশেষত শেষ দুই চরণে কবি এই আড়ালটুকু পরিত্যাগ করিয়া সোজাসুজি আধ্যাত্মিকতায় অবতরণ করিয়াছেন। কবিতাটির মধ্যে ভতার, বিআন প্রভৃতি অশিষ্ট গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ রূপকটিকে বেশ জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে, কারণ বাহ্যিক দিকে বর্ণিত বিষয়ের মূল আলম্বন একটি গ্রাম্য রমণী।

২১

রাগ বরাড়ী ভুসুকুপাদানাং

১নিসিঅ১ অন্ধারী১ ২মুসার চারা২
অমিঅভখঅ৩ মুসা করঅ আহারা ॥ ধ্রু ॥
৪মার রে৪ জোইআ মুসা পবণা।
জেঁণ তুটঅ অবণা গবণা ॥ ধ্রু ॥
ভববিংদারঅ৫ মুসা খণঅ গাতী।
চঞ্চল মুসা কলিআঁ নাশঅ৬ থাতী ॥ ধ্রু ॥
কলা৭ মুষা৮ উহ ণ৮ বাণ।
গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ ॥ ধ্রু ॥
তব সে৯ মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।
সদগুরু বোহে করিহ সো ণিচ্চল১০ ॥ ধ্রু ॥
জবেঁ মুষাএর১১ চা[রি]১২ তুটঅ।
ভুসুকু ভণঅ তবেঁ বান্ধন ফিটঅ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৩১ খ—৩২ ক]

পা. ১-১. টীকা নিসি আন্ধারী। পুথির নিসিঅ-এর অ সম্ভবত পরবর্তী অন্ধারী-র অ ভ্রমক্রমে দু'বার লেখার ফল। ২-২. শা. সুসার; কিন্তু তিনি পাঠবিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। নী. মুসা চটারা। মুসা-র পর র বর্ণটি স্পষ্ট। তাহাকে চ পড়া চলে না। ইহার পর চা কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু লক্ষ্য করিলে চা বোঝা যায়। শুদ্ধ পাঠ নিঃসন্দেহে মুসার চারা। র-কে ব মনে করিযা মুসা বচারা পাঠ অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা মাত্র। ৩. নী. অমিয়া। ৪-৪. শা. মাররে। ৫. শা. বিন্দারঅ। ৬. শা. সু. নী. নাশক। ৭. টীকা কাল। শুদ্ধপাঠ সম্ভবত তাহাই। ৮-৮. শা. উহণ। ৯. সু. যে। ১০. শা. সু. নিচ্চল। ১১. শা. মুষা এর। ১২. পুথি চা। নী. (অ) চা [রি]।

অ ন্ব য় : নিশি অন্ধকার মূষিকের চারণা (= আহার সন্ধান) [আরম্ভ হইল]। অমৃতভক্ষক মূষিক [অমৃত] আহার করে, অথবা অমৃত নষ্ট করে মূষিক, এবং আহার করে। রে যোগি, মূষিক পবনকে মার, যাহাতে টুটিয়া যায় [তাহার] আনাগোনা। ভববিন্দারক মূষিক গর্ত খনন করে। মূষিক চঞ্চল [ইহা] জানিয়া [তাহার] নাশের জন্য স্থিতি [= প্রস্তুতি ?] কর, অথবা চঞ্চল মূষিক [সমস্ত কিছু] কবলিত করিয়া নাশ করিয়া থাকে। কালো মূষিক [তাহার] বর্ণ বোঝা যায় না। গগনে উঠিয়া মূষিক আমন ধানের [ক্ষেত্রে] বিচরণ করে। (অন্য অর্থে, গগনে উঠিয়া মূষিক 'অমনোধ্যান' ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে উঠিলে

মনদ্বারা আর ধ্যান করিতে হয় না, সেই ক্ষেত্রে বিচরণ করে)। ততক্ষণ মূষিক উঞ্চল পাঞ্চল (=চঞ্চল) [যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহাকে] সদ্‌গুরু বোধের দ্বারা নিশ্চল কর। যখন মূষিকের বিচরণ টুটিবে, ভুসুকু বলেন, তখন ভববন্ধনও দূরীভূত হইবে।

টী কা টি প্প নী : অন্ধারী=অন্ধকার ; অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার অন্ধকার। টীকায় আন্ধারী ; এই ধরনের পার্থক্য সম্ভবত ভাষায় পরিবর্তন-যুগের চিহ্নবহ। চর্যাগীতির ভাষা অধ্যায় দ্র.। অন্ধারী স্ত্রীলিঙ্গ ; নিশির সহিত লিঙ্গ সৌষম্যে। অন্ধকার>অন্ধার+ঈ (স্ত্রী) ; বিণ। মুসার=মূষিকের, সংবৃতি বোধিচিত্তের। মুসা+র (৬ষ্ঠী) ; মুসা< মূষক। চারা=চারণ, বিচরণ। অমিঅভখঅ< অমৃতভক্ষক। যদি পদবিভাগ অমিঅ ভখঅ এইভাবে করা হয় তবে ভখঅ< ভখই< ভক্ষতি এই ব্যুৎপত্তি ধরিতে হয়। তখন √ভক্ষ=নষ্ট করা অর্থে প্রযুক্ত। অর্থাৎ মূষিক অমৃত নষ্ট করে। করঅ<করোতি। আহরণ অর্থে আহারা এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সু. সেন। প্রসঙ্গানুসারে এই ব্যাখ্যা খুব সঙ্গত নয়। অমিঅ ··আহারা–বোধিচিত্ত যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকে তখন তাহা নিজের চিত্তের অমৃত নিজেই ভক্ষণ করে। নির্মাণকায়ে চিত্ত সংবৃতি বোধিচিত্ত, কিন্তু এই চিত্তই আবার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ত তাই অমৃতস্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত উহার স্বরূপ নষ্ট করে। জোইঅ=যোগী, সম্বোধনে ; < যোগিক। মুসা পবণা=চিত্ত পবনকে ; বোধিচিত্তের দুটি দিক— প্রজ্ঞা ও উপায় (=শূন্যতা ও করুণা) তন্ত্রের প্রাণ ও অপান বায়ু। চিত্ত তাই পবন। জেন=যাহাতে ; < যেন। তুটঅ–টুটিয়া যায় ; < ত্রুট্যতে। অবণা গবণা= আনাগোনা, < অবন (=গমন) +আগমন। অথবা < *অয়নক+গমন (ক)। ভববিন্দারঅ=টীকার মতে ভব=স্বকায়। মূষিক প্রকৃতিচাঞ্চল্য বশত নিজদেহ বিদারণ করিতেছে, অর্থাৎ চিত্তের সহজ স্বরূপকে নষ্ট করিতেছে। অথবা মূষিক যেমন পৃথিবী খনন করিয়া নিজের আবাসস্থান প্রস্তুত করে, চিত্ত মূষিকও সেইরূপ গর্ত করিয়া, চিত্তের সহজ স্বরূপকে নষ্ট করিয়া মায়াচ্ছন্ন মনের আশ্রয় প্রস্তুত করে। বিন্দারঅ <*বিন্ধকারক=বিদারক। খনঅ<খনতি। গাতী =গর্ত, অধোগমনের পথ ; অথবা ভিত্তি <গাত্রিক। কলিআঁ=গণিয়া ; বুঝিয়া ; <কলিত্বা, (স্বতোনাসিকীভবন)। অথবা কবলিত করিয়া এই অর্থ ধরিলে ব্যুৎপত্তি, কবলয়িত্বা> কলিআ। নাশক=নাশের নিমিত্ত (৪র্থী)। <নাশক অথবা ক্রিয়াপদ রূপে, নাশ করে, এই অর্থও করা চলে। নাশয়তি>নাশই >নাশঅ। থাতী<*স্থাতি=স্থিতি। বি.। ক্রিয়ারূপে অর্থ, থাকে। কলা=কাল+কৃষ্ণবর্ণ, কালস্বরূপ ; স্থান কাল ইত্যাদির বাহ্যিক জ্ঞান হইতে দুর্গতির উদ্ভব। চিত্তে ঐ জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। চিত্ত-মূষিক তাই কালস্বরূপ। উহ ন বাণ=কোন বর্ণের বোধ হয় না। উহ< উহ্যম্। বাণ< বর্ণ। কাল

বাণ=সাধারণ অর্থে, মূষিক কৃষ্ণবর্ণ, রাত্রিতে বিচরণ করে তাই তাহার বর্ণ বোঝা যায় না। অন্ধকারে কালো রং মিশিয়া যায়। তাত্ত্বিক অর্থে, মূষিক কালস্বরূপ কিন্তু তাহা বোঝা যায় না। গঅনে=মহাসুখচক্রে। চরঅ< চরতি। গঅনে ··ধান=সংবৃতি বোধিচিত্ত যখন পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়, তখন আর তাহার মনোধ্যানের প্রযোজন হয না। তব< তাবৎ। উঞ্চল পাঞ্চল= চঞ্চল, চলিত ভাষায় হাঁচড় পাঁচড়; উচ্চল (?) < উঞ্চল (নাসিক্যীভবনের ফলে) + পাঞ্চল (সহযোগী শব্দ)। নিচ্চল<নিশ্চল। জবে< যদ্বৎ। চার= আচার। তবে < তদ্বৎ। বান্ধন—বাঁধন। ফিটঅ< প্রা. √ফিট্ট; ১২ সং চর্যা ফীটউ দ্র.।

ব্যা খ্যা সং কে ত : চিত্তের দুটি রূপ—প্রকৃতি দোষযুক্ত, চঞ্চল, সংবৃতিচিত্ত, এবং পারমার্থিক, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃতিপ্রভাস্বর। চিত্তের এই দুই রূপের কথা ৬ সং চর্যা ও অন্যত্র বহুবার উক্ত হইয়াছে। এখানেও মষিকের রূপকে চিত্তের দুই রূপের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাত্রির (অজ্ঞানতার) অন্ধকারে মূষিকের (চঞ্চল চিত্তের) আনাগোনা। এই চঞ্চলচিত্তরূপ মূষিক দেহভাণ্ডে অবস্থিত সমস্ত অমৃত আহার করে। সুতরাং যোগীর উচিত পবনরূপ চিত্তমুষিককে হত্যা করা। অর্থাৎ প্রাণ অপান বায়ুকে আয়ত্তে আনা। এই মুষিকই ভবজ্ঞান বিস্তার করে এবং আমাদের পতনের জন্য গর্ত খনন করে। মূষিকের এই চঞ্চল স্বরূপ বুঝিয়া তাহার নাশের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয। অথবা, মুষিক চঞ্চল, সে সবকিছু নাশ করে। মূষিকই কাল-স্বরূপ অর্থাৎ কালজ্ঞানের জন্মদাতা। তাহার বর্ণচিহ্ন কিছুই জানা যায় না। কিন্তু সেই মূষিকই (চিত্ত) যখন মহাসুখ-কমলে প্রবেশ করে, তখন অমৃত পান করে। সুতরাং সেই চঞ্চল মূষিককে সদগুরু বচনে নিশ্চল কর। মূষিকের চঞ্চলতা দূর হইলে ভববন্ধনও দূর হয়।

মূষিকের রূপকে এখানে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চঞ্চল চিত্তরূপ মূষিক মিথ্যাজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া নানা দুঃখবিপর্যয় আনে। সেই চিত্তই আবার সদ্গুরু-বচনে স্থিরতা লাভ করে ও মহাসুখকমলে অমৃত পান করে।

২২

রাগ গুঞ্জরী সরহপাদানাং

অপণে রচি রচি₁ ভব নির্বাণা₂।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা₃॥ ধ্রু॥
অম্হে₃ ন জাণহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥ ধ্রু॥

জইসা৪ জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি ৫ বিশেসো॥ ধ্রু ॥
৬জা এথু ৬ জাম মরণে ৭ বি সঙ্কা ৭।
সো করউ রস রসাণেরে৮ কংখা৯॥ ধ্রু ॥
যে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিম্পি ন হোন্তি॥ ধ্রু ॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৩৩ খ]

পা. ১. শা. ভবনির্বাণা। ২. শা. স্থ. অপনা। ৩. টীকা অহ্মে ৪. শা. নী. জইসো। পরবর্তী তইসোর সঙ্গে সাদৃশ্যে জইসো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এটিকে জইসো পড়িতে হইলে সো-এর ও-কার নাগরী লিপি ধরিতে হয়। এই পুথিতে তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সেই ও-কারের মাথার ছত্রাকৃতি অংশ নিতান্তই অস্পষ্ট, সন্দেহজনক। পরবর্তী তইসো, বিশেসো ইত্যাদির সো সুস্পষ্ট বাংলা লিপির ও-কার যুক্ত। হয়ত জইসো-ই উদ্দিষ্ট ছিল। ও-কারের সামনের ে-কার অংশ ছাড় গিয়াছে। ৫. নী. নাহি। ৬-৬. শা. জাএথু। ৭-৭. শা. বিসঙ্কা। ৮. শা. স্থ. রসানেরে। ৯. শা. কখা। পুথি অস্পষ্ট। তবে ক এবং খা-এর মধ্যে ফাঁক আছে। অনুমান হয় ং ছিল।

অ ন্ব য় : নিজেরাই ভব ও নির্বাণ রচিয়া রচিযা মিথ্যাই লোকে আপনাকে বাঁধে। আমরা অচিন্ত্যযোগীরা জানি না, জন্ম, মরণ, ভব [ইত্যাদি] কেমন করিয়া হয়। জন্মও যেমন মরণও তেমনি। জীবিতে ও মৃতে কোন পার্থক্য নাই। যাহারা এখানে জন্মে ও মরণে শঙ্কিত, তাহারাই রসরসায়নকে আকাঙ্ক্ষা করুক। যাহারা সচরাচর ত্রিদশে ভ্রমণ করে তাহারা অজরামর কিছুই হয় না। জন্ম হইতে কম কি কর্ম হইতে জন্ম, সরহ বলেন অচিন্ত্য সেই ধর্ম বা ধাম।

টী কা টি প্প নী : অপণে = নিজে নিজেই : *আত্মনেন (= আত্মনা) > অপ্পণেং > অপণে। মিছে = মিথ্যা > মিচ্ছা > মিছ + এঁ(ওয়া)। অপণা = নিজদিগকে; আত্মনঃ > আপ্পণ > আপণা > অপণা। অম্হে = আমরা ; < অস্মাভিঃ। জাণহুঁ = জানি ; জাণ + হুঁ (= হুঁ), (উত্তমপুরুষ বর্তমান কালের বিভক্তি, বহুবচনে প্রযুক্ত)। অচিন্ত জোই = অচিন্ত্যযোগী, তত্ত্বজ্ঞানী। জাম < জন্ম। কইসণ = কেমন করিয়া, <* কদৃশন। হোই = হয় ; ভবতি > ভোদি > হোদি > হোই। জইসা = জইসো = যেমন ; < যাদৃশ। বি < অপি। তইসো = তেমন ; < তাদৃশ। জীবন্তে = জীবিতাবস্থায়। জীব + অন্ত্ (শতৃ) + এ (অপাদান অধিকরণ)। মঅলেঁ = মৃতে, মৃতাবস্থায় ; মৃত + ইল > মইল > মঅল + এঁ (৭মী)। জা =

যার ; যস্ত>জস্‌স>জাহ>জা। এথু=এখানে। ২০ সং চর্যা দ্র.। করউ= করুক ;< করোতু। রসরসানেরে=রসরসায়নের বা রসরসায়নকে (৬ষ্ঠী বা ২য়া)। যোগপন্থায় বিশ্বাসী সাধকদিগের মধ্যে রসায়নবাদী একটি সম্প্রদায় ছিলেন যাঁহারা রসরসায়ন অর্থাৎ ওষধি ইত্যাদির (মুখ্যত পারদের) সাহায্যে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভের কল্পনা করিতেন। অমৃতত্বকে তাঁহারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দৈহিক অমরতাকেই সিদ্ধি বলিয়া মনে করিতেন। এই রসায়নবাদ একদিকে যেমন ভারতীয় নাথ সিদ্ধাগণের সহিত যুক্ত, অন্যদিকে চীন তিব্বত ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কংথা - আকাঙ্ক্ষা। তিঅস=ত্রিদশ, দেবলোক ; তিনটি দশা— বাল্য, কৈশোর ও যৌবন মাত্র যাহাদের, অর্থাৎ দেবতা। ভমন্তি=ভ্রমণ করে ; < ভ্রমন্তি। কিম্‌পি< কিমপি (মধ্যস্বর লোপ)। হোন্তি< ভবন্তি। জামে=জন্ম হইতে ; অপাদানে এ (অধিকরণ) বিভক্তি। টীকায় করণরূপে উল্লিখিত। উভয় রূপেই ব্যাখ্যা সম্ভব। কামে=কর্ম হইতে বা কর্মের দ্বারা। জামের অনুরূপ। অচিন্ত< অচিন্ত্য। সো< সঃ। ধাম< ধর্ম। অথবা ধাম=আবাস, মহাসুখধাম।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য গীতিটিতে বৌদ্ধদর্শনের ভাববাদ লক্ষণীয়। জন্মমৃত্যু ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞানই যে চিত্তের সৃষ্টি, মিথ্যা মায়া মাত্র, তাহা বলা হইয়াছে। গীতিটির মধ্যে দার্শনিক প্রবণতা অধিক।

ভব ও নির্বাণের বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা ; অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি সেই মিথ্যাজ্ঞান। এই মিথ্যাজ্ঞানই ভববন্ধনের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানীরা (সহজপন্থীরা) এই বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানে বিশ্বাসী নহেন। তাঁহারা এই সকল তর্কবিতর্কে উদাসীন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যু, ভব-নির্বাণ ইত্যাদিতে কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার অদ্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসী। জন্ম-মরণের এই ধরনের পার্থক্যে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার নানাপ্রকার কৃত্রিম পন্থা, রসায়নবাদ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম সাধনপন্থায় কিছুই লাভ হয় না। এই পথে মুক্তিলাভ ঘটে না। জন্মলাভের ফলেই কর্মভোগ অথবা কর্ম-ভোগের জন্যই পুনর্জন্ম, এই জাতীয় বিতর্কিত তত্ত্বজ্ঞানে কিছুই লাভ হয় না। সহজধর্ম অচিন্ত্য ; জ্ঞানমার্গের তর্কবিতর্ক অথবা কৃত্রিম সাধনপদ্ধতির তাহা অতীত।

২৩

রাগ বড়ারী[১] ভুসুকুপাদানাং ·

জই তুম্হে[২] ভুসুকু অহেই[৩] জাইবেঁ মারিহসি[৪] পঞ্চজনা। ·
নলণী[৫] বন পইসন্তে হাহিসি একুমণা।। ধ্রু ।
জীবন্তে ভেলা বিহণি মএল ণএণি।
হণ বিণু মাঁসে ভুসুকু পদ্মবণ পইসহিণি।। ধ্রু।।
মাআজাল[৬] পসরিউ রে[৬] বাধেলি মাআহরিণী।
সদগুরু বোহেঁ বুঝি রে[৬] কাসু কদিনি[৭] ***

[পুথির পৃষ্ঠা ৩৪ খ]

*[পুথিতে অতঃপর ৪টি পাতা নাই। ৩৪ পাতার পর ৩৯ পাতা। তাই এই গীতিটির শেষাংশ ও টীকা, ২৪ সং গীতির টীকাসমেত সম্পূর্ণ এবং ২৫ সং গীতির মূলপাঠ এবং টীকার প্রথমাংশ নাই।]

দ্র. এই পৃষ্ঠার ফটোচিত্র প্রায়শ অস্পষ্ট। সংশয় স্থলে শাস্ত্রীর পাঠ রক্ষিত।

পা. ১. শা. সু. বড়ারী। নী. বড়াড়ী। ২. সু. তুম্তে। ৩. সু. অহেবি পাঠ গ্রহণ করিযা অহেই পাঠ সম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ৪. সু মারিহ সে। তাঁহার মতে মারিহসি পাঠও সম্ভব। ৫. নী. নলনী। ৬-৬. শা পসবি উরে।

অ ন্ব য : যদি তুমি ভুসুকু শিকারে যাইবে তবে পঞ্চজনকে মারিও। নলিনীবনে প্রবেশে একমনা হইও। জীবন্তে প্রভাত হইল, মরিল রজনী। নিহতের মাংস বিনা, ভুসুকু, পদ্মবনে প্রবেশ করিও না। মাযাজাল অপসারিত হইল, বাঁধা পড়িল মায়াহরিণী। সদ্‌গুরুবোধে বুঝি কিসের কি কাহিনী (বৃত্তান্ত)··

টী কা টি প্প নী : জই<যদি। তুম্হে<*তুষ্মাভিঃ=যুষ্মাভিঃ। অহেই< আখটক। মারিহসি=মারিও; ভবিষ্যৎ, অনুজ্ঞা : <মারয়িষ্যসি। পঞ্চজনা= পাঁচজনকে, পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চ বিষযের অহংকারাদি প্রত্যযকে। পঞ্চতথাগত পঞ্চস্কন্ধাত্মক বিষয়সমূহের অধিদেবতা। তাই তাহাদিগকে বিনাশ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই পাঁচজনকে মারিবার কথা ১২ সং গীতিতেও দ্রষ্টব্য। নলনীবন=নলিনীবন, মহাসুখ কমলবনে। পইসন্তে=প্রবেশ করিতে; (অসমা); প্র- √বিশ্‌+অন্ত্‌ (শতৃ)+এ প্রবিশন্তে< পইসন্তে। হোহিসি= হইও; ভবিষ্যৎ, অনুজ্ঞা; < ভবিষ্যসি। একুমণা=একমন। একাগ্রচিত্ত। জীবন্তে=জীবিতাবস্থায়; ২২ সং চর্যা দ্র.। ভেলা=হইল, *ভবিত=ভূত+ ইল>ভৈল>ভেল, ভেলা। বিহণি=প্রভাত; বিভান> বিহান+ই (সম্ভবত 'ইকা' জাত)। মএল=মরিল; মৃত+ইল> মইল, মএল। নএণি=রজনী।

রজনী>রঅণি>ণঅণি>ণএণি। জীবন্তে···ণঅণি=জীবদবস্থাতেই প্রভাত হইল, জ্ঞানোন্মেষ হইল. অজ্ঞানান্ধকার রূপ রজনীর মৃত্যু ঘটিল।, হণ=হত, নিহত। বিণু=বিনা। পইসহি=প্রবেশ করিও; < প্রবিশসি। ণি=না। নঙর্থক 'ণি' খুব স্বাভাবিক নহে। সম্ভবত পূর্ববর্তী চরণের সহিত মিলের জন্য। হণ বিণু·· পইসহি ণি=নিহতের মাংস বিনা নলিনীবনে প্রবেশ করিও না, বা করা যায় না। পূর্বেই পঞ্চস্কন্ধাত্মক পঞ্চবিষয়ের অধিদেবতা পাঁচজনকে হত্যার কথা বলা হইয়াছে। সিদ্ধিরূপ কমলবনে প্রবেশ করিতে হইলে পঞ্চজনকে হত্যা করা প্রয়োজন। চরণটির তাৎপর্য, অবিদ্যা বা প্রকৃতি-দোষ ইত্যাদিকে হত্যা না করিয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। (তিব্বতী অনুবাদেও এই অর্থের ব্যঞ্জনা।) পরসিউ< প্রসারিত : বা< অপসারিত। বাধেলি—বাঁধিল, বন্দী করিল। মাআহরিণী='অবিদ্যারূপিণী মায়াহরিণী। মাআজাল·· মাআহরিণী —অবিদ্যারূপ মায়াজালও ·রীভূত হইল, মায়াহরিণীও বন্দী হইল, তাহার প্রভাব নষ্ট হইল। অথবা গুরু-উপদেশরূপ মায়াজাল প্রসারিত করিয়া নৈরাত্মারূপিণী হরিণীকে লাভ করা হইল। মায়াজাল ও মায়াহরিণী দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য মূল ব্যঞ্জনা উভয়ত এক। কাস্থ=কিসের; <কস্য। কদিণি= বৃত্তান্ত; সঠিক পাঠ সম্ভবত কহিণি। সদগুরু · কদিণি =সদ্‌গুরু উপদেশেই কিসের কি স্বরূপ তাহা অবগত হওয়া যায়।

ব্যা খ্যা সং কে ত : শিকারের উৎপ্রেক্ষায় এখানে তত্ত্বজ্ঞানের ইঙ্গিত। অবিদ্যাকে দূর করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিয়া মহাসুখ-কমলবনে প্রবেশের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এই চর্যায়। চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে পঞ্চস্কন্ধাত্মক চেতনাকে বিনাশ করিতে হয়; তাহা হইলেই সত্যজ্ঞানরূপ প্রভাত দেখা দেয়, অজ্ঞানান্ধকার রজনী দূরীভূত হয়। সদ্‌গুরুবোধরূপ মায়াজাল প্রসারিত করিয়া চিত্তহরিণী নৈরাত্মাকে ধরিতে হয়। (অথবা অবিদ্যারূপ মায়াজাল অপসারিত করিতে হয়, অবিদ্যারূপিণী হরিণীকে বন্দী করিতে হয়। অথবা গুরু-উপদেশরূপ মায়াজাল প্রসারিত করিয়া অবিদ্যাহরিণীকে বন্দী করিতে হয়।)

(গীতিটি খণ্ডিত তাই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তবে পঞ্চস্কন্ধের দেবতা পঞ্চতথাগতকে বিনাশ, সিদ্ধিরূপ মহাসুখ-কমলবনে প্রবেশ, গুরুর উপর নির্ভর-শীলতা ইত্যাদি চর্যার সাধনপদ্ধতির অনুরূপ। দ্র. ভুসুকুর ৬ সং চর্যাতেও শিকারের উৎপ্রেক্ষা।)

২৬

রাগ শীবরী[১] শান্তিপাদানাং

তুলা ধুণি ধুণি[২] আঁসু রে[২] আঁসু ।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিররর সেসু ।। ধ্রু ।।
[৩]তউ যে[৩] হেরুঅ ণ পাবিঅই ।
সান্তি ভণই কিণ[৪]-স[৫] ভাবিঅই[৫] ।। ধ্রু ।।
তুলা ধুণি ধুণি সুনে অহারিউ ।
সুণ লইআ[৭] অপণা চটারিউ ।। ধ্রু ।।
বহল বট দুই মার ন দিশঅ ।
সান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ।। ধ্রু ।।
কাজ ন কারণ[৮] জ এহু[৮] জুঅতি[৯] ।
সএঁ সংবেঅণ[১০] বোলথি সান্তি ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ৩৯ ক-খ]

পা. ১ শুদ্ধ পাঠ শবরী ? । ২ শা. আঁসুরে । ৩-৩. শা. তউযে । ৪. নী. কিন । ৫-৫. শা. সভাবিঅই । ৬ পুথিতে সম্ভবত পুণ লিখিয়া সুন করা । টীকার শূন্য অনুসারে সম্ভাব্য পাঠ সুণ । শা. পুন । সু পুন পাঠ গ্রহণ করিয়াও সম্ভাব্য পাঠ সুণ বলিয়াছেন । পুথিতে সু/পু-এর মধ্যে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও পদের শেষ বর্ণটি ণ । ন নহে । ৭. পুথিচিত্র অস্পষ্ট । লইআঁ পাঠও সম্ভব । টীকার 'গৃহীত্বা' হইতে লইআঁ । ৮-৮ শা. জএহু । ৯ শা. জঅতি । ১০. শা. সঁএঁ সঁবেঅণ ।

অ ন্ব য : তুলা-ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ [করা হইল] । আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব (=নিঃশেষ) [করা হইল] । তবুও হেতুরূপ পাওয়া গেল না । শান্তি বলেন কেন ভাবা হয় (ভাবিয়া কি লাভ) ? তুলা ধুনিয়া শূন্য আহরণ করিলাম, শূন্যকে লইয়া নিজেকে নিঃশেষ করিলাম । দীর্ঘ এই পথ, দ্বিতীয় পথ (বা দ্বৈতভাব) দেখা যায় না । শান্তি বলেন, শিশু ও অজ্ঞ অথবা বালাগ্র (কেশাগ্র) [এখানে] প্রবেশ করিতে পাবে না । কার্য কারণ নাই, এই এখানে যুক্তি । [মহাসুখ] স্বসংবেদ্য, বলেন শান্তি ।

টী কা টি প্প নী : ধুনি=ধুনিয়া, < *ধুনিত্বা=ধুত্বা । আঁসু=<অংশু । নিরবর=টীকায় নিরবয়ব অর্থাৎ নিঃশেষ । < নিরপর (?)=যাহার পর আর কিছু নাই । সেসু=শেষ । তউ=তবু । যে=সে । হেরুঅ=হেতুরূপ> হেউরুঅ>হেরুঅ । পাবিঅই=পাওয়া যায়, < প্রাপ্যতে । কিণ< কেন । ভাবিঅই=ভাবা হয়, < ভাব্যতে । সুনে=শূন্যে । অহারিউ=সংগৃহীত ;

<*আহারিত: = আহৃত:। অপণা = নিজেকে; আত্মনম্>আপ্পনং>আপণা, অপণা। চটারিউ = নিঃশেষিত। < চটারিত। চট্ ধাতুর অর্থ চিড় খাওয়া, ফাট ধরা, বিদীর্ণ হওয়া, ভেদ করা, হ্রাস পাওয়া, নষ্ট হওয়া ইত্যাদি। বহুল = দীর্ঘ; <বহুল (?)। বট = বাট, পথ; <বর্ত্ম। দুই মার = দ্বিতীয় মার্গ; (পাঠান্তর কল্পিত. দুই আর, টীকায় দ্বয়াকার; = দ্বৈতভাব।) দিশঅ = দেখা যায়; < দৃশ্যতে। বালাগ = বালক ও অজ্ঞ অথবা বালাগ্র। < বালঅজ্ঞ, < বালাগ্র। পইসঅ = < প্রবিশতি; প্রবেশ করে। কাজ ন কারণ = কার্যকারণ নাই। বাক্যাংশের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের কার্যকারণ-তত্ত্বে বিশ্বাসহীনতা তথা প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বে বিশ্বাস আভাসিত। দ্র. কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ— ১৮ সং গীতি। এহু = এই <এষা। অথবা * এত্র = অত্র >এথু>এহু, = এখানে। জুঅতি = যুক্তি >যুকতি (বিপ্রকর্ষ) > জুঅতি। সএঁ সংবেঅণ = স্বসম্বেদ্য বা স্বীয় সম্বেদন।

ব্যা খ্যা সং কে ত: আলোচ্য চর্যায় তুলা ধুনার রূপকে অবিদ্যাচ্ছন্ন মনকে নিষ্ক্রিয় করিবার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত বিশ্ব সংসার অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের সৃষ্টি এই মায়াবাদের তত্ত্ব এবং কার্যকারণ নিয়মে বিশ্বাসহীনতার কথাও বলা হইয়াছে। দ্র. দার্শনিক পটভূমি।

চিত্ত তুলার মতো। তাহাকে ধুনিয়া ধুনিয়া আঁশ করা হইল, আঁশ ধুনিয়া ধুনিয়া নিরবয়ব করা হইল, তবুও বিশ্বসৃষ্টির হেতুভূত মূল কারণ জানা গেল না। অর্থাৎ চিত্তকে নিঃশেষে বিশ্লেষণ করিয়াও প্রাতিভাসিক জগৎ সৃষ্টির কারণ জানা গেল না। বস্তুত বাহ্যজগতের সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান চিত্তসৃষ্ট হইলেও ইহা চিত্তের স্বরূপ বা স্বধর্ম নহে। অবিদ্যা প্রভাবেই চিত্ত এই রূপজগতের জ্ঞান সৃষ্টি করে। অবিদ্যা চিত্তের স্বরূপ নহে, একটি আগন্তুক ধর্ম। এইভাবে চিত্তকে বিশ্লেষণ করিলে বোঝা যায়, কার্যকারণ-নিয়ম সবই মিথ্যা। তখনই শূন্যতা জ্ঞান আহৃত হয় এবং তাহা হইলে অহংপ্রত্যয়ও নিঃশেষে বিলীন হয়। শান্তি তাই বলিতেছেন, দ্বৈত জ্ঞানমুক্ত একাকার এই দীর্ঘ অদ্বয়ের পথ, কার্যকারণ যুক্তি শৃঙ্খলায় এখানে প্রবেশলাভ সম্ভব নহে; শিশু ও অজ্ঞের পক্ষে এ পথ দুর্গম। অথবা এই পথে কেশাগ্রও প্রবেশ করানো দুরূহ। কারণ এই পথ দুর্গম। তর্কাতীত, স্বসংবেদ্য এই মহাসুখের পথ।

২৭

রাগ কামোদ ভুসুকুপাদানাং

অধরাতি ভব কমল বিকসউ১ ।
বতিস যোইণী২ তসু অঙ্গ উহ্লসিউ৩ ॥ ধ্রু ॥
চালিউঅ৪ ষষহর মাগে অবধূই ।
রঅণহু৫ সহজে কহেই ॥ ধ্রু ॥
চালিঅ ষষহর গউ ণিবাণেঁ ।
কমলিনি কমল বহই পণালেঁ ॥ ধ্রু ॥
বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ ।
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ ॥ ধ্রু ॥
ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ৬ ।
সহজানন্দ মহাসুহ লীলেঁ৭ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪০ খ]

পা. ১. বিকসিউ ? টীকা বিকশিত। ২. শা. জোইনী। ৩. পুথির পাঠ সন্দেহমুক্ত নহে। উহ্লসিত পাঠ করা চলে। প্রসঙ্গানুসারে উহ্লসিউ প্রশস্ত। ৪. পুথি চালিউঅ। কিন্তু ৫ম চরণে চালিঅ। নিষ্ঠান্ত পদ উ অথবা অ-কারান্ত কিভাবে লিখিত হইবে সে সম্পর্কে লিপিকরের দ্বিধা সূচিত। টীকা টিপ্পনী দ্র.। ৫ রঅণহু-ও পড়া চলে। চরণটি ত্রুটিমুক্ত নহে। সম্ভবত লিপিকর প্রমাদে কিছু বাদ পড়িয়াছে। বাগচী টীকার 'রত্ন প্রভাবাৎ' হইতে রঅণ পভাবহুঁ পাঠ অনুমান করিয়াছেন। ইহা অযৌক্তিক নাও হইতে পারে। ৬. পুথিতে ং ওঁ প্রায়শ এক। এখানে আধুনিক ং-এর মত লিপিকৃত। অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য মেলেঁ প্রশস্ত। ৭. পুথিতে লী-এর আগে একটি এ-কার লেখা। শা. সু. লোলেঁ। টীকানুসারে লীলেঁ (লীলয়া) প্রশস্ত।

অ ন্ব য : অর্ধরাত্রি ভরিয়া (ব্যাপিয়া) কমল বিকশিত। বত্রিশ যোগিনী তাহাতে অঙ্গ উল্লাপিত (অথবা উল্লাসিত) করে। শশধরকে অবধূতি মার্গে চালিত করা হউক। রত্ন [প্রভাবে] সহজের কথা বলে। চালিত হইয়া শশধর নির্বাণে গেল। অথবা অবধূতি মার্গে চালিত। কমলিনী (নৈরাত্মা) কমল [রস] প্রকৃষ্ট নালে (পথে) বহিতেছেন। বিরমানন্দ বিলক্ষণ শুদ্ধ। যে এখানে [ইহা] বোঝে সেই এখানে বুদ্ধ। ভুসুকু বলেন, আমি মিলনের দ্বারা অবলীলায় সহজানন্দ মহাসুখ বুঝিয়াছি।

টী কা টি প্প নী : অধরাতি = অর্ধরাত্রি। টীকায় 'চতুর্থী সন্ধ্যা প্রজ্ঞা জ্ঞান অভিষেকদান সময়' রূপে ব্যাখ্যাত। বোধিচিত্ত যখন চতুর্থানন্দে উপনীত, অন্তরে

যখন প্রজ্ঞার উন্মেষ অর্থাৎ মহাসুখ উপলব্ধির সময়। ভর=ভরা, পূর্ণ, আলোচ্য-প্রসঙ্গে ব্যাপিয়া। কমল—তন্ত্রের সহস্রার পদ্মের সাদৃশ্যে কল্পিত, বৌদ্ধতন্ত্রের মহাসুখ-কমল। বিকসউ=বিকসিউ=<বিকশিত ; ধ্বনি পরিবর্তনে প্রত্যাশিত বিকসিঅ স্থলে বিকসিউ লক্ষণীয়। দ্র. ভাষা অধ্যায়। বতিস যোইণী=বত্রিশ যোগিনী। টীকানুসারে ললনারসনাঅবধূতী ইত্যাদি বোধিচিত্তবহা বত্রিশ নাড়ী। দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন নাড়ীপথে প্রবাহিত শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সহজানন্দ মহাসুখের উপলব্ধি হয়। বত্রিশ যোগিনী সেই বিভিন্ন নাড়ীসমূহ। দ্র. ১৭ চর্যার 'বতিস তান্তিধনি'। তসু=তাহার ; < তস্য। মূলত একবচন হইলেও আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহাদের বা তথায় অর্থই সঙ্গত। 'তসু' চর্যাতে তথায় অর্থেও ব্যবহৃত হইত, ইহার নিদর্শন, ৪৫ চর্যা 'মনতরু পঞ্চ ইন্দি তসু সাহা'-র অর্থ মনতরু পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা বা তথায় শাখা এই দুইভাবেই করা চলে। উহ্লসিউ=উল্লসিত (?)। শব্দটির প্রকৃত অর্থ টীকা হইতেও বোঝা যায় না। তিব্বতী অনুবাদেও অর্থ স্পষ্ট নয়। টীকানুসারে অঙ্গোল্লাস হইল এবং ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল, এই অর্থ হয়। আনুমানিক ব্যুৎপত্তি<*উষ্ণাসিত=উষ্ণাপিত। পাঠান্তর উহ্লসিউ<উল্লসিত। অধরাতি · উহ্লসিউ=ললনারসনা-অবধূতি মার্গে অর্থাৎ তান্ত্রিক উপায়ে, বোধিচিত্তকে মহাসুখচক্রে বিকশিত উষ্ণীষকমলে উন্নীত করাই সিদ্ধি। সেই সহজানন্দ মহাসুখ অনুভূতিরূপ সিদ্ধির অবস্থাই এখানে বর্ণিত। চালিউঅ=টীকায় অর্থ—'গত'। লক্ষণীয় ৫ম পংক্তির চালিঅ=টীকায় 'গত'। উভয়ত চালিঅ বা চালিউ এক রূপ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই গীতে নিষ্ঠান্ত পদগুলি উ-অন্তক, টীকায় সম্ভবত অ-অন্তক রূপ ছিল। টীকার চালিঅ রূপ হইতে এরূপ অনুমান হয়। চালিউঅ<চালিঅউ (বিপর্যাস) রূপেও ব্যাখ্যা করা চলে। তিব্বতী অনুবাদে অর্থ 'Pass on'। প্রসঙ্গানুসারে তাহাও গ্রহণীয়। তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি চালিউঅ=চালিঅউ=চালনা করা হউক ; <চালয়তু। ষষহর=বোধিচিত্তরূপ শশধর। মাগে=< মার্গে। অবধুই< অবধূতি। রঅণহু=রত্ন হইতে। চর্যায় 'হু' বিভক্তির দুইবার ব্যবহার আছে, খেপহু (৪), রঅণহু (২৭)। টীকায় উভয়ত্র 'হু' ৫মীর বিভক্তিরূপে গৃহীত। 'হু' অবহট্টের চিহ্নবহ। টীকায় 'রত্ন প্রভাব হইতে' এই অর্থ দেওয়া আছে। কহেই=< কথয়তি। রঅণহু·· কহেই =রত্ন হইতে সহজের কথা বলে। চিত্ত যখন মহাসুখ-কমলে প্রবিষ্ট হয় তখন সে সহজানন্দের কথা বলে, সহজানন্দ লাভ করে। পরমার্থজ্ঞানই রত্ন (দ্র. ৯ চর্যা দশবলরঅণ) চালিঅ< চালিত। গউ< গত (গঅ স্থানে গউ লক্ষণীয় ; দ্র. ভাষা অধ্যায়)। নিবাণেঁ< নির্বাণে। চালিঅ·· নিবাণেঁ=শশধর চালিত হইয়া নির্বাণে গিয়া উপনীত হয়। কমলিনি=নৈরাত্মা। বহই< বহতি। পণালেঁ< প্রণালে। কমলিনি ··পণালেঁ=পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা মৃণালের মধ্যে অর্থাৎ অবধূতিনাড়ীতে মহাসুখ রসরূপ কমল বহন করিতেছে। নৈরাত্মা

মহাসুখরসের বাহক। বিরমানন্দ = চিত্তের তৃতীয় শূন্যে অবস্থিতিতে যে আনন্দ তাহার নাম বিরমানন্দ (ধর্মমত অধ্যায় দ্র.)। বিলক্ষণ = বোধিচিত্তের উৎপত্তির পর বিভিন্ন চক্র বা পদ্মের ভিতর দিয়া গমনের জন্য বিভিন্ন মুদ্রা ও তৎসহ চারিটি মানসিক অবস্থা বা ক্ষণের বর্ণনা আছে। চারিটি মুদ্রা—কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা। চারিটি মানসিক অবস্থা—বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ। বিলক্ষণ সুতরাং চতুর্থানন্দের মানসিক অবস্থা। সুধ = শুদ্ধ। বিরমানন্দ…সুধ = বিরমানন্দ বিলক্ষণ চতুর্থানন্দে শুদ্ধ অর্থাৎ বিরমানন্দ বিলক্ষণরূপ চতুর্থানন্দে পরিণত হইয়া শুদ্ধ হইল। জো = যে < যঃ। বুঝই = বোঝে < বুধ্যতে। বুধ = বুদ্ধ। মই = <ময়া। বুঝিঅ <* বুদ্ধিত = বুদ্ধঃ। মই বুঝিঅ = আমার দ্বারা বোঝা হয়। কর্মবাচ্য। কিন্তু ভাষার প্রাচীন স্তর হইতেই—আমি বুঝি, এইরূপ কর্তৃবাচ্যের অর্থজ্ঞাপক। মেলেঁ = মিলনের দ্বারা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের দ্বারা। লীলেঁ = অবলীলায়।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য চর্যায় বোধিচিত্তের নির্বাণ লাভের বর্ণনা। সদ্‌গুরু বচনে ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোধিচিত্তকে স্বস্থান অর্থাৎ মণিমূল হইতে ক্রমে ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা ও মহাসুখ লাভের কথা কমল বিকশিত হইবার উৎপ্রেক্ষায় বর্ণিত হইয়াছে। গীতিটিতে তান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যেকার ক্রমিক ঊর্ধ্বায়ন, তৃতীয় শূন্য হইতে চতুর্থ শূন্যে অগ্রগতির ইঙ্গিত স্পষ্ট। বোধিচিত্ত ললনা-রসনা-অবধূতী-পথে মহাসুখকমলে উন্নীত। পদকর্তা সেই অবস্থার কথা বর্ণনা করিতেছেন। চতুর্থানন্দের উন্মেষকাল, হৃদয়ে প্রজ্ঞাজ্ঞানাদির উদ্ভাসন ঘটিতেছে, বোধিচিত্ত তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতে অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন নাড়ীর শ্বাসাদি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মস্তিষ্কস্থ মহাসুখকমলে উন্নীত হইতেছে। ইহাই মহাসুখকমলের বিকাশের অবস্থা। পদকর্তা তাই উপদেশ দিতেছেন—চিত্ত-শশধরকে অবধূতী মার্গে চালাইয়া যাও, যাহাতে মহাসুখকমলের বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে। পরমার্থ সত্যরূপ রত্নে উপনীত চিত্ত তখন সেখান হইতে সহজের কথা কহিবে অর্থাৎ সহজানন্দ লাভ করিবে। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে চালিত শশধর নির্বাণে উপনীত হয় ; পরিশুদ্ধাবধূতিকা নৈরাত্মা অবধূতী নাড়ীর মধ্যে যেন কমলরস বহন করেন। বিরমানন্দ (তৃতীয় আনন্দ) বিলক্ষণরূপ চতুর্থানন্দে পরিণত হইয়া শুদ্ধ হইল। এই কথা যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনি বজ্রধর বুদ্ধ। ভুসুকু প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের দ্বারা এই সহজানন্দ মহাসুখের উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন অবলীলাক্রমে।

৫৮

বাগ বলাড্ডি₁ ॥ শবরপাদানাং ॥

উঞ্চা উঞ্চা₂ পাবত তঁহি₃ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
নিঅ₄ ঘরিণী₅ ণামে₆ সহজ সুন্দারী ॥ ধ্রু ॥
ণাণা তরুবর ₇মৌলিল রে₇ গঅণত লাগেলি₈ ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥ ধ্রু ॥
তিঅধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে₉ সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥ ধ্রু ॥
হিঅ₁₀ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥ ধ্রু ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমণে বাণেঁ।
একে সরসন্ধানেঁ₁₁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম ণিবাণেঁ₁₂ ॥ ধ্রু ॥
উমত সবরো ₁₃গরুআ রোষে₁₃।
গিরিবরসিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ₁₄ ॥ ধ্রু ॥

[পুথিব পৃষ্ঠা ৪১খ-৪২ক]

পা. ১. = বরাড়ি ? নী. বলাড্ডী। ২. শা. উঁচা উঁচা। ৩. শা. তঁহি। ৪. শা. সু. ণিঅ। ৫. সু. ঘবণী। ৬. নী. নামে। ৭-৭. শা. মৌলিলরে। ৮. শা. লাগেলী। ৯. শা. মহাসুখে। ১০. টীকা হিএঁ। ১১ শা. শরসন্ধানেঁ; সু. শরসন্ধাণেঁ। ১২. শা. ণিবাণেঁ; নী. নিবাণে। ১৩-১৩. পুথিতে গরুআস-রোষে লিখিয়া স কাটা। সু. গরু আস রোষে। ১৪. শা. কইসে।

অ ন্ব য় : উচ্চ উচ্চ পর্বত। সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরপুচ্ছ পরিধান, শববীর গ্রীবায় গুঞ্জা (ফুলের) মালিকা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল করিও না, [আমি তোমার] নিজগৃহিণী, নাম সহজসুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনে ডাল লাগিল। একাকিনী শবরী এই বনে ভ্রমণ করে, কর্ণকুণ্ডল ও বজ্রধারী। ত্রিধাতুর খাট পাড়িল, শবর মহাসুখে শয্যা বিছাইল। শবর ভুজঙ্গ, নৈরামণি (নৈরাত্মা) দারীকে (প্রেমিকাকে) লইয়া প্রেমে রাতি পোহাইল। হৃদয়তাম্বুল [-এর সহিত] মহাসুখে কর্পূর খায়, শূন্য-নৈরাত্মাকে কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত পোহায় (কাটায়)। গুরুবাক্যরূপ পুচ্ছবিশিষ্ট নিজমনরূপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ কর, এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণকে বিদ্ধ কর।

উন্মত্ত শবর গুরুতর রোষে গিরিবর শিখরসন্ধিতে প্রবেশ করিলে তাহাকে খুঁজিব কী করিয়া ? অথবা, সে ফিরিবে কেমন করিয়া ?

টীকা টিপ্পনী: উঞ্চা উঞ্চা=উচ্চ উচ্চ; বিশেষণের দ্বিত্ব বহুত্ববোধক; উচ্চ>উঞ্চ+আ (<ক) স্বার্থে; নাসিক্যীভবন। পাবত<পর্বত। তঁহি= তাহাতে <*তধি অথবা তস্মিন্। বসই=বাস করে <বসতি। বালী< বালিকা। মোরঙ্গি<ময়ূরাঙ্গিক। পীচ্ছ<* পিচ্ছ<পুচ্ছ। পরহিণ=পরিহিত >পরিহিণ>পরহিণ। গিবত=গ্রীবাতে; গিব (<গ্রীবা)+ত (৭মী), দ্র দুআরত, ৩ চর্যা। গুঞ্জরী=গুঞ্জার; ৬ষ্ঠীর র+ঈ (স্ত্রী)। মালী<মালিকা। উমত<উন্মত্ত। গুলী=গোল, গুলাইয়া ফেলা, ভুল করা; দেশী শব্দ ? ব্যুৎপত্তি সঠিক জানা যায় না। গুহাড়া=অনুনয়, অনুরোধ; মধ্য বাংলায় গোহার, গোহারী; টীকায় গুহাড়া ব্যাখ্যাত হয় নাই; শব্দটির অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি সংশয়মুক্ত নহে; প্রসঙ্গানুসারে 'দোহাই তোমার' বা 'তোমাকে অনুরোধ' এই জাতীয় অর্থ পাওয়া যায়; <ঘোষকার (?) <* গোধকারিক (দ্র. EDB)। তোহৌরি=তোমার, তোর; তোহোরি রূপই বেশী পাওয়া যায়। দ্র. ১০ চর্যা। ণিঅ<নিজ। ঘরিণী=গৃহিণী। মৌলিল=মুকুলিত হইল; <মুকুলিত+ইল। গঅণত=গগনে; গগন> গঅণ+ত (৭মী)। লাগেলি=লাগিল; ১৬ ও ১৭ চর্যা দ্র.। ডালী=ডাল; ১ চর্যা দ্র.। একেলী=একাকিনী। হিণ্ডই=ভ্রমণ করে; <*হিণ্ডতি=<হিণ্ডতে। তিঅধাউ=<ত্রিকধাতু; কায়, বাক্, চিত্ত এই তিন ধাতু-নির্মিত, (বিণ)। সেজ্জি=<শয্যিকা। ছাইলী=বিছান হইল; <ছাদিত+ইল+ঈ (স্ত্রী), সেজ্জি-র সহিত লিঙ্গ-সৌষম্যে। দারী= <দারিকা; প্রেমিকা, নাগরী। পেহ্ম=প্রেমে; <প্রেম্মা; (প্রেম অপভ্রংশে পেহ্ম, পেম্মা)। পোহাইলী<প্রভাত+ইল+ঈ (স্ত্রী)। তাঁবোলা<তাম্বুল। কাপুর<কর্পূর। খাই<খাদতি। পোহাই<প্রভাতিত। পুঞ্চআ=পুচ্ছক> পুচ্ছঅ>পুঞ্চঅ>পুঞ্চআ। গরুআ<গুরুক। সিহর<শিখর। পইসন্তে=প্রবেশ করাতে, প্রবেশ করিলে; প্র-বিশ্+অন্তে (অসমা)। লোড়িব=টীকানুসারে, অন্বেষণ করিব; লোড়্ (ধাতু) অন্বেষণ করা অর্থে (?); প্রসঙ্গ অনুসারে 'প্রত্যাবর্তন করা' অর্থও গ্রহণ করা চলে; সেই অর্থে আধুনিক বাংলার 'নড়া' (√নট্ to move)-এর সঙ্গে শব্দটির ব্যুৎপত্তি যুক্ত করা চলে; হিন্দীতে লোট্ ধাতু প্রত্যাবর্তন অর্থে ব্যবহৃত। কইসেঁ=কেমন করিয়া <* কদৃশন্।

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য গীতিটিতে শবর-শবরীর মিলনচিত্রের রূপকে সহজানন্দ লাভের তত্ত্ব বর্ণিত। বাহ্যিক মিলন ও আনুষঙ্গিক উপাদানাদির বর্ণনার অন্তরালে সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ মহাসুখ লাভের ইঙ্গিত স্পষ্ট। চর্যার যে কটি গীতিতে প্রেমারতির আভাস, আলোচ্য গীতিটি তাহাদের অন্যতম।

এখানে সাধকের দেহ পর্বতরূপে এবং মস্তিষ্কস্থ মহাসুখচক্র পর্বতশৃঙ্গ রূপে

কল্পিত। নৈরাত্মা সাধকের গৃহিণী। দেহমধ্যস্থ উচ্চতম শৃঙ্গে মহাসুখরূপিণী নৈরাত্মা শবরী-বালিকা-রূপে বাস করেন। কিন্তু বাহ্যত তিনি নানা প্রকার অলংকারে ভূষিতা। ভাববিকল্পাদিরূপ ময়ূরপুচ্ছ তাঁহার পরিধান, কণ্ঠে তাঁহার গুহ্য মন্ত্ররূপ গুঞ্জামালা। এইরূপ সাজসজ্জার জন্য সাধক নৈরাত্মাকে চিনিতে পারেন নাই। অর্থাৎ প্রথম দিকে সাধকের মন বিষয়াসক্তি ইত্যাদিতে মত্ত থাকে, সাধনার সিদ্ধি থাকে সুদূরপরাহত। নৈরাত্মাই তাই সাধককে আহ্বান জানান, স্মরণ করাইয়া দেন যে তিনিই সাধকের নিজগৃহিণী, নাম সহজসুন্দরী। দেহ-পর্বতে অবিদ্যারূপ তরু মুকুলিত, তাহার ডালপালায় গগন অর্থাৎ শূন্যতাজ্ঞান আচ্ছাদিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে কায়পর্বতবনে নৈরাত্মারূপিণী শবরী একাকী বিহার করেন। কর্ণে তাঁহার জ্ঞানমুদ্রারূপ কুণ্ডল, কণ্ঠে তাঁহার বজ্র (প্রজ্ঞা)। নৈরাত্মার আহ্বানের পর সাধক তাঁহাকে চিনিতে পারেন। তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তিনি ত্রিধাতুর (কায়বাক্‌চিত্তের) খাট পাতিলেন এবং মহাসুখের শয্যা বিছাইলেন। প্রভাস্বর চিত্তরূপ তাম্বুলের সহিত মহাসুখরূপ কর্পূর সেবন করিয়া পূর্বোক্ত শয্যায় পরম প্রেমিকা নৈরাত্মার কণ্ঠাশ্লিষ্ট হইয়া সাধক শবর মহাসুখে অবিদ্যা-অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী প্রভাত করিলেন। এই অবস্থায় উপনীত শবরকে এবার এই উপদেশ, তিনি যেন মনরূপবাণে গুরুর উপদেশরূপ পুচ্ছ সংযুক্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে শরসন্ধানে নির্বাণকে বিদ্ধ করেন। নির্বাণই লক্ষ্য; এখন তাই সেই লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। সহজানন্দে প্রমত্ত শবর সহজানন্দের আবেগে মহাসুখচক্ররূপ শিখরসন্ধিতে প্রবেশ করিলেন; তাঁহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া গেল না, সেখানেই তিনি লীন হইলেন।

বি. দ্র. (১) আলোচ্য গীতিটি নানা বিষয়ে লক্ষণীয়। পদসংখ্যার দিক দিয়া এটি বৃহত্তম তিনটি গীতির (১০, ২৮, ৫০) অন্যতম।

(২) গীতিটির টীকায় অন্যান্য গীতির মতো একটিমাত্র পদকে ধ্রুবপদ রূপে না ধরিয়া 'পদস্য উত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যম্'—মন্তব্য করিয়া সব পদকেই ধ্রুবপদ রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। আর একটিমাত্র গীতির (৪৩) টীকায় এ ধরনের উল্লেখ আছে। (আঙ্গিক অধ্যায় এবং ৪৩ চর্যা দ্রষ্টব্য।)

(৩) এই গীতির টীকায় পদগুলির সংখ্যা নির্দেশে ভুল আছে। দ্বিতীয় পদেন ইত্যাদি বলিয়া উমত…প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যার মধ্যেই নানেত্যাদি বলিয়া ৩য় পদের (৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের) ব্যাখ্যাও যুক্ত। ফলে ৩য় পদটির সংখ্যা বাদ গিয়াছে এবং ৪র্থ পদ ৩য় পদরূপে সংখ্যাত।

(৪) গীতিটিতে প্রেমারতি ও দেহমিলনের রূপকল্প ব্যবহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে দীর্ঘতম গীতি তিনটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কবিতাত্রয়ের দুটির রচয়িতা শবর।

২৯

রাগ পটমঞ্জরী ॥ লুইপাদানাং ॥

ভাব ন হোই অভাব ণ জাই ।
আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই বট দুলকৃখ১ বিণাণা ।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ণা ঠাণা২ ॥ ধ্রু ॥
জাহের বানচিহ্ন রূব ণ জাণী ।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
কাহেরে৩ ৪কিষ ভণি৪ মই দিবি পিরিচ্ছা ।
উদকচান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা৫ ॥ ধ্রু ॥
লুই ভণই [মই]৬ ভাইব কীষ ।
৭জা লই অচ্ছম তাহের উহ ণ দিস৭ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪৩খ-৪৪ক]

পা. ১. পুথিতে ক-এর উপর একটি রেফ চিহ্ন আছে। ২. শা. উহ লাগে ণা ; সু. উহ ন ঠানা। ৩. হে-র এ-কার সাধারণ এ-কারের মত বর্ণের বাঁদিকে নহে, উপরে। ৪-৪. শা. কিষভাণ। ৫. নী. মিছা। ৬. পুথিতে নাই ; ছন্দের জন্য ও টীকানুসারে সংযোজিত। ৭-৭. শা. জালই অচ্ছমতা হের উহ ণ দিস্।

অ ন্ব য : ভাবও হয় না, অভাবেও [কিছু] যায় না। এইরূপ সংবোধে (উপদেশে) কে প্রত্যয় করে? লুই বলেন, [সত্য] দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান বটে। ত্রিধাতুতে বিলাস করে কিন্তু [তাহার] স্থান (উদ্দেশ) অনুমান করা যায় না। যাহার বর্ণ চিহ্ন রূপ জানা যায় না, তাহা কীরূপে আগম বেদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়? কাহার প্রশ্নের আমি কী বলিয়া উত্তর দিব? উদকচন্দ্র যেমন না সত্য না মিথ্যা। লুই বলেন, আমার ভাবনার কী আছে? যাহা লইয়া আছি তাহার উদ্দেশ বুঝি না।

টী কা টি প্প নী : ভাব = অস্তিত্ব, জগৎসংসার। অভাব = অনস্তিত্ব। ভাব…জাই = এই জগৎসংসারের অস্তিত্বও নাই, অনস্তিত্বও নাই। আইস = এইরূপ ; *অবাদৃশ > আইস। সংবোহেঁ = সংবোধের দ্বারা, উপদেশ বা যুক্তিদ্বারা ; এঁ (তৃয়া)। কো < কঃ। পতিআই = বিশ্বাস করে < *প্রত্যয়তি = (প্রত্যেতি)। বট = বটে ; বর্ততে > বট্টই > বট। দুলকৃখ < দুর্লক্ষ্য। বিণাণা < বিজ্ঞান। তিঅধাএ = তিন ধাতুতে, কায়-বাক্-চিত্ত এই তিন ধাতুতে ; ত্রিকধাতু > তিঅ ধাউ > তিঅধা + এ (অধিকরণ)। বিলসই < বিলসতি। উহ = বোধ হয় ; ১৫ চর্যা দ্র.। তিঅ… ণা ঠাণা = প্রকৃতজ্ঞান কায়-বাক-চিত্ত,

এই তিন ধাতুতে ক্রীড়া করে, কিন্তু তাহার স্থান বোঝা যায় না। (চর্যায় উহ শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে শব্দটি ক্রিয়াপদ বলিয়া মনে হয়। টীকাতেও সেইভাবে ব্যাখ্যাত। সর্বত্রই উহ-র পরে একটি ণ আছে, যেমন উহ ণ বাণ—বোঝা যায় না বর্ণ [২১]। সেইভাবে উহ ণা ঠাণা—বোঝা যায় না স্থান, অবস্থান বোধগম্য হয় না, এই অর্থ সঙ্গত।) স্থান>ঠাণ, ঠাণা=ঠাঁই। জাহের =যাহার ; যস্য>যাহ+এর (৬ষ্ঠী)। বাণ চিহ্নরূব=<বর্ণ চিহ্নরূপ। জানী<* জানিত=জ্ঞাত। সো<সঃ। কইসে=কেমন করিয়া ; * কদৃশেন> কইসেন>কইসেঁ, কইসে। আগম বেএঁ=আগম বেদের দ্বারা ; এঁ<এন (৩য়া)। বখাণী=ব্যাখ্যাত হয় ; * ব্যাখ্যানিত= (ব্যাখ্যাত)>বক্খানিঅ>বখানী, বখাণী। কাহেরে=কাহাকে ; কস্য>কাহ+এরে (২য়া)। কিষ=কিসের ; * কিস্য=কস্য>কিস্স>কিষ, কিস, কীষ, কীস। ভণি=বলিয়া ; ভণিত্বা> ভণিআ> ভণি ; অসমা। দিবি =দেওয়া হইবে ; <*দিতব্য= দাতব্য। পিরিচ্ছা=<পৃচ্ছা ; (স্বরভক্তি) ; প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর। কাহেরে·· পিরিচ্ছা=কাহাকে কী বলি, কীই-বা উত্তর দিই। উদকচান্দ= উদকে বিম্বিত চন্দ্র। জিম=যেমন ; <* যিমন্ত। সাচ<সত্য। মিচ্ছা<মিথ্যা। মই ভাইব=আমার দ্বারা ভাবা হইবে (কর্মবাচ্য), অর্থাৎ আমার ভাবনা। জা=যাহাকে (কর্ম)। লই=লইয়া ; <*লভিত্বা= (লব্ধ্বা)> লভিআ>লই। অচ্ছম=আছি ; অচ্ছ্ ধাতু (অস্ স্থানে)+প্রথমার বর্তমানে 'ম'। তাহের= তাহার ; তস্য>তাহ+এর (৬ষ্ঠী)। দীস=দিশা।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : আলোচ্য গীতিতে জগৎসংসারের সত্যতা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানবাদীদের মতে বাহ্যিক জগৎসংসারের কোন সত্যকার অস্তিত্ব নাই। শূন্যতত্ত্বই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। (দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়।)

ভাব, অভাব, অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব প্রভৃতির কিছুই সত্য নহে। এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। প্রকৃত জ্ঞান দুর্লক্ষ্য-বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান। কায়-বাক্-চিত্তের মধ্যে তাহা লীলা করে কিন্তু তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। এই বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান বর্ণচিহ্নরূপে বিধৃত নহে অর্থাৎ তাহা অনির্বচনীয়। সুতরাং শাস্ত্রাদিতে যে ইহার ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয় তাহা অর্থহীন। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান কীরূপ, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। উদকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন সত্যও নহে মিথ্যাও নহে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ যেমন ব্যাখ্যাগম্য নহে, উপলব্ধিগম্য—ইহাও সেইরূপ। যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি ভাবিযাই বা কী করিবেন ? তিনি এই ধরনের যুক্তি-বিস্তারের পথেই যান না। তিনি যাহা লইয়া আছেন, তাহারই (সেই উপলব্ধির) হদিস পান না।

বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানই শূন্যতত্ত্ব ; তাহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। ইহাই গীতিটির মূলভাব।

৩০

রাগ মল্লারী ॥ ভুসুকুপাদানাং ॥

করুণ মেহ নিরন্তর ফরিআ।
ভাবাভাব দ্বংদল১ দলিআ২ ॥ ধ্রু ॥
উইত্তা গঅণ মাঝেঁ অদভুআ।
৩পেখ রে৩ ভুসুকু সহজ সরুআ৪ ॥ ধ্রু ॥
জাসু সুণন্তে৫ তুট্টই ইন্দিআল।
নিহুরে৬ ণিঅমণ৭ ণ৮ দে উলাস ॥ ধ্রু ॥
বিসঅ বিশুদ্ধিঁ৯ মই বুঝিঅ আনন্দে।
গঅণহ জিম উজোলি চান্দে১০ ॥ ধ্রু ॥
এ তৈলোএ ১১এতবি ষারা১১।
জোই ভুসুকু হেত্তই১২ অন্ধকারা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪৫ক]

১. শা. দ্বন্দল, দুংতুলও পড়া যায়, প্রসঙ্গানুসারে দ্বন্দল/দ্বংদল সঙ্গত। ২. শা. দলিয়া। ৩-৩. শা. পেখরে। ৪. পুথিতে 'স' বর্ণটি রুআ-র উপরে লেখা। ৫. শা. সুনন্তে, সু. শুনন্তে। ৬. টীকা নিহএ। ৭. নী. নিঅমণ। ৮ নী. এই 'ণ' বাদ দিযাছেন; পুথিতে আছে, তবে টীকানুসারে অপ্রযোজনীয় মনে হয়। ৯. নী. বিশুদ্ধি। ১০. চান্দে-র এ-কার ন্দ-যুক্তবর্ণের বাঁদিকে নহে, উপরে। ১১-১১. শা. এত বিষারা। ১২. পুথিতে শব্দটির মাঝখানের যুক্তবর্ণের পাঠ সংশয়-মুক্ত নহে; সু. ফেড্ডই; টীকানুসারে (স্ফেটয়তি) এ পাঠ সম্ভব, কিন্তু পুথিতে শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পষ্ট 'হে', নী. হেভ্ভই, শাস্ত্রীর পাঠ গৃহীত হইল।

অ ন্ব য়: করুণা মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত। ভাবাভাবের দ্বন্দ্ব-দলিত। গগনমাঝে অদ্ভুত উদিত। দেখ রে ভুসুকু, সহজ স্বরূপ। যাহা শুনিতে শুনিতে টুটিয়া যায় ইন্দ্রজাল (অথবা ইন্দ্রিয়জাল)। নিভৃতে নিজমন দেয় উল্লাস। বিষয়-বিশুদ্ধি দ্বারা আমি আনন্দকে বুঝিলাম। চাঁদ যেমন গগনকে উজ্জ্বল করে (সহজানন্দরূপ চন্দ্র সেইরূপ চিত্তগগনকে উজ্জ্বল করে)। ইহাই ত্রৈলোক্যে সার। যোগী ভুসুকু অন্ধকার দূর করে [যার দ্বারা]।

টী কা টি প্প নী: করুণ মেহ = করুণারূপ মেঘ, রূপক অলংকার, মেহ < মেঘ। ফরিআ < স্ফুরিত। করুণ ·ফরিআ = করুণারূপ মেঘ নিরন্তর স্ফুরিত। মহাযান মতে শূন্যতা ও করুণার অভিন্নাবস্থা লাভই বোধিচিত্তলাভ এবং বোধিচিত্ত লাভের উপায়ও ঐ অবস্থার সৃষ্টি করা। করুণারূপ মেঘ বলিতে ঐ অভিন্নাবস্থা বা বোধিচিত্তই উদ্দিষ্ট। ভাবাভাব দ্বংদল = ভাবাভাবের বিকল্পাত্মক জ্ঞান,

দ্বৈতজ্ঞান। দ্বংদল=দ্বৈতজ্ঞান; <দ্বন্দ্ব+ল। দলিআ<দলিত। উইত্তা <উদিত; আন্তেতর স্বরে শ্বাসাঘাত। অদভুআ<অদ্ভুত; (স্বরভক্তি)। পেখ=দেখ; (অনুজ্ঞা)<*প্রেক্ষ=প্রেক্ষস্ব। সহজ সরুআ<সহজ স্বরূপ। জাসু=যাহার (অর্থাৎ যাহার বিষয়); যস্য>জস্‌স>জাস> জাসু। মুণন্তে= মন্‌+অন্ত্‌+এ; মনে করিতে, বুঝিতে, (অসমা)। তুট্টই<ত্রুট্যতে। ইন্দিআল=ইন্দ্রজাল, মায়া; টীকানুসারে ইন্দ্রিয়জাল; ভ্রান্তজ্ঞানের উৎপত্তি ইন্দ্রিয়পথে; তাই উভয় অর্থই মূলত এক। নিহুরে=নিভৃতে, মনের দ্বৈতজ্ঞান-রহিত অবস্থায়; নিভৃত>নিহুঅ>নিহু+রে (৭মী)। ণিঅমণ<নিজমন। দে=দেয়; <*দেতি (=দদাতি)। উল্‌াস=উল্লাস; মিলের জন্য উলাল পাঠান্তর অনুমিত; উলাল=উল্লোল, তরঙ্গ। বিসঅ বিশুদ্ধিঁ=বিষয়-বিশুদ্ধিদ্বারা; বিষয়-সমূহের অস্তিত্বজ্ঞান যে ভ্রান্ত তাহা জানিয়া। মই<ময়া। বুঝ্‌ঝিঅ<*বুদ্ধিত= (বুদ্ধঃ)। গঅণহ— চর্যায় 'হ' ষষ্ঠীর বিভক্তি, সুতরাং অর্থ—গগনের; <গগনস্য; কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে অর্থ গগনে অথবা গগনকে; সেই দিক দিয়া 'হ' বিভক্তির প্রয়োগ সংশয়াতীত নহে। জিম=যেমন; <*যিমন্ত। উজোলি <উজ্জ্বলিত। বিসঅ· চান্দে=বিষয়জ্ঞান যে মিথ্যা ইহা জানিয়া আমি সহজানন্দ লাভ করিয়াছি; চন্দ্র যেমন গগনকে উজ্জ্বল করে, সহজানন্দরূপ চন্দ্র সেইরূপ আমার চিত্তগগনকে উজ্জ্বলতা দান করে। তৈলোএ <ত্রৈলোক্যে। এত বি=এই-ই; এতৎ> এতঅ> এত+বি (অপি)। ষারা=সার। জোই=<যোগী। হেত্তই=টীকানুসারে, দূর করে, স্ফেটয়তি; হেত্তই শুদ্ধপাঠ কিনা সন্দেহ; শব্দটির ব্যুৎপত্তি সংশয়াতীত নহে।

ব্যা খ্যা স ং কে ত: আলোচ্য গীতিটিতে সহজানন্দে মগ্ন বোধিচিত্তের বর্ণনা করা হইয়াছে প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে। শূন্যতা-করুণার অভিন্নাবস্থা বোধিচিত্ত। সমস্ত প্রকার দ্বৈতজ্ঞানবিমুক্ত সহজানন্দপ্রমত্ত এই বোধিচিত্ত। করুণা মেঘ অর্থে সেই বোধিচিত্তই উদ্দিষ্ট। ৮ সং চর্যার টীকায় বলা হইয়াছে 'করুণেতি সন্ধ্যাভাষয়া তমেব বোধিচিত্তং...বোদ্ধব্যম্'। চিত্তগগনে যখন করুণামেঘরূপ বোধিচিত্ত স্ফুরিত হয় তখন তাহা গগনমধ্যে অদ্ভুত কোন কিছুর উদয়ের মতই প্রতিভাত হয়। পদকর্তা তাই নিজেকে সম্বোধন করিয়া সেই সহজ স্বরূপকে উপলব্ধির জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। এই সহজস্বরূপের কথা শুনিতে শুনিতে অর্থাৎ ইহার উপলব্ধির মধ্য দিয়া সমস্ত মায়াজাল, ভ্রান্তজ্ঞান দূরীভূত হয়, নিজের মনের নিভৃতে উল্লাস অনুভূত হয়। অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরিয়া যায়। পদকর্তা বিষয়জ্ঞান যে মিথ্যা এই সত্য লাভ করিয়া সহজানন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন। চন্দ্রোদয়ে যেমন গগন উজ্জ্বল হয়, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হওয়ায় পদকর্তার চিত্তও সেইরূপ প্রভাস্বর আনন্দআলোকে উদ্ভাসিত। ত্রিলোকে এই সহজানন্দজ্ঞানই সারবস্তু। ইহার দ্বারাই ভুসুকু অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছেন।

৩১

রাগ পটমঞ্জরী ॥ আর্যদেবপাদাঃ[১] ॥

জহি মণ ইন্দিঅ [প]বণ[২] [৩]হো ণঠা[৩] ।
ণ জাণমি অপা কঁহি গই পইঠা ॥ ধ্রু ॥
অকট করুণা ডমরুলি বাজঅ ।
আজদেব ণিরালে[৪] রাজই[৫] ॥ ধ্রু ॥
চান্দরে চান্দকান্তি জিম পতিভাসঅ ।
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই[৬] ॥ ধ্রু ॥
ছাড়িঅ[৭] ভঅ ঘিণ[৮] লোআচারা[৯] ।
চাহন্তে চাহন্তে সুণ বিআর ॥ ধ্রু ॥
আজদেবেঁ সঅল বিহরিউ[১০] ।
ভয়ঘিণ দুর ণিবারিউ[১১] ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪৬খ]

১. সু. পাদানাং । ২. পুথি. ইন্দিঅবণ ; টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন । ৩-৩. শা. হো ণ ঠা । ৪. শা. ণিরাসে ; সু. ণিরালে । ৫. পুথি. রাজই ; অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য রাজঅ সম্ভব । ৬. অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য পইসঅ ? ৭. টীকা. ছাড়িল । ৮. শা. সু. নী. ভয়ঘিণ । ৯. লোআচার ? পদান্ত দাঁড়ি ভুবার পড়িয়াছে মনে হয় । ১০. টীকায় 'বিফলীকৃত' ; শুদ্ধপাঠ বিহলিউ ? বিহরিউ শুদ্ধপাঠ হইলে বি হরিউ এমন পদবিভাগ সম্ভব । ১১. শা. ণি বারিউ ।

অ ন্ব য় : যেখানে মন, ইন্দ্রিয়পবন, সকলই নষ্ট, না জানি আত্মা কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট [হইয়াছে] । অদ্ভুত করুণ-ডমরু বাজিতেছে । আজদেব নিরালে নিরালম্বে অর্থাৎ শূন্যে বিরাজ করিতেছেন । চন্দ্রে চন্দ্রকান্তি যেমন দেখা যায়, (অর্থাৎ চন্দ্র থাকিলে যেমন দেখা যায় এবং না থাকিলে যেমন চন্দ্রকান্তি লোপ পায় সেইরূপ) চিত্ত বিকরণপ্রাপ্ত হইলে (বিকল্পমুক্ত হইলে) [দ্বৈতজ্ঞানও] সেখানে টলিয়া প্রবেশ করে (লোপ পায়) । ভয় ঘৃণা লোকাচার ছাড়া হইল, দেখিতে দেখিতে শূন্য বিচার করা হইল । আর্যদেব কর্তৃক সকলই [লজ্জা-ঘৃণাদি] হরিত (বিফলীকৃত) হইয়াছে, ভয়-ঘৃণা দূরে নিবারিত হইয়াছে ।

টী কা টি প্প নী : জহি = যেখানে ; <যস্মিন্ অথবা *যধি । মণ ইন্দিঅ পবণ = মন, ইন্দ্রিয়, পবন ; চঞ্চলতাহেতু চিত্তকে পবন বলা হয় ; মন, ইন্দ্রিয়, পবন ইত্যাদি পৃথকভাবে উল্লিখিত হইলেও বস্তুত তিনটি একত্রে চঞ্চল বা সংবৃতি বোধিচিত্তকে বুঝাইতেছে । হো = হয় ; ভবতি > তবদি > হোদি > হোই > হো । ণঠা < নষ্ট । অপা = আত্মা = > অপ্পা > অপা । কঁহি = কোথায় ;

<কস্মিন্, *কধি ; ৭ চর্যা দ্র.। গই = যাইয়া ; <*গমিত্বা = গত্বা। পইঠা < প্রবিষ্ট। জহি…পইঠা = সংবৃতি বোধিচিত্ত প্রভাস্বর শূন্যতায় পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়— কিন্তু কীভাবে যে এই পরিণাম ঘটে তাহা জানি না ; নিজের চিত্তই যে কীভাবে এই পরিবর্তন লাভ করে তাহা বুঝি না। অকট = আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর ; মূর্খ অর্থেও ব্যবহৃত ; তু. অকট জোইআ (৪১) ; চলিত বাংলায় 'আকাট মূর্খ' প্রয়োগ লক্ষণীয়। করুণা ডমরুলি = করুণা রূপ ডমরু ; সংবৃতি বোধিচিত্তই করুণা ; ডমরু তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৃষ্ট অনাহত ধ্বনি উৎপাদনকারী ; ১১ সং চর্যা 'অনহা ডমরু' দ্র.। বাজঅ < বাদ্যতে। ণিরাসে = নিরাশ বা নিরাসক্তভাবে ; পাঠান্তর ণিরালে = নিরালয়ে, নিরাবলম্বনে, নিরাশ্রয়ে ; <নিরালয়ে। রাজই = বিরাজ করেন < রাজতে। অকট করুণা… রাজই—এই পদটি সেকোদ্দেশ টীকায় উদ্ধৃত : অকঢ় করুণা ডমরুলি বাজঅ। আজুদেব নিরালে রাজঅ॥ চান্দরে = চন্দ্রে (বিপ্রকর্ষ) ; চন্দ্রের—এই অর্থও সম্ভব। লিপিতে খুব সম্ভব এখানে বিপর্যয় ঘটিয়াছে ; সম্ভবত 'চান্দের' মূল পাঠ ছিল ; টীকায় 'চান্দেরিত্যাদি' আছে ; অনেকে চান্দেরী পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন ; মনে হয় চান্দের + ইত্যাদি = চান্দরিত্যাদি ; চান্দেরি + ইত্যাদি = চান্দরীত্যাদি হইত ; অবশ্য চর্যাতে ষষ্ঠ্যন্ত পদের স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার (লিঙ্গ-সৌষম্যের জন্য) বিরল নহে ; যেমন হাড়েরি মালী (১০)। চান্দকান্তি = চন্দ্রকান্তি, জ্যোৎস্না। জিম = যেমন ; <*যিমন্ত। পতিভাসঅ = প্রতিভাসিত হয় ; <প্রতিভাসতে। চিঅ < চিত্ত। বিকরণে = চিত্তের অচিত্ততায় বা প্রভাস্বরতায় পরিণতি, তিব্বতী অনুবাদে 'বিবর্তন'। তহি = তথায় ; <তস্মিন্, *তধি। টলি = টলিয়া ; <টলিত্বা। পইসই < প্রবিশতি। ছাড়িঅ = ছাড়া হইল ; <*ছাড়িত = ছর্দিত। ঘিণ < ঘৃণা। লোআচার = লোকাচার। চাহন্তে = দেখিতে ; চাহ (<চক্ষ্.) + অন্ত + এ (অসমা)। সুণ = শূন্য। বিআর = বিচার। বি < অপি। হরিউ <*হরিত = হৃত ; নষ্ট করা। পাঠান্তর বিহলিউ < *বিফলিত = বিফলীকৃত। ণিবারিউ = নিবারিত। বিহরিউ, ণিবারিউ প্রভৃতির অন্ত্য উ লক্ষণীয়। দ্র. ভাষা অধ্যায়।

ব্যা খ্যা সং কে ত : সংবৃতি বোধিচিত্তই যে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় এবং অতঃপর যে বিষয়জ্ঞান থাকে না, সেই তত্ত্বই আলোচ্য গীতিটিতে বর্ণিত হইয়াছে। ডমরুধ্বনি সহযোগে বাজিকরের খেলা দেখানোর উৎপ্রেক্ষায় তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত।

যেখানে মন, ইন্দ্রিয়পবন নষ্ট হয় অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত যখন প্রকৃতি প্রভাস্বর পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় তখন নিজে কোথায় যাই জানি না। অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত যে কেমন করিয়া পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয় তাহা যেন বুঝা যায় না। পদকর্তা (সাধক) বিষয়াসক্তিহীন হইয়া অবস্থান

করেন, সেই অবস্থায় অদ্ভুত করুণা-ডমরু-ধ্বনি উত্থিত হয়। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধক যখন নাড়ীগুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনিতে পারেন তখন দেহমধ্যে একপ্রকার ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহার নাম অনাহত ধ্বনি। করুণাডমরুধ্বনি বলিতে এখানে সেই অনাহত ধ্বনিই উদ্দিষ্ট। চাঁদ অস্তমিত হইলে তাহাব জ্যোৎস্নাও যেমন অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ বোধিচিত্ত বিনষ্ট হইলে তাহাব প্রকাশ বিষয়জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়। পদকর্তা তাই সাধনপথের বিঘ্নস্বরূপ ভয-ঘৃণা-লোকাচাব ইত্যাদিকে ছাড়িয়াছেন, সেই সমস্ত সংসারদূষণকে তিনি হরণ করিয়া অর্থাৎ বিফলীকৃত করিষা এই সাধনপথে চলিতে চলিতে শূন্যতাজ্ঞানে উপনীত হইযাছেন।

৩২

বাগ দেশাখ ॥ সবহপাদানাং ॥

নাদ ন বিন্দু ন রবি ন সসি১ মণ্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকল ॥ ধ্রু ॥
২উজু রে উজু২ ছাড়ি ৩ মা লেহু রে বঙ্ক।
নিঅড়্হি বোহি মা জাহু রে লাঙ্ক ॥ ধ্রু ॥
৪হাথে রে৪ কাঙ্কাণ মা লোউ৫ দাপণ।
অপণে অপা ৬বুঝ তু৬ নিঅমণ ॥ ধ্রু ॥
৭পার উআরেঁ৭ সোই গজিই৮।
দুজ্জন সাঙ্গে অবসরি জাই ॥ ধ্রু ॥
বাম দাহিণ জো খাল বিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪০ক]

পা. ১. শা. শশি। ২-২ পাঠ সন্দেহমুক্ত নহে, শা. উজুরে উজু, সু. ডুজুরে উজ্জ, উজ্জ স্পষ্ট, প্রথম শব্দটিকে ডুজুও পডা চলে, টীকায় উজু, শুদ্ধপাঠ উজুরে উজু? ৩. শা. নী. ছাডি। ৪-৪. টীকা. হাথের। ৫. সু. লোড। ৬-৬. শা. বুঝতু। ৭-৭. টীকা. পারোআবে, কিন্তু পরে আবার পার এবং উআর পৃথকভাবে ব্যাখ্যাত। ৮. টীকায় মজ্জংতি. পাঠ মজ্জিই? পুথিতে স্পষ্ট গজ্জিই।

অ ন্ব য়: নাদ নাই বিন্দু নাই রবি নাই শশিমণ্ডল নাই। চিত্তরাজ স্বভাবতই মুক্ত। ঋজু ঋজু [এই পথ], ইহাকে ছাড়িয়া বাঁকা পথ লইও না। বোধি নিকটেই,

লঙ্কায় যাইও না। হাতের কঙ্কণ, [দেখিবার জন্য] দর্পণ লইও না। আপনা আপনি নিজের মনকে বোঝ। সেই ভাবেই [সিদ্ধির] পারে যায় [কিন্তু] দুর্জন সঙ্গে অপসৃত হয়। বাম দক্ষিণে যাহা [তাহা হইল] খাল বিখাল (=বিপথ)। সরহ বলেন, বাপু, ঋজুপথ দেখা যায়।

টী কা টি প্প নী : নাদ···মণ্ডল=বৌদ্ধতন্ত্রে নাদ, বিন্দু, রবি, শশী ইত্যাদি যেমন বাম-দক্ষিণের ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে বোঝায় তেমনি সর্বপ্রকার দ্বৈত ভাবকেও বোঝায়। চিঅরাঅ< চিত্তরাজ। সহাবে<স্বভাবে। মুকল=মুক্ত; মুক্ত+ল (অতীতবাচক); অর্থানুসারে পদটি বিশেষণ, সুতরাং অতীতবাচক ল অপ্রয়োজনীয়; তবে চর্যায় নিষ্ঠান্ত বিশেষণে 'ল'-যুক্ত রূপ বিরল নহে, বেঢ়িল হাক (৬); অনুরূপ প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও লক্ষণীয়— পাকিল দাড়ী, কাটিল ঘাঅ। চিঅ···মুকল=চিত্ত স্বভাবত মুক্ত, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানের ফলেই তাহা আচ্ছন্ন বা বদ্ধ বলিয়া মনে হয়; দ্বৈতজ্ঞান মুক্ত করিতে পারিলেই চিত্তের সহজ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। উজু<ঋজু। লেহু=লইও; (অনুজ্ঞা)। বঙ্ক= বাঁকাপথ। নিঅড্‌হি=নিকটে; নিঅড্ডি>নিঅড্‌হি>নিঅড়ি। বোহি<বোধি। জাহু=যাইও; <জাস্ব=যা+স্ব। লাঙ্ক=লঙ্কা, দূরদেশ অর্থে। লোউ=লও বা লওয়া হোক; চর্যায় গ্রহণ করা অর্থে ধাতুটির ল, লা, লে এবং লো এই চার রূপে প্রয়োগ দেখা যায়; লোউ মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা, না প্রথম পুরুষের অনুজ্ঞা বলা দুরূহ; টীকানুসারে প্রথম পুরুষ বলিয়া মনে হয়; তবে টীকায় আক্ষরিক অনুবাদ নাই, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া বলা সম্ভব নয়। হাথে রে=হাতে-রে; টীকানুসারে পাঠ হাথের=হাতের; প্রসঙ্গানুসারে দুই পাঠই সমীচীন। দাপণ<দর্পণ। অপণে=নিজের দ্বারা; <*আত্মনেন= আত্মনা। অপা<আত্মা। বুঝতু<বুদ্ধতু। নিঅমণ<নিজমন। পারউআরেঁ =পারে উত্তীর্ণ হওয়াতে। উআরেঁ<উত্তারেন (উত্তার=উত্তরণ)। সোই= সেই<সো পি। গজিই=শব্দটির প্রকৃষ্ট অর্থনির্ণয় দুরূহ; টীকানুসারে শব্দটি গমিই অথবা মজিই হইতে পারে; গম্যাতে>গম্যাই>গমিই, সমীচীন; গম্যতে>গমিজ্জই>গইজই>গজিই—এভাবেও ব্যাখ্যা চলে। দুজ্জন<দুর্জন; মোহ ইত্যাদিকে দুর্জন বলা হইয়াছে। অবসরি=অধোগমনে; <* অপসরিত্বা=অপসৃত্বা। জাই<যাতি। বামদাহিণ=বামদক্ষিণ; ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়। খাল বিখলা=খাল-বিখাল, বিপথ। উজুবাট<ঋজুবর্ত্ম। ভাইলা =প্রতিভাত হইল; ভাত+ইল+আ।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য চর্যায় তান্ত্রিক সহজিয়া সাধনপদ্ধতির কথা উক্ত। বাম-দক্ষিণকে চাপিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করা ও আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের বক্রপথ পরিত্যাগ করিয়া সহজপথ অবলম্বন করার উপদেশ গীতিটির বর্ণিত বিষয়।

বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞানে আচ্ছন্ন চিত্ত বদ্ধ; যদিও বস্তুত চিত্ত স্বরূপত মুক্ত।

এই দ্বৈতজ্ঞান দূর করিতে পারিলেই চিত্ত স্বরূপে অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভাস্বরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্তকে এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সহজপথেই সম্ভব। সহজানন্দরূপ বোধি নিকটেই, নিজের দেহের মধ্যেই অবস্থান করে। তান্ত্রিক উপায়ে বোধিচিত্তকে অবধূতিমার্গে উর্ধ্বগামী করিতে পারিলেই মহাসুখ লাভ হয়। উহার জন্য লঙ্কায় যাইবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের দূর পথ অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। নিজের হস্তের কঙ্কণকে দেখিবার জন্য যেমন দর্পণের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ দেহমধ্যস্থ এই বোধিলাভের জন্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। নিজের মনেই স্বতঃস্ফূর্ত এই উপলব্ধি। এই পথেই সিদ্ধির অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু মোহাদির সংসর্গে পড়িলে এই সিদ্ধিই দূরবর্তী হইয়া পড়ে। মধ্যপথ বা অবধূতিমার্গই সহজ পথ। বাম-দক্ষিণের পথ বিপর্যয়ের দিকে লইয়া যায়।

৩৩

রাগ পটমঞ্জরী ॥ ঢেণ্টণপাদানাং১ ॥

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত২ ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
বেগ৩ সংসার বড্‌হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে ষামাঅ৪ ॥ ধ্রু ॥
বলদ৫ বিআএল গবিআ৬ বাঝেঁ।
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঝেঁ৭ ॥ ধ্রু ॥
৮জো সো বুধী৮ ৯সোধ নিবুধী৯।
জো যো চৌর ১০সোই দুষাধী১০ ॥ ধ্রু ॥
১১নিতে নিতে১১ ষিআলা ষিহে ষম জুঝঅ।
ঢেণ্টণপাএর১২ গীত বি(চি)রলেঁ১৩ বুঝঅ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪৮ক]

পা. ১. শা. সু. ঢেণ্ঢণ, চতুর্থ চরণের বেণ্টে পদের ণ্ট-এর সাদৃশ্যে ঢেণ্টণ পাঠ গৃহীত। ২. টীকা. হস্তী। ৩. টীকা. বেঙ্গ, শাস্ত্রীর সংশোধন বেঙ্গ(গ); চরণটির শুদ্ধপাঠ এবং অর্থ সম্পর্কে সংশয় আছে, দ্র টীকাটিপ্পনী। ৪. শা সু. ষামায়। ৫. টীকা. বলদা। ৬. টীকা. গাবী। ৭. শা. সাঁঝে। ৮-৮. টীকা. যো সো বুদ্ধি। ৯-৯. শা. সো ধনি বুধি; সু. সৌ ধনি বুধি; শুদ্ধপাঠ সো/সৌ নিবুধি? ১০-১০.শা. সোই সাধী; সৌ-এর ঔ-কারের চৈতন স্পষ্ট নহে; 'সো' পড়া চলে;

পরবর্তী ডু পুথির এই পৃষ্ঠার ডুহিল, ডুধু প্রভৃতির ডু-এর অনুরূপ নহে; অনেকটা নাগরীর ই-এর মত, চর্যার পুথিতে কদাচিৎ নাগরী লিপির প্রভাব আছে, সুতরাং 'সোই' পড়া চলে, তবে টীকার দুসাধ্যং, দুঃখেন সাধ্যতে প্রভৃতি হইতে দুষাধী পাঠের সমর্থন মেলে; প্রসঙ্গানুসারে একেবারে অর্থহীন নহে; তিব্বতী অনুবাদে পদটির অর্থ কোটাল; সুতরাং সেখান হইতে শুদ্ধপাঠের কোন সন্ধান মেলে না। ১:-১১. টীকা. নিতি নিতি; ২য় পংক্তিতেও নিতি। ১২. ১. পা. দ্র.। ১৩. শুদ্ধপাঠ বিরলেঁ? টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন বিরলে।

অ ন্ব য়: টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নাহি। হাঁড়িতে ভাত নাহি, নিত্য আবেশী (অতিথি) [সমাগম]। বেগে অথবা ব্যাঙের [সংসারের মত] সংসার বাড়িয়াই চলে, অথবা অঙ্গহীন সংসার বাড়িয়াই চলে। দোয়া দুধ কি বাঁটে প্রবেশ করে? বলদ প্রসব করিল, গাভী বন্ধ্যা। পাত্র দোহন করা হইল এই তিন সন্ধ্যা। যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ। যে চোর সেই সাধু, অথবা কোটাল বা চর। প্রতিদিন শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্টণপাদের গীত কম লোকেই বোঝে।

টী কা টি প্প নী: টালত = টিলার উপর; দেহমধ্যস্থ উচ্চ টিলা অর্থাৎ মহাসুখ-চক্র, সন্ধ্যাভাষায় টা = মহাসুখচক্র; তু.—উঁচা উঁচা পাবত…(২৮), টাল + ত (৭মী) < ত্র বা তস্ প্রত্যয়; দ্র. দুআরত (৩)। পড়বেষী = প্রতিবেশী > পড়িবেসী > পড়বেষী; আ. বাং পড়িশী বা পড়শী; গূঢ়ার্থে দ্বৈতজ্ঞান। হাড়ীত = হাঁড়িতে, দেহভাণ্ডে। ভাত = এখানে প্রকৃতিদোষযুক্ত সংবৃতি বোধিচিত্ত। আবেশী = অতিথি, অবৈধ প্রণয়ী, পারমার্থিক বোধিচিত্ত; < আবেশিক। টালত …আবেশী = চিত্ত যখন মহাসুখচক্রে উর্ধ্বগামী হয় তখন সমস্ত দ্বৈতভাব চলিয়া যায়, দেহের মধ্যে সংবৃতি বোধিচিত্তের আর সন্ধান পাওয়া যায় না, পারমার্থিক বোধিচিত্ত নিত্যই আসে। বেগ = বেগে, দ্রুত; পাঠান্তর বেঙ্গ = ব্যাঙ; টীকানুসারে বিগত অঙ্গ যাহার—ব্যঙ্গ, বেঙ্গ, প্রকৃতিদোষমুক্ত অর্থাৎ প্রভাস্বর হইলেই বিগত-অঙ্গ হয়। বড়হিল = বর্ধিত > বড়হিঅ + ইল। জাঅ = যাতি। বেগ…জাঅ = আপাত অর্থ ব্যাঙের সংসারের মত সংসার বাড়িয়া চলে, অথবা সংসার অঙ্গহীন অথচ তাহা বাড়িয়াই চলে, টীকানুসারে গূঢ়ার্থ = প্রভাস্বর শূন্যতা বাড়িয়াই চলে, পংক্তিটির সঠিক পাঠ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের সংশয় আছে; তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে চরণটির পাঠ: বেঙ্গস সাপ বড়হিল জাঅ = ব্যাঙের দ্বারা সাপ তাড়িত; গীতিটি যেমন হেঁয়ালি ভাষায় রচিত তাহাতে ঐ জাতীয় কোন পাঠই প্রত্যাশিত; কবীরের গীতে (পরে দ্র.) 'মীড়ক সোবৈ সাপ পহরইয়া'—ব্যাঙ শায়িত, সর্প প্রহরী—পাওয়া যায়; চর্যায় উদ্ধৃত চরণটি স্পষ্টভাবে তাত্ত্বিকতাপ্রকাশক; অন্যান্য চরণগুলির মত হেঁয়ালিপূর্ণ তাত্ত্বিকতা

নহে, মনে হয় চরণটি মূল পাঠ হইতে সরিয়া আসিযাছে। দুহিল— <*দুহিত =দুগ্ধ+ইল (বিণ), দোযা। দুধু=দুধ, দুগ্ধ>দুধ>দুধু, স্বরসঙ্গতি, দোয়া দুধ= বোধিচিত্ত। বেণ্টে< বৃন্তে, বাঁটে, মহাসুখচক্রপথে। ষামাঅ=প্রবেশ করে, সমায়াতি> সমাআই> সামাই, ষামায়, ষামাঅ। দুহিল ষামাঅ= দোয়াদুধ পুনরায় বাঁটে প্রবেশ করে, সংবৃতি বোধিচিত্ত পারমার্থিক বোধিচিত্তের অবিদ্যাচ্ছন্ন অবস্থা, তাহাই পুনরায় অবিদ্যামুক্ত হইযা মহাসুখচক্রপথে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পবিণত হয়; তাই বলা হইয়াছে, দোয়াদুধ আবার বাঁটে প্রবেশ করে। বলদ=গূঢার্থে সংবৃতি বোধিচিত্ত, <*বলদ=বলীবর্দ। বিআএল= প্রসব করিল, বিযাত+এল। বিআণ, ২০ সং চর্যা দ্র.। গবিআ=গাভী। বাঝেঁ=বন্ধ্যা। পিটা=দোহন পাত্র, প্রকৃতিদোষসমূহ, <পিটক। দুহিএ= দোহন করা হয, দুহ্যতে>দুহিঅই>দুহিএ। তিন সাঝেঁ=ত্রিসন্ধ্যা, অহর্নিশ। বলদ · সাঝেঁ=সংবৃতি বোধিচিত্তই এই জগৎসংসারের ধারণা প্রসব করে, নৈরাত্মারূপী শূন্যতাই গাভী, ইহা জগৎসংসারের অস্তিত্বেব ধারণামুক্ত, তাই বন্ধ্যা; সংবৃতি বোধিচিত্তকে প্রভাস্বরতায় পরিণত করার জন্য অহর্নিশ তাহার প্রকৃতিদোষসমূহকে দোহন করা হয, অর্থাৎ নিঃস্বভাবীকৃত করা হয। জো সো =যাহা সেই। বুধী=বুদ্ধি, বাল যোগিগণের বুদ্ধি, সবিকল্প জ্ঞান। সোধ= শুদ্ধচিত্ত যোগিগণের, অথবা পাঠান্তরে সোইঁ=তাহাই। নিবুধী= অজ্ঞগণের সবিকল্প জ্ঞান পরমার্থবিদের নিকট নির্বুদ্ধিতা রূপে প্রতিভাত। চোর= চিত্তকেই এখানে চোর বলা হইযাছে, কারণ চিত্ত বিষযসুখের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও তাহা আহরণ করে, অথবা চিত্ত প্রকৃতিদোষ অপহরণ করে তাই সে চোর, আবার, সেই কোটাল বা চব প্রকৃতিদোষ-মুক্ত। দুষাধী< দোঃ সাধিক। ষিআলা<শৃগাল, চিত্তই শৃগাল কারণ ইহা সর্বদা মৃত্যুভযে ভীত। ষিহ=সিংহ, পাবমার্থিক বোধিচিত্ত, সংবৃতি বোধিচিত্ত সর্বদা পারমার্থিক বোধিচিত্তের সহিত যুদ্ধ করে, পারমার্থিক চিত্তের চেষ্টা প্রকৃতি-দোষমুক্ত করিয়া তাহাকে প্রভাস্বরতায় পরিণত করা, সংবৃতি বোধিচিত্ত তাহাতে বাধা দেয়। ঢেণ্টণ · বুঝঅ=গীতিটি যে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষাতে রচিত, তাহা পদকর্তা নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, ঢেণ্টণপাদের গীতি খুব কম লোকেই বোঝে। জুঝঅ<যুধ্যতি। বুঝঅ<বুধ্যতি।

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য চর্যায় আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র গ্রাম্য জীবনের বিপর্যস্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেইদিক দিয়া তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ উপলব্ধির জন্য চর্যাটির বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্য হেঁযালিভাষায় উক্ত, বিরোধাভাসপূর্ণ বাচ্যার্থ চর্যাকারেব উদ্দিষ্ট নহে। তান্ত্রিক সাধনার আনুষঙ্গিক গোপনীয়তার উদ্দেশ্যে হেঁয়ালির অন্তরালে গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনাই চর্যাকারের উদ্দেশ্য। গূঢ়ার্থে চর্যাটিতে মূলত সংবৃতি বোধিচিত্ত ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের স্বরূপ,

পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টিতে পরিণতির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য গীতির মত এখানে অল্প দু-একটি শব্দমাত্র সন্ধ্যা অর্থে প্রযুক্ত নহে। আগাগোড়া গীতিটিই প্রায় সন্ধ্যাভাষায় ব্যক্ত। এই দিক দিয়া ২ সং গীতির সহিত ইহার মিল লক্ষণীয়।

গীতিটির আপাত অর্থ : দূরে কোন টিলার উপর পদকর্তার বাস। সেখানে তাঁহার প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই, কিন্তু অতিথি অভ্যাগম নিত্য লাগিয়াই আছে। সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে— দেখিয়া-শুনিয়া যেন মনে হইতেছে সংসারে শুধু উলটা ব্যাপারই ঘটিতেছে—দোয়া দুধ বাঁটে প্রবেশ করিতেছে, বলদ প্রসব করিতেছে, গাভী বন্ধ্যা ইত্যাদি। কিন্তু গূঢ়ার্থে— মহাসুখচক্রগামী চিত্ত দ্বৈতজ্ঞানমুক্ত; দেহের মধ্যে সংবৃতি বোধিচিত্তের আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পারমার্থিক বোধিচিত্তের এখন নিত্য যাতায়াত। বিগতাঙ্গ (প্রকৃতিদোষমুক্ত) চিত্তের প্রভাস্বরতা বাড়িয়াই চলে। মহাসুখচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন চিত্ত পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করে। সংবৃতি বোধিচিত্তরূপ বলদই এই জগৎসংসারের অস্তিত্বের মিথ্যা ধারণা প্রসব করে। কিন্তু নৈরাত্মারূপী গাভীস্বরূপ চিত্ত এই ধরনের প্রকৃতিদোষমুক্ত, তাই তাহা বন্ধ্যা। সংবৃতি চিত্তই প্রকৃতিদোষমুক্ত হইলে পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়। তাই অহর্নিশ সেই চেষ্টাই করা হয় পিটা (প্রকৃতিদোষসমূহকে) দোহনের (নিঃস্বভাবীকরণের) মধ্য দিয়া। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া মনে করে বস্তুত তাহা নির্বুদ্ধিতা। চিত্ত প্রকৃতিদোষ আহরণের চেষ্টা করে, তাই সে চোর। আবার মুক্ত অবস্থায় সেই সাধু। সংবৃতি বোধিচিত্ত কিন্তু সহজে মুক্ত হইতে চাহে না, বাধা দেয়, তাই পারমার্থিক বোধিচিত্তের সঙ্গে তাহার নিত্য দ্বন্দ্ব।

গীতিটির সহিত কবীরের একটি পদের আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায় :

কৈসেঁ নগরি করোঁ কুটবারী।
চঞ্চল পুরিষ বিচষণ নারী ॥
বৈল বিয়াই গাই ভঈ বাঁঝ।
বছরা দুহৈ তীনূঁ সাঝ ॥
মকড়ী ধরি মাখী ছছি হারী।
মাস পসারি চাহ্ল রখবারী ॥
মূসা খেবট নাব বিলইয়া।
মীড়ক সোবৈ সাপ পহরইয়া ॥
নিত উঠি স্যাল স্যংঘসূ ঝুঝৈ।
কহৈ কবীর কোঈ বিরলা বূঝৈ ॥

—কী করিয়া এই নগর রক্ষা করা যায় যেখানে পুরুষ চঞ্চল, নারী বিচক্ষণ। বলদ প্রসব করিয়াছে, গাভী বন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা বাছুরকে দোহন করা হয়। মাকড়সা

মাছি ধরে, সে ছাড়াইতে চেষ্টা করে কিন্তু হারিয়া যায়। মাংস পশরা দিয়া চিল্লকে প্রহরায় রাখা হইয়াছে। মূষিক নাবিক, বিড়াল নৌকা, সাপের প্রহরায় ব্যাঙ শুইয়া আছে। নিত্য উঠিয়া শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। কবীর কহে, কেহ কেহ বিরলে বোঝে।*

কবীরেব এই পদটি অন্য পাঠেও পাওয়া যায়।

৩৪

বাগ বরাড়ী ॥ দাবিকপাদানাং ॥

সুন করুণরি১ অভিনচারেঁ২ কাঅবাকচিঅ৩ ।৪
বিলসই দারিক গঅণত পাবিম কুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
অলক্ষ৫ লখ চিত্তা মহাসুহেঁ৬ ।৪
বিলসই দাবিক গঅণত পাবিম কুলেঁ ॥ ধ্রু ॥
কিন্তো (।ক)৭ মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণ বখানে।
অপইঠান মহাসুহলীণে৮ দুলখ পবম নিবাণেঁ ॥ ধ্রু ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী।
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তর মাণী ॥ ধ্রু ॥
রাআ রাআ রাআ রে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।
লূই৯ পাঅপএ১০ দারিক দ্বাদশ ভুঅণেঁ লধা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৪৯ক-খ]

পা. ১. পুথিচিত্র অস্পষ্ট, শাস্ত্রীর পাঠ গৃহীত। ২. শা. অভিনবারেঁ; সে পাঠও সম্ভব; টীকায় অভেদোপচারেণ হইতে অভিনাচারেঁ। ৩. পুথিতে কাঅবাক্কিঅ আছে; টীকা ও অর্থানুসারে শাস্ত্রীর পাঠ রক্ষিত। ৪. ১ম ও ৩য় চরণের অন্তে দাঁড়ি নাই; এমন অন্যত্রও আছে, তবে এক্ষেত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের অসঙ্গতি লক্ষণীয়; ২য় ও ৪র্থ চরণের শেষে ॥ ধ্রু ॥ না থাকিলে ১ম ও ২য় এবং ৩য় ও ৪র্থ চরণ মিলিয়া একটি করিয়া চরণ ধরা চলিত। ৫. টীকা অলখ। ৬. শা. মহাসুহে। ৭. কিন্তো এবং মন্তে-র মধ্যে একটি দাঁড়ি (।) এবং ক অর্থাৎ 'ক' লিখিত; মনে হয় লিপিকর পুনরায় কিন্তো লিখিতে যাইয়া ভুল ধরা পড়ায় পুরা লেখেন নাই, বর্জন চিহ্নও দেন নাই। ৮. টীকানুসারে লীলেঁ? ৯. টীকা লুয়ী। ১০. টীকানুসারে পসাএ/পসাএঁ (?)।

অন্বয়: শূন্য-করুণার অভিন্নাচারে কায়বাক্‌চিত্ত [লইয়া] দারিক গগনের পরম কূলে বিলাস করিতেছেন। চিত্তের লক্ষণ (=স্বরূপ) অলক্ষ্য হওয়ায় দারিক

* দ্র. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, পৃ. ১৩৫-৬

গগনের পরম কূলে (মহাসুখে) বিলাস করিতেছেন। মন্ত্রেই বা কী [লাভ] তোর, তন্ত্রেই বা কী তোর, কী হইবে ধ্যান ব্যাখ্যানে? মহাসুখলীনে অথবা মহাসুখলীলায় অপ্রবিষ্ট [থাকিলে] পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য। সুখদুঃখকে এক করিয়া [দারিক] ইন্দ্রিয়ভোগ করেন, সকল বিষয়ের অনুত্তর হইয়া (সকল বিষয়ের পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া) দারিক আত্মপর ভেদ অনুভব করেন না। রাজা, রাজা, রাজারে, অপর রাজা [সকলে] মোহে বদ্ধ কিন্তু লুইপাদের প্রসাদে দারিক [কর্তৃক] দ্বাদশভুবন লব্ধ।

টী কা টি প্প নী: সুন<শূন্য। করুণরি=করুণার, করুণ+র (ষষ্ঠী) +ই (স্ত্রী ?); চর্যায় অ-কারান্ত শব্দে ষষ্ঠীতে স্ত্রীলিঙ্গ হইলে সাধারণত 'এরি' যুক্ত হয়, যেমন হাড়েরি (১০), চান্দেরি (৩১), এখানে শব্দটি মূলত আ-কারান্ত হইলেও অ-কারান্ত রূপে প্রযুক্ত, কিন্তু প্রত্যয় 'এরি' স্থানে কেবল 'রি'; ইহা ছাড়াও লক্ষণীয়, এখানে স্ত্রীপ্রত্যয়ের কোন সঙ্গত কারণ নাই, কেননা ইহার সহিত সম্পৃক্ত অভিনাচারে পদটি পুংলিঙ্গ; শুদ্ধপাঠ সুন করুণার? সুন·· চাঁরে=শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতায়। কাঅ বাক চিঅ=কায়বাক্ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হওয়ায়। বিলসই=<বিলসতি। গঅণত=গগনে (৭মীতে 'ত'; ৩ চর্যার টীকা দ্র.); পারিম=পরম, অন্তিম; পার+ডিম (ভাবার্থে)। গঅণত····· কুলে= চিত্তের চতুঃশূন্য অবস্থার শেষ স্তর 'সর্বশূন্য' অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রভাস্বর রূপ; তাহাই গগন। অলক্ষলখচিত্তা=চিত্তের লক্ষণ বা স্বরূপ অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা অলক্ষ্য, বিলুপ্ত; চিত্ত যখন সর্বশূন্য স্তরে বিলাস করে তখন এইরূপ হয়। কিন্তো=কিং+তো; কি তোর। মন্তে=<মন্ত্রেণ। তন্তে<তন্ত্রেণ। ঝাণ<ধ্যান। বখানে<ব্যাখ্যানেন। অপইঠান<অপ্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠাহীন। মহাসুখলীনে=মহাসুখে লীন অবস্থায়; পাঠান্তর মহাসুখলীলেঁ=মহাসুখলীলাতে। দুলখ<দুর্লক্ষ্য। কিন্তো·· ···পরম নিবাণে=সাধনার পথ সহজপথ, তাই মন্ত্র, তন্ত্র, ধ্যান-ব্যাখ্যান ইত্যাদিতে কিছু হয় না; যাঁহারা মহাসুখলীলায় অপ্রতিষ্ঠান, অপ্রবিষ্ট তাঁহাদের নিকট পরম নির্বাণ দুর্লক্ষ্য। একু=এক>এক্ক>একু। ভুঞ্জই=<*ভুঞ্জতি (=ভুঙ্‌ক্তে)। ইন্দিজাণী<ইন্দ্রিয়ানি=ইন্দ্রিয়সমূহ; অথবা ইন্দি<ইন্দ্রিয়; জাণী<*জানিত=জ্ঞানী। স্বপরাপর=আত্মপর ভেদ। চেবই=অনুভব করে; চেতয়তি>চেঅঅই>চেঅই>চেবই (ব-শ্রুতি)। সঅলানুত্তর=সকল+অনুত্তর; সকল বিষয়ে অনুত্তর হইযা অর্থাৎ সকল বিষয়ে চরমতত্ত্ব অবগত হইয়া। দুঃখে···মানী=সুখ-দুঃখকে এক করিয়া দারিক গুরুর উপদেশে ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ ভোগ করেন; মহাসুখ লাভ করিলে চিত্তের অবস্থা এইরূপ হয়, সুখ-দুঃখ তখন একাকার হইয়া যায়; দারিকও তাই আত্মপর কোন ভেদ করিতে পারেন না, তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। রাআ<রাজা। অবর <অপর। মোহেরা=মোহের দ্বারা। বাধা=<বদ্ধক। লুইপাঅপএ=লুই-এর

পাদ-প্রসাদে, অথবা পাদ-পদ্মে , <পাদপদেন , অথবা টীকানুসারে পাঅপসাএঁ <পাদপ্রসাদেন। লধা<লব্ধ ; প্রতিষ্ঠিত। রাআ লধা=দারিক মহাসুখ লাভ করিয়া রাজা হইযাছেন , অন্য বাজা যাঁহারা আছেন তাঁহারা বিষযমোহে বদ্ধ , কিন্তু দারিক লুই-এর পাদপ্রসাদে দ্বাদশ ভুবন লাভ করিয়াছেন।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : আলোচ্য চর্যায় শূন্যতা ও করুণার অভিন্নতাব দ্বারা গগনেব পরমকুলে, সর্বশূন্যস্তবে বিহার অর্থাৎ সহজিয়া সাধনার সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে এবং অতঃপর চিত্তের কী অবস্থা হইযাছে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। গীতিটিতে সাধনপদ্ধতিব কিছু ইঙ্গিত, সহজিয়া মনোভাব এবং লব্ধ-মহাসুখ চিত্তের বর্ণনা পাওয়া যায়।

পদকর্তা দাবিক কাযবাক্‌চিত্ত পরিশুদ্ধ করিযা, শূন্যতা ও করুণাব অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার ভিতব দিযা চিত্তেব প্রকৃতিপ্রভাস্বব সর্বশূন্য স্তরে মহাসুখে বিলাস করিতেছেন। এই অবস্থায চিত্তেব নিজস্ব স্বরূপ অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জ্ঞান-সৃষ্টির ক্ষমতা লুপ্ত হয, তাই মহাসুখে বিলাস করা সম্ভব হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ধ্যান-ধারণার দ্বাবা কিছুই হয না। মহাসুখলীলায় প্রবেশ না করিলে নির্বাণ লাভ হয় না। মহাসুখলীলায় প্রবেশ করিলে সুখদুঃখ একাকার হইযা যায, আত্মপর ভেদ থাকে না। সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠিয়া দ্বাদশ ভুবনে আধিপত্য বিস্তার করা যায়। অন্য সমস্ত বাজা যাঁহারা আছেন তাঁহারা মোহবদ্ধ কিন্তু গুরুর পদপ্রসাদে দাবিক এই দ্বাদশ ভুবনেব আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

৩৫

বাগ মল্লাবী ॥ ভাদেপাদানাং ॥

এতকাল হাউঁ[১] [২]অচ্ছিলেঁসু মোহেঁ[২]।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ চিঅরাঅ[৩] মকু ণঠা।
গ[অ]ণ[৪] সমুদেঁ[৫] টলিআঁ[৬] পইঠা ॥ ধ্রু ॥
পেখমি দহদিহ সব্বই[৭] শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন ॥ ধ্রু ॥
বাবুলেঁ[৮] দিল মোহকখু ভণিআ।
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ[৬] ॥ ধ্রু।
ভাবেঁ[৯] ভণই অভাগে লইআ।
চিঅরাঅ[১০] মঁই[১১] অহার কএলা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৫১ক-খ]

পা. ১. শা. হাঁউ। ২-২. শা. নী. অচ্ছিলেঁ স্বমোহে; 'পুথিতে ব-ফলা এবং উ-কার অনেকটা একরকম হইলেও স্পষ্ট পার্থক্যও বিদ্যমান; ব-ফলার ত্রিকোণটির মধ্যভাগ ফাঁকা কিন্তু উ-কারের কালিভরা। ৩. সু. চিঅরাগ; পুথিতে সম্ভবত চিঅরাজ লিখিয়া চিঅরাঅ করা, টীকা চিত্তরাজ; শেষ পংক্তিতেও চিঅরাঅ। ৪. পুথি গণ; সম্ভবত অ-বর্ণটি ছাড় পড়িয়াছে। ৫. শা. সু. সমুদে। ৬ শা. সু. টলিআ। ৭. শা. সু. সর্ব্বই। ৮. শা. বাজুলে; পুথিতে স্পষ্ট রাবুলে; টীকা বাজুলে; শাস্ত্রী সম্ভবত টীকানুসারে সংশোধন করিয়া উল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। ৯. শা. ভাদে; টীকানুসারে উহাই শুদ্ধপাঠ অনুমিত। ১০ নী. চিত্মরাঅ। ১১. শা. সু. মই।

অন্বয়: এতকাল আমি ছিলাম মোহে। এবার আমি বুঝিলাম সদ্‌গুরু-বোধে (উপদেশ)। এখন আমার চিত্তরাজ নষ্ট [হইযাছে, তাহা] গগন-সমুদ্রে টলিআ প্রবিষ্ট [হইযাছে]। [আমি] দশদিশ সকলই শূন্য দেখি। চিত্তবিহনে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। রাবুলে (রাহুল) অথবা বজ্রগুরু আমার মোহকক্ষ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি গগনে পানীয (অমৃত) ভক্ষণ করিলাম। ভাদেপাদ বলেন অভাগ (সম্পূর্ণকে) লইয়া, আমি চিত্তরাজকে আহার করিলাম।

টীকাটিপ্পনী: হাউ=আমি, অহম্>অহকম্>হকম্>হঁউ, হাউঁ। অচ্ছিলেঁস্থ=ছিলাম, অতীত, উত্তম পু., -স্থঁ বিভক্তি অপভ্রংশের; I. E * √এস্=OIA √অস্; ইন্দোইউরোপীয় রূপ * এস্-স্কে-তি>অস্-ছ-তি> অচ্ছতি; প্রাচীন ভারতীয় আর্যে 'অস্তি'র পাশাপাশি 'অচ্ছতি'র প্রয়োগ ছিল, সুতরাং বাংলা আছ্ ধাতুর উদ্ভব অচ্ছ্ ধাতু হইতে ধরা উচিত। এবেঁ—এবম্হি>* এব্বম্হি>এব্ব হিং>এবেঁ। মই<ময়া। বুঝিল<* বুদ্ধিত+ইল। মই বুঝিল=আক্ষরিক অর্থে আমাব দ্বারা বোঝা হইল; কর্মভাববাচ্য; প্রাচীনকাল হইতে কর্তৃবাচ্যজ্ঞাপক অর্থ—আমি বুঝিলাম। বোহেঁ<বোধেন; চিঅরাঅ=চিত্তরাজ; সংবৃতি বোধিচিত্ত। মকুঁ=আমার, মম>ম+কুঁ<কৃত (ষষ্ঠী)। ণঠা<নষ্ট। গঅণ সমুদে=গগন সমুদ্রে, সর্বশূন্যস্তরে। টলিআ<টলিত্বা। পইঠা<প্রবিষ্ট। এতকাল পইঠা= এতকাল মোহগ্রস্ত ছিলাম; গুরুর উপদেশে সংবৃতি বোধিচিত্তের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে বিনষ্ট (নিঃস্বভাবীকৃত) করিয়াছি; তাহার প্রাতভাসিক জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে; তাই এখন আমার পক্ষে প্রকৃতিপ্রভাস্বর সর্বশূন্যস্তরে বিলাস করা সম্ভব। পেখমি=দেখি; প্রেক্ষ>পেখ+মি<স্মি। দহদিহ<দশদিশ। বিহুন্নে=বিহীনে; অনুসর্গ; বিভূন>বিহুন+এ>বিহুন্নে; অন্ত্যস্বরে শ্বাসাঘাতের ফলে দ্বিত্ব। পুন্ন<পুণ্য। রাবুলেঁ<রাহুলেন; অথবা রাজকুলেন>রাউলেঁ>রাবুলেঁ (ব-শ্রুতি); টীকানুসারে বাজুলে=বজ্রগুরু;

<বজ্রকুলেন। মোহকখু=মোহকক্ষ; মো<মম; কখু<কক্ষ। ভণিআ= ভাঙ্গিয়া; <*ভঞ্জিত্বা=ভঙ্‌ক্ত্বা। অহারিল=আহার করা হইল; <*অহারিত=(আহৃত)+ইল। মই অহারিল—কর্মভাববাচ্য; দ্র. মই বুঝিল। গঅণত=মহাসুখচক্রে; <গগন+ত (৭মী); ৩ সং চর্যা দ্র.। পণিআঁ= পানীয় (অমৃত); পাঠান্তর রাবুলেঁ…পণিআ=(বজ্রগুরুর) উপদেশে মোহকক্ষ (মোহান্ধতা) বিনষ্ট হইয়াছে; আমি মহাসুখচক্রে (গগনে) পরমসিদ্ধির অমৃত (পানীয়) ভক্ষণ করিলাম। ভণই<ভণতি। অভাগে=অভাগকে অর্থাৎ যাহাকে ভাগ করা যায় না; অদ্বয়সত্য। কএলা<কৃত+ইল+আ।

ব্যা খ্যা সং কে ত: চর্যার সাধকেরা মায়াবাদী। তাঁহারা মনে করেন জগৎসংসার-সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান মিথ্যা, তাহা সংবৃতি বোধিচিত্তের সৃষ্টি। চিত্তের সংবৃতি স্বরূপকে (প্রকৃতিদোষযুক্ত, সমল অবস্থাকে) বিনষ্ট করিয়া প্রকৃতিপ্রভাস্বর, পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত করিতে পারিলেই সিদ্ধি। বিভিন্ন চর্যায় তাই একদিকে চিত্তবিনাশ অন্যদিকে চিত্তগঠনের কথা। আলোচ্য চর্যাতেও সেই চিত্তবিনাশের কথা বলা হইয়াছে প্রথম দুটি পদে। তৃতীয় পদে চিত্ত বিনষ্ট হওয়ায় শূন্যতাজ্ঞান লাভ হইয়াছে—সেকথা বলা হইয়াছে। পরবর্তী পদে সহজিয়া-সুলভ গুরুর উপদেশের উপর নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত। পদকর্তা গুরুর উপদেশেই মোহমুক্ত হইয়া সংবৃতি বোধিচিত্তকে নিঃস্বভাবীকৃত করিয়া চিত্তের সর্বশূন্য স্তরে উপনীত হইয়াছেন। শেষ পদে বিনষ্টচিত্ত ও অদ্বৈতজ্ঞান-প্রাপ্ত (অভাগে লইয়া) পদকর্তার ভণিতা।

৩৬

রাগ পটমঞ্জরী ॥ কৃষ্ণাচার্য্যপাদানাঃ ॥

সুণ[১] বাহ তথতা পহারী।
মোহভণ্ডার লই[২] সঅলা অহারী ॥ ধ্রু ॥
ঘুমই ণ চেবই সপর বিভাগা।
সহজ নিদালু কাহ্নিলা লাঙ্গা ॥ ধ্রু ॥
চেঅণ ণ বেঅন[৩] ভর নিদ গেলা।
সঅল সুফল করি সুহে সুতেলা ॥ ধ্রু ॥
স্বপণে[৪] মই দেখিল তিহুবণ সুণ।
ঘোরিঅ অবণাগমণ বিহুন[৫] ॥
শাখি করিব জালন্ধরিপাএ।
পাখি[৬] ণ চাহঅ[৭] মোরি পাণ্ডিআচাদে[৮] ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৫২ক]

পা. ১. পুথিতে সুশ; লিপিপ্রমাদ; টীকা সুন; সু. সুন (টীকার পাঠ)। ২. শা. সু. লুই। ৩. সু. বেঅণ। ৪. নী. স্বপনে। ৫. শা. বিহল। ৬. সু. পারি; পুথিতে পারি লিখিয়া পাখি করা। ৭. টীকার 'পশ্যন্তি' অনুসারে চাহঅ পাঠ অনুমিত। ৮. পুথি চাদে; শুদ্ধপাঠ চাএ?

অ ন্ব য়: শূন্যতা [রূপ] বাস তথতা দ্বারা প্রহৃত। সমস্ত মোহভাণ্ডার লইয়া আহার (নিঃশেষ) করা হইল। অথবা, পাঠান্তর, লুই সকল মোহ-ভাণ্ডার আহার করিলেন (নিঃশেষ করিলেন)। ঘুমায়, (তাই) আত্মপর-ভেদ (চেতনা) নাই; সহজ নিদ্রামগ্ন উলঙ্গ (যোগী) কাহ্নিল (পদকর্তা কৃষ্ণাচার্য)। তাহার চেতনাও নাই, বেদনাও নাই। ঘোর নিদ্রামগ্ন। সকল কিছু সুফল (অথবা মুক্ত) করিয়া তিনি সুখে শায়িত। স্বপ্নে আমি দেখিলাম ত্রিভুবন শূন্য, গমনাগমনের ঘুরপাকবিহীন। সাক্ষী করিব জালন্ধরিপাদকে [কারণ] পণ্ডিতাচার্যেরা আমার দিকে রহেন না বা চাহেন না (দেখেন না)।

টী কা টি প্প নী: সুণ<শূন্য, প্রথম তিন শূন্য (দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়, শূন্যের আলোচনা। বাহ<বাস; বাসনাগার, মোহভাণ্ডার; প্রথম তিনটি শূন্য প্রকৃতি-দোষযুক্ত, তাই তাহা মোহভাণ্ডারস্বরূপ। তথতা=চতুর্থ শূন্য। পহারী<প্রহারিত। লই=লইয়া <*লভিত্বা=লব্ধ্বা। সঅলা<সকল। অহারী < আহারিতম্; আহার করিল, বিনষ্ট করিল। সুণ··· অহারী=চতুর্থ শূন্য তথতা দ্বারা প্রথম তিন শূন্যকে আঘাত করা হইল এবং সমস্ত প্রকৃতিদোষ, মোহভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল। ঘুমই=ঘুমায়<*ঘুম্যতি। চেবই=৩৪ সং চর্যা দ্র.। সপরবিভাগা=স্ব ও পর অর্থাৎ আত্মপর এই বিভেদ। কাহ্নিলা=কাহ্ন+ইলা (তুচ্ছার্থে)। লাঙ্গা<উলঙ্গ; নগ্ন। ঘুমই···লাঙ্গা=নগ্ন সাধক কাহ্ন সহজ-নিদ্রায় মগ্ন; তাই তাঁহার আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই; তিনি সমস্তপ্রকার প্রকৃতি-দোষমুক্ত, সমস্ত ভেদজ্ঞান-রহিত। চেঅণ<চেতন। বেঅণ<বেদন। সুহে<সুখে। সুতেলা=সুত<সুপ্ত+এলা (ইল্ল-জাত, অতীতবাচক)। চেঅণ···সুতেলা=এই পদটি পূর্বপদের অনুবৃত্তি; সহজ নিদ্রামগ্ন সাধক কাহ্নের চেতনা, বেদনা কিছুই নাই; তিনি পরম সুফল লাভ করিয়া (অথবা পাঠান্তর অনুসারে সমস্ত প্রকৃতি-দোষ হইতে মুক্ত হইয়া) সুখনিদ্রামগ্ন। মই দেখিল=আমা কর্তৃক দৃষ্ট হইল, আমি দেখিলাম; প্রাচীন বাংলায় ইহা বিশেষণ ছিল এবং কর্মভাববাচ্যে প্রযুক্ত হইত; মধ্য বাংলা শুরু হইতে এই রূপগুলি হইতে -ল, বা -ইল প্রত্যয়যুক্ত অতীতের ক্রিয়াপদ গঠিত। তিহুবণ<ত্রিভুবন। ঘোরিঅ=ঘুরপাক; পদটির ব্যাখ্যা এবং শুদ্ধপাঠ সন্দেহমুক্ত নহে; টীকায় ঘানিকেতি অর্থাৎ ঘানি বলা হইয়াছে; ইহাতেও ঘুরপাকের ইঙ্গিত আছে; ড. বাগচী তিব্বতী অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া

ঘোলিঅ পাঠ অনুমান করেন, অর্থ, মিশাইয়া; প্রসঙ্গ অনুসারে ঘুরপাক অর্থই সমীচীন। অবণাগমণ=যাতায়াত; আনাগোনা, ২১ সং চর্যা দ্র.। বিহুণ= বিহীন, <*বিভূন, অনুসর্গ। স্বপণে…বিহুণ=স্বপ্নে আমি ত্রিভুবনকে শূন্যরূপে, জন্মমৃত্যুরূপ গমনাগমন-শূন্যরূপে দেখিলাম। শাখি<সাক্ষী। পাখি= পক্ষ, নিকটে। রাহঅ=রহে<রহতি; টীকানুসারে চাহঅ=চাহে, দেখে বা তাকায়; চাহ<চক্ষ। মোবি=আমার, মো<মম+র (ষষ্ঠী)+ই (স্ত্রী)। পাণ্ডিআচাএ<পণ্ডিতাচার্য।

ব্যা খ্যা সং কে ত: সমস্ত প্রকৃতিদোষ দূর করিয়া সর্বশূন্য স্তরে উন্নীত, মহাসুখ-নিদ্রামগ্ন সাধকের চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে আলোচ্য গীতে।

চিত্তের প্রথম তিন শূন্যের অবস্থা প্রকৃতি-দোষযুক্ত। চতুর্থ শূন্য—তথতা, প্রকৃতিদোষমুক্ত। এই তথতাদ্বারা আঘাত করিয়া চিত্তের মোহভাণ্ডার বিনষ্ট করিতে হয়। এইভাবে সংবৃতিবোধিচিত্ত পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়। চিত্তের এই অবস্থায় আত্মপর ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়। সহজ বা মহাসুখ-নিদ্রামগ্ন এই অবস্থায় কোন বাহ্যিক চেতনা বা অনুভূতি থাকে না। এই সুখ-নিদ্রাগত অবস্থায় জগৎ স্বপ্নবৎ শূন্যরূপে, জন্মমৃত্যুরূপ গমনাগমনশূন্যরূপে প্রতিভাত হয়। এই সত্যের একমাত্র সাক্ষী হইতে পারেন গুরু জালন্ধরিপাদ। অন্য সকলে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ নামে পরিচিত তাঁহারা কেহই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ নহেন, তাই তাঁহারা পদকর্তার পক্ষাবলম্বন করিবেন না।[১]

৩৭

রাগ কামোদ ॥ তাড়কপাদানাং ॥

অপণে নাহিঁ মো১ কাহেরি সঙ্কা২ ।
তা মহামুদেরি৩ টুটি৪ গেলি কংখা ॥ ধ্রু ॥
অনুভব সহজ মা ভোল রে জোই ।
চৌকোড্‌হি৫ বিমুকা জইসো তইসো হোই ॥ ধ্রু ॥
জইসনে অছিলেস তইসনে অচ্ছ৬ ।
সহজ পিথক৭ জোই ভান্তি মাহো বাস ॥ ধ্রু ॥

---

১. সুনীতিকুমার শেষ পদটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন: I shall call to witness my Guru Jālandhari-pāda; my Paṇḍitācārya (i.e. myself who am a great scholar) does not look at me (i.e. my knowledge I owe to the grace of my guru and not to my studies and my being a Paṇḍitācārya.)

O. D. B. L. p. 122

বাণ্ডকুরু৮ সন্তারে জাণী।
বাকপথাতীত কাহি৯ বখাণী ॥ ধ্রু ॥
ভণই তাড়ক এথু১০ নাহিঁ অবকাশ।
জো বুঝই তা গলেঁ গলপাস ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৫৩ ক-খ]

পা. ১. শা. সো। ২. শা. শঙ্কা। ৩. শা. সু. মুদেরী। ৪. শা. সু. টুটি। ৫. শা. চৌকোট্টি; সু. চৌকোড্ডি। ৬. নী. অছ। ৭. সু. পথক শুদ্ধপাঠ বলিয়া অনুমান করেন। ৮. টীকায় প্রথমে বণ্ট; পরে ব্যাখ্যাতে বণ্ড কুরুণ্ডাদি; লিপিতে শেষ ও ছাড় পড়িয়াছে। ৯. শা. সু. কাঁহি। ১০. শা. সু. এথু।

অ ন্ব য : আপনিই নাই, আমার কাহার শঙ্কা? তাই মহামুদ্রার আকাঙ্ক্ষা টুটিয়া গেল। সহজ অনুভব, হে যোগী, ভুলিও না। চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত যেমন তেমনি হয়। যেমন ছিলে তেমনি আছ। সহজকে পৃথক মনে করিয়া, যোগী, ভুল করিও না। বাণ্ডকুরুণ্ড (পুরুষাঙ্গ-অণ্ডকোষ) নদীপারাপারে জানা যায়। বাক্‌পথাতীত [বস্তু] কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? তাড়ক বলে এখানে [সন্দেহের] অবকাশ নাই। যে বোঝে তাহার গলায় ফাঁস।

টী কা টি প্প নী : অপণে<*আত্মনেন= (আত্মনা); নিজেই। মো< মম। কাহেরি=কাহার, কাহ<কস্য+এর (ষষ্ঠী)+ই (স্ত্রী); শঙ্কার বিশেষণ, তাই লিঙ্গ সৌষম্যে স্ত্রীলিঙ্গ। তা<তৎ। মহামুদেরী=মহামুদ< মহামুদ্রা+এর (ষষ্ঠী)+ই (স্ত্রী); যোগাচারের চারিটি মুদ্রা—কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা বোধিচিত্তলাভের চারিটি স্তরের সহিত সম্পৃক্ত; মহামুদ্রার ব্যঞ্জিত অর্থ এখানে—বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সিদ্ধি-লাভের আকাঙ্ক্ষা; টীকাতেও বলা হইয়াছে 'মহামুদ্রাসিদ্ধিবাঞ্ছা'; ঘেরণ্ড-সংহিতায় তান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে মহামুদ্রার এইরূপ বর্ণনা দেওয়া আছে:

পায়ুমূলং বামগুল্‌ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্নতঃ
যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করৈর্ধৃতপদাঙ্গুলঃ।
কণ্ঠ সংকোচনং কৃত্বা ভ্রুবোর্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ
মহামুদ্রাভিধা মুদ্রা কথ্যতে চৈব সূরিভিঃ ॥

(Buddhist Mystic Songs-এ পৃ. ৫০-এ উদ্ধৃত)

কংখা<আকাঙ্ক্ষা, আদিস্বরলোপ। জোই<যোগী। চৌকড্‌হিবিমুকা= চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত; শূন্যবাদীরা জাগতিক সত্তার অস্তিত্বহীনতা—'ধর্মনৈরাত্ম্য' প্রমাণ প্রসঙ্গে নেতিবাচক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা সত্যও নহে, অসত্যও নহে; ইহা সত্যাসত্য এই উভয়ও নহে, আবার সত্যও নহে অসত্যও নহে এই অনুভয়ও নহে; এইভাবে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত করিয়া নাগার্জুন সত্তার শূন্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। (দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়।) জইসো<যাদৃশ।

তইসো<তাদৃশ। হোই<ভবতি। জইসনে<* যাদৃশনেন। অছিলেস √অছ্ (অচ্ছ)+ইল (অতীত)+এস (=এসি, মধ্যম পুরুষের অতীতকালের বিভক্তি।) তইছন<তাদৃশন। অচ্ছ=আছ; √অচ্ছ্+অ (অনুজ্ঞা); ৩৫ সং চর্যা দ্র.। পিথক<পৃথক। মাহো<মা (নিষেধার্থক অব্যয়)+হো (নিশ্চয়াত্মক)। ভান্তিমাহো বাস=ভুলিও না; বাস্ ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় প্রচুর; আধুনিক বাংলায় ভালবাসা এবং কদাচিৎ মন্দবাসা ইত্যাদি প্রয়োগে ইহা সীমাবদ্ধ। বাগুকুরু(গু)—পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ। সন্তারে=পারাপারকার্যে; সম্-√তৃ+ঘঙ্<সন্তার+এ (৭মী)। জাণী < *জানিতঃ=জ্ঞাতঃ। বাকপথাতীত=অনির্বচনীয়। কাঁহি=কী করিয়া; <কেন+হি অথবা কথং)>কথ>কহ>কাহ+ই। বখানী<* ব্যাখ্যানিত=(ব্যাখ্যাত)। এথু=অত্র>অত্থ>এত্থ>এথু> এথু। তাড়ক=পদকর্তার নাম; তাড়ক শব্দের অর্থ ফাঁসুড়ে; শেষ চরণের বক্তব্যের সঙ্গে এই অর্থের সংযোগও লক্ষণীয়। জো=যে; <যঃ। বুঝই< বুধ্যতি। তা=তার; তস্য>তস্স>তাস>তাহ>তা।

ব্যা খ্যা সং কে ত: জগৎসংসারের শূন্যস্বরূপতা এবং সহজের অনির্বচনীয়তা উপলব্ধিই চর্যাটির মূল বক্তব্য।

জগৎসংসারের সমস্ত কিছুই অনিত্য, এমন কি পদকর্তা নিজেও শূন্যস্বভাব, এই পরম তত্ত্ব লাভ করায় ক্লেশ-মৃত্যু-মার ইত্যাদির ভয় হইতে তিনি মুক্ত হইযাছেন। তাই তাঁহার মহামুদ্রারূপ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষাও বিনষ্ট হইয়াছে। সহজই একমাত্র সত্য, এই সত্য অনুভবগম্য। ইহাকে ভুলিলে চলিবে না। জাগতিক বস্তুনিচয়ের শূন্যতার স্বরূপ বুঝিতে হইলে 'চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত' করিযা বুঝিতে হয়। এই উপলব্ধিই সহজের উপলব্ধি। পদকর্তার নিজের অস্তিত্বও এইরূপ। তাই সহজকে পৃথক বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। সহজ আত্মস্বরূপের সঙ্গে একাকার হইলেও ইহার তত্ত্ব রীতিমত গুহ্য। কিন্তু লৌকিক অন্যান্য গুহ্যতার সহিত ইহার পার্থক্য বিদ্যমান। অন্যান্য গুহ্য পদার্থ বা তত্ত্ব একভাবে নাহয় আর-একভাবে বোধগম্য হয়। যেমন পুরুষাঙ্গাদি সাধারণভাবে গুহ্য হইলেও নদী পারাপারের সময় তাহাদের অস্তিত্ব জানা যায়। কিন্তু এই সহজতত্ত্ব অনির্বচনীয়, বাকপথাতীত। পদকর্তা তাই বলিতেছেন পরমতত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জগৎ-সংসারের শূন্যতাস্বরূপের উপলব্ধি ছাড়া এই সহজ উপলব্ধির আর কোন অবকাশ নাই। যাহারা বুদ্ধিদ্বারা এই সহজজ্ঞান লাভ করিয়াছি মনে করে, তাহাদের গলায় ফাঁসি পড়ে অর্থাৎ সংসারজালে তাহারা আবদ্ধ হয়।

৩৮

রাগ ভৈরবী ॥ সরহপাদানাং ॥

কাঅ ণাবড়ি হি১ খান্টি২ মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরু বঅণে ধর পতবাল৩ ॥ ধ্রু ॥
চীঅ থির করি ধ[র]হু৪ রে নাহী।
অন উপায়েঁ৫ পার ণ জাই ॥ ধ্রু ॥
নৌবাহী৬ নৌকা টাগুঅ৭ গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ৮ ॥ ধ্রু ॥
৯বাটঅ ভঅ৯ খাণ্টা১০ বি বলআ।
ভব উলোলেঁ ষঅ১১ বি বোলিআ ॥ ধ্রু ॥
কুল লই খরে সোন্তে উজাঅ।
সরহ ভণই গ[অ]ণেঁ১২ পমাএঁ ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৫৪খ-৫৫ক]

পা. ১. শা. ণাবড়ি। ২. সু. খান্তি। ১. ২. টীকা 'কাঅ নাবড়ী খণ্ডীত্যাদি'। ৩. নী. পতবাণ। ৪. পুথি ধহু; মাঝখানের র বাদ পড়িয়াছে। ৫. শা. সু. উপায়ে। ৬. টীকা নোবাঅ। ৭. শুদ্ধপাঠ টাণঅ? লিপিকর সম্ভবত টা-এর পরই পরের পদ গুণে-র গু লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ভুল সম্পর্কে সচেতন হইয়াও সংশোধন করেন নাই; টীকায় 'আকর্ষয়তি'। ৮. নী. আনেঁ। ৯ টীকানুসারে চরণটির শুরু 'বাটত' এই পদ দিয়া; শা. বাটত ভঅ; সু. বাট-অভঅ। ১০. শা. নী. খাণ্ট; সু. খাণ্ঠা। ১১. সু. [বি]ষঅ। ১২. টীকানুসারে গঅণেঁ; লিপিতে অ বাদ গিয়াছে।

অন্বয়: কায়া[রূপ] ছোট নৌকাখানি; মনকে দাঁড়রূপে এবং সদ্‌গুরু বচনকে পাল বা হাল রূপে ধর। চিত্ত স্থির করিয়া নাও ধর; অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নাবিক নৌকা টানে গুণদ্বারা; এইভাবে সহজের সঙ্গে মিলিয়া যাও, অন্যভাবে নহে। পথে ভয়, দস্যুও বলবান। ভব-উল্লোলে (তরঙ্গোচ্ছ্বাসে) সকলই নিমজ্জিত হয়। কূল ধরিয়া খরস্রোতে উজানে যায়। সরহ বলেন, গগনে প্রবেশ করে।

টীকা টিপ্পনী: ণাবড়ি=ছোট নৌকা; <নাবটিকা। খান্টি=শাস্ত্রীর অর্থ—খাঁটি অর্থাৎ শুদ্ধ; তিব্বতী অনুবাদে খণ্ড অর্থাৎ ক্ষুদ্রার্থে শব্দটি প্রযুক্ত; টীকায় 'খন্টি' আছে (খান্টি নহে), কিন্তু ব্যাখ্যাসূচক কোন কথা নাই; খান্টি <খণ্ডিকা; আধুনিক বাংলা, খানি। কেডুআল=৮ সং চর্যা দ্র.। বঅণে <বচনে। পতবাল=হাল বা পাল; অথবা পাটনী; তিব্বতী অনুবাদে কেডুআল ও পতবাল সমার্থক বলিয়া গৃহীত এবং উভয়তই অর্থ—

দাঁড় ; সং পত্রপাল=হাল ; বাংলা পাল শব্দটি পত্রপাল হইতে উদ্ভূত হইতে পারে ; শব্দটিকে পাটনী অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে ; পত্র=যান, এখানে নৌকা ; পত্রপাল=পাটনী (দ্র. শান্তি ভিক্ষু, চর্যাগীতিকোষ, পৃ. ১২৪)। চীঅ <চিত্ত। ধরহু=ধর ; <√ধর (=ধৃ) + হু (অনুজ্ঞা)। নাহী <না:ভি (ক) ; =নৌকার হাল। অন <অন্য (অর্ধতৎসম)। জাই <যাতি। নৌবাহী=নাবিক (তৎসম)। টাগুঅ <তঙ্গতি, টলমল করে ; কিন্তু চরণের অন্ত পদের সঙ্গে এই অর্থের অন্বয় হয় না ; টাগুঅ লিপিপ্রমাদ ; শুদ্ধ পাঠ—টাণঅ=টানে ; প্রসারণ অর্থে √তন্ >টান+ই (<তি)=টাণই >টাণঅ। মেলি=পরিত্যাগ করিয়া (দ্র. ৮ সং চর্যা)। মেল=মিলিত হও। জাউ=যাও ; √যা+উ (অনুজ্ঞা)। আনে <অন্যেন। বাটঅ=বাটত= পথে ; বাট <বর্ত্ম+ত (৭মী ; দ্র. ৩ সং চর্যা)। ভঅ <ভয়। খাণ্ট=দস্যু, ডাকাত ; <খণ্ডক (অঘোষীভবন)। বি <অপি। বলআ=বলবান। উলোলেঁ <উল্লোলেন। বোলিআ=নিমজ্জিত ; √বুড্ড>বুড় >বুল >বোল+ইত+আ ; ১৪ সং চর্যার বুড়িলী টীকা দ্র.। লই=লইয়া ; <লভিত্বা। সোন্তে= <স্রোতে ; অথবা স্রবন্ত >সোন্ত+এ। উজাঅ= উজানে যায় ; <উদযাতি। পমাএঁ <প্রমাপয়তি/প্রমাতি ; প্রবেশ করে।

ব্যা খ্যা সং কে ত : আলোচ্য চর্যায় নৌকা বাহিবার রূপকে সহজ সাধনার কথা বলা হইয়াছে। কায়া হইল নৌকা, মন দাঁড়, সদ্‌গুরু বচন হইল হাল। নৌকা বাহিয়া সিদ্ধির পারে যাইবার জন্য চিত্তস্থৈর্য অপরিহার্য। নৌবাহিক যেমন নৌকাকে গুণদ্বারা আকর্ষণ করে সেইভাবে আকর্ষণ করিয়া, অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া, সহজের সহিত মিলিত কর। অন্য পথে গেলে সিদ্ধি সুদূর-পরাহত। পথে ভয় আছে, দস্যুও বলবান। তরঙ্গভঙ্গে নৌকা বিধ্বস্ত নিমজ্জিত হইবারও সম্ভাবনা। সাধনার পথের প্রতিবন্ধকগুলি ভয়, দস্যু ইত্যাদি রূপে কল্পিত। দস্যু অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞান, তরঙ্গ-ভঙ্গ—ভবজ্ঞান। সুতরাং খরস্রোতে যেমন কূল ধরিয়া নৌকা বাহিতে হয় সেইরূপ কূল অর্থাৎ অবধূতিমার্গ বাহিয়া খরস্রোতে উজাইয়া চল এবং গগনে অর্থাৎ সহজ-সিদ্ধিতে প্রবেশ কর।

তান্ত্রিক পদ্ধতি কায়সাধনার পদ্ধতি। আলোচ্য চর্যার রূপকল্পের নৌবাহনের আনুষঙ্গিক প্রতিটি বিষয়ই গূঢ়ার্থে তান্ত্রিক পদ্ধতির আনুষঙ্গিক কোন কিছুর সহিত সম্পৃক্ত। কায়া=নৌকা ; মন=দাঁড় ; সদ্‌গুরুবচন=হাল বা পাল ; সহজস্বরূপ=গুণ ; দস্যুভয়=দ্বৈতজ্ঞান ; তরঙ্গ-ভঙ্গ=ভবজ্ঞান ; কূল=অবধূতি-মার্গ ; উজান যাওয়া=সহজ-সাধনা উলটা-সাধনা অথবা উজান-সাধনা নামেও পরিচিত। মণিমূলের কুণ্ডলিনী শক্তি স্বাভাবিকভাবে নিম্নগা। তাহাকে ঊর্ধ্বগা করাই সাধনা। সহজ-সাধনা তাই উজাইয়া চলা।

৩৯

রাগ মালশী ॥ সরহপাদানাং ॥

[১]সুইণা হথ বিদারম রে[১] । ণিঅমণ[২] তোহোরেঁ[৩] দোসেঁ[৪] ॥
গুরুবঅণ বিহারেঁ[৫] রে । থাকিব তই ঘুণ্ড কইসেঁ[৬] ॥ ধ্রু ॥
অকট[৭] হুঁ [৮]ভব ইঅণা[৮] ।
বঙ্গে জায়া ণিলেসি[৯] পরে ভাগেল তোহোর বিণাণা[১০] ॥ ধ্রু ॥
অদঅভুঅ[১১] ভবমোহা রে । দিসই পর অপ্যণা ।
এ জগ জলবিম্বকারে[১২] সহজেঁ সুণ অপণা ॥ ধ্রু ॥
অমিআ[১৩] আচ্ছন্তেঁ[১৪] বিস গিলেসি[১৫] রে । চিঅ [১৬]পসর বস[১৬] অপা ।
ঘারেঁ পারেঁ কা [১৭]বুঝ্‌ঝিলে ম রে[১৭] খাইব মই দুঠ[১৮] কুণ্ডবাঁ[১৯] ॥ ধ্রু ॥
সরহ ভণন্তি বর সুণ[২০] গোহালী কি মো দুঠ্য বলং দেং[২১] ।
একেলেঁ[২২] জগ নাসিঅ[২৩] রে [২৪]বি বহুঁ[২৪] ঈচ্ছন্দেঁ[২৫] ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৫৫খ-৫৬ক]

পা. ১-১. শা. সু. সুইণা হ অবিদারঅ রে; টীকা সুইণে; চরণটির শুদ্ধপাঠ নির্ণয় দুরূহ; পুথিতে অস্পষ্টতা নাই, কিন্তু টীকার সহিত মিল নাই; ভাষাতাত্ত্বিক সংশয়ও বিদ্যমান; টীকাটিপ্পনী দ্র.। ২. শা. নিঅমন। ৩. সু. তোহোরে। ৪. শা. দোসে। ৫. শা. বিহারে। ৬. শা. সু. কইসে। ৭. পুথিতে অকথ লিখিয়া থ কাটিয়া উপরে ট লেখা। ৮-৮. শা. ভবই অণা; সু. ভব ইঅণা পাঠ করিয়া টীকানুসারে শুদ্ধপাঠ ভবগঅণা লিখিয়াছেন। ৯. শা. সু. নিলেসি। ১০. সু. বিণানা। ১১. শুদ্ধপাঠ অদভুঅ। ১২. সু. জলম্ববিকারে। ১৩. শা. অমিয়া; পাঠ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন, তাহা বোঝা যায় তাঁহার মন্তব্যে—গানে অমিয়া টীকায় 'অমিঅমিত্যাদি'। ১৪. সু. আচ্ছন্তেঁ। ১৫. গি-এর ই-কারের বাঁদিকের দাঁড়িটি নাই। ১৬-১৬. শুদ্ধপাঠ পরবস? তিব্বতী অনুবাদেও ইহা সমর্থিত। ১৭-১৭. শা. বুঝ্‌ঝিলে মরে। ১৮. নী. দুধ। ১৯. সু. নী. কুণ্ডবাঁ। ২০. শা. সুণ। ২১. শা. বলন্দেঁ; সু. বলং দেঁ। ২২. শা. একেলে। ২৩. শা. নাশিঅ। ২৪-২৪. সু. বিরহুঁ; শুদ্ধপাঠ বিহরহুঁ। ২৫ শুদ্ধপাঠ স্বচ্ছন্দেঁ?

দ্র. গীতিটির লিপিতে নানা অসতর্কতার চিহ্ন বিদ্যমান। শুদ্ধপাঠ নির্ণয় দুরূহ। লিপিকৃত রূপ, মনে হয়, গানের মূল রূপ হইতে অনেকখানি অপসৃত। বিশেষ লক্ষণীয় ১ম, ২য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণগুলির মধ্যে দাঁড়ি বা বিরামচিহ্ন।

অন্বয়: শূন্যতা [রূপ] হস্তদ্বারা, ওরে নিজ মন, বিদারণ কর তোর দোষসমূহ। গুরু-বচন-বিহারে থাকিবি, কোথায় ঘুরিস তুই? অদ্ভুত হুঙ্কারোদ্ভব চিত্তগগন; বঙ্গকে (অদ্বৈতজ্ঞানকে) জায়ারূপে লইলি, পরক্ষণেই

তোর বিজ্ঞান (অবিদ্যাদোষজনিত বিষয় বিজ্ঞান) নষ্টীভূত হইল। অদ্ভুত এই ভবমোহ, তাই পরকে আপন দেখায়। জলবিম্বাকার (মায়া) এই জগৎ, এখানে সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্যই কেবল আপন। অমিয় থাকিতে বিষগ্রহণ করিতেছিস, রে পরবশ(?)চিত্ত। যবে (নিজের দেহে) পরম তত্ত্বকে বুঝিলে [অথবা,পরকে (রাগদ্বেষাদিকে) বুঝিলে] আমি দুষ্ট কুণ্ডকে (রাগ-দ্বেষ-মোহাদির উৎসকে) খাইব (ধ্বংস করিব)। সরহ বলিতেছেন, শূন্য গোহাল বরং ভালো, দুষ্ট বলদে কী হইবে? একেলাই জগৎ নাশ করিয়া (জগতের মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া) স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। অথবা একাই (দুষ্ট বলদ) ত্রিলোক নাশ করে, তাহাকে প্রভাস্বর শূন্যে পরিণত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করি।

টী কা টি প্প নী সুইণা = শূন্য, চর্যায় শূন্য > সুন, সুণ রূপই বেশি দেখা যায়, ৬ষ্ঠ চরণেও সুণ, ধ্বনিপরিবর্তনের রীতি অনুযায়ী শূন্য > সইনা খুব স্বাভাবিক নহে, টীকাতে অবশ্য সুইণা = স্বপ্ন, কিন্তু পুথির পাঠ ও টীকার ব্যাখ্যায় বিশেষ সঙ্গতি নাই, বরং তিব্বতী অনুবাদের সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। হথ < হস্ত। বিদারম (বিদারঅ ?) = বিদারণকর। তোহোরেঁ– তোর, তোহ + র (ষষ্ঠী) + এঁ (< এন), তোহ < তুভ্যম্ অথবা < তবস্য অথবা তব > তো + হ, নিশ্চয়ার্থক, তোহোরেঁ এই পদে শেষ এঁ তৃতীয়ার, খুব সম্ভব 'দোষে' এই তৃতীয়ান্ত পদটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তোহোরেঁ তৃতীয়ান্ত হইয়াছে, এই রীতি বিরল। গুরু বঅণ < গুরু বচন। থাকিব √স্থা + ইব (< তব্য, কৃদন্ত, ভবিষ্যৎ), থাক্ ধাতুর উৎপত্তি √স্থা অথবা √স্তভ্ + ক্ত > MIA √থক্ক হইতে। তই < ত্বয়া। ঘুণ্ড – পর্যটক, ঘূর্ণ > ঘুন্ন > ঘুণ্ড। কইসেঁ < কীদৃশেন, কী প্রকারে। অকট = আশ্চর্য। হুঁ-ভব = হুঙ্কারোদ্ভব, তান্ত্রিক বীজমন্ত্র হুঁ হইতে উদ্ভূত, এই অর্থে। ইঅণা = গঅণা = গগন, চিত্তগগন, প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্য। বঙ্গে = বঙ্গকে, অদ্বৈতজ্ঞানই বঙ্গরূপে কল্পিত। নিলেসি = নীত > নিঅ + ইল + এসি (অতীত কালের মধ্যম পুরুষের বিভক্তি)। পবে = পরক্ষণে। ভাগেল = ভগ্ন > ভগ্‌গ > ভাগ + এল (= ইল), ভাগিল, দূর হইল। বিণাণা < বিজ্ঞান, অবিদ্যা দোষজনিত বিষয়-বিজ্ঞান, বিষয়-মোহ। বঙ্গে·· বিণাণা— = অদ্বৈতজ্ঞান আশ্রয় করিলে বিষয়-মোহ আর থাকে না, বঙ্গ বা বঙ্গালিনীকে জায়া রূপে গ্রহণ করা এই উক্তির মধ্যে লৌকিক বা বাহ্য অর্থে সম্ভবত তৎকালীন কোন সামাজিক রীতির ইঙ্গিত আছে, মনে হয়, তৎকালীন সমাজেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় দ্বন্দ্ব একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। অদভুঅ < অদ্ভুত। ভবমোহ = বিষয়জ্ঞান, ভব সংসার সম্পর্কে আসক্তি। দিসই < দৃশ্যতে। অপ্যণা = অপ্‌পণা < *আত্মানকঃ। জলবিম্বাকার—মিথ্যা, মায়া। অদভুঅ···আপণা = অদ্ভুত এই ভবমোহ; ইহার ফলেই আপন-পর ভেদ অনুভূত হয়, জলবিম্ব যেমন মিথ্যা, এই জগৎও সেইরূপ; এখানে সহজে প্রতিষ্ঠিত শূন্যই কেবল আপন।

অমিআ<অমৃত। অচ্ছন্তেঁ = √অচ্ছ্‌+অন্ত্‌+এঁ (<এন); থাকিতে, অসমা.। গিলেসি = √গিল (<গৃ)+এসি (=সি,মধ্যম পুরুষ বর্তমান কালের বিভক্তি)। পসরবস = পরবস<পরবশ; চিত্ত যতক্ষণ অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকে ততক্ষণ পরবশ; এই চিত্তই যখন সহজজ্ঞান লাভ করে তখন মহাসুখরূপ অমৃত আস্বাদন করে। অপা<আত্মা। ঘারেঁ = ঘরে—স্বগৃহে, নিজের দেহে। পারেঁ - পরে, পরকে। আলোচ্য চরণটির শুদ্ধপাঠ সম্ভবত ঘরেঁ পরেক বুঝ্‌ঝিলে ম ইত্যাদি হইবে। অর্থ, নিজের দেহের মধ্যে, স্বকায়ে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিলে। সহজসাধনায় দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড এই তত্ত্বের (ভাণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (ধর্মমত অধ্যায় দ্র.)। দুঠ<দুষ্ট। কুণ্ডবাঁ = এই শব্দটির অর্থ স্পষ্ট নহে; টীকার উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্রী 'সমূহ' অর্থে শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন; ড. বাগচী ও ড. সেন কুটুম্ব অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কুটুম্ব অর্থে গ্রহণ করিলে ইহার ব্যুৎপত্তি কুটুম্বকম্‌ শব্দ হইতে হওয়া সম্ভব; সংস্কৃত 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ গর্ত (যজ্ঞকুণ্ড) বা গোলাকার পাত্র (তাম্রকুণ্ড)—অর্থাৎ আশ্রয়। সেই অর্থে দুঠ কুণ্ডের ব্যাখ্যা হইবে দুষ্ট অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহাদির আশ্রয় বা উৎস; সে অর্থও এখানে প্রাসঙ্গিক; তাহা হইলে 'বা' সমূহার্থক অথবা স্বার্থে ক-জাত। ঘারেঁ··· ·কুণ্ডবাঁ = স্বকায়ে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমি রাগ-দ্বেষ-মোহাদির উৎসকে খাইয়া ফেলিব, ধ্বংস করিব। বর = <বরং। গোহালী = <গোশালিকা; গো = ইন্দ্রিয়সমূহ; ইন্দ্রিয়সমূহের আশ্রয় বলিয়া দেহ গোহাল; সুতরাং গোহালী = নিজদেহ, স্বকায়। সুন গোহালী = ইন্দ্রিয়প্রভাব-শূন্য দেহ। মো<মম। দুঠা<দুষ্ট। বলন্দে বলদে, বলীবর্দ>বলর্দ>বলদ্দ>বলদ; বলন্দ স্বতোনাসিক্যীভবনের ফল; বলন্দ+এঁ<এন; ৩৩ সং চর্যায় বলদ রূপে প্রয়োগ আছে; দুষ্ট বিষয়ে যাহা বলদান করে তাহা দুষ্ট বলদ অর্থাৎ সংবৃতি বোধিচিত্ত। নাশিঅ<নাশিত অথবা নাশয়িত্বা। একেলে জগ নাশিঅ = সেই একের দ্বারা (দুষ্ট বলদ দ্বারা) ত্রিজগৎ নষ্ট অথবা একাই জগৎ নাশ করিয়া (জগৎসংসারের মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া)। বিরহুঁ = বিহরহুঁ = বিহার করি।

ব্যাখ্যা সংকেত: জগৎসংসারের মিথ্যাস্বরূপ এবং সহজজ্ঞান উপলব্ধিই এই চর্যাটির আলোচ্য।

শূন্যতাজ্ঞানের দ্বারাই প্রকৃতি-দোষসমূহকে বিনষ্ট করিয়া মনকে মুক্ত করা যায়। মোহ হইতে মুক্তিলাভের উপায় গুরুর উপদেশ। তাহাতেই বিহার করা উচিত। তাহা না করিয়া অবিদ্যাচ্ছন্ন মন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তান্ত্রিক বীজমন্ত্র হুঙ্কারোদ্ভব চিত্তগগন। পদকর্তা গুরুবচন-প্রসাদে সেই প্রভাস্বর-শূন্য চিত্তরাজকে লাভ করিয়াছেন। তাই তিনি অদ্বয়জ্ঞানকে (বঙ্গালিনীকে) জায়ারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, স্বাত্মীকরণ করিয়াছেন। ফলে তাঁহার বিষয়-

বিজ্ঞান, ভবমোহ দূর হইয়াছে। এই ভবমোহই আত্মপর ভেদ সৃষ্টি করে। এই সমস্ত ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া, জগৎকে জলবিম্বের মতো মিথ্যা বা মায়ারূপে জানিয়া সহজ শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পরবশ অর্থাৎ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত মহাসুখরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিষ পান করে। নিজদেহে পরমতত্ত্ব অনুধাবন করিলে রাগদ্বেষমোহাদির আশ্রয় নষ্ট করা যায়। ইন্দ্রিয়প্রভাব-শূন্য দেহ বরং ভালো, সংবৃতি বোধিচিত্ত দ্বারা কী লাভ হইবে ? সংবৃতি বোধিচিত্তই ত্রিজগৎ নষ্ট করে। সুতরাং তাহাকে প্রভাস্বরশূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করা উচিত। (অথবা একাই জগৎসংসারের মোহ নষ্ট করিয়া প্রভাস্বর-শূন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করা উচিত।)

৪০

রাগ মালসী গবুড়া ॥ কাহ্নুপাদানাং ॥

জো [১]মণ গোএর[১] আলা জালা[২] ।
আগম পোথী[৩] টণ্টামালা[৪] ॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা[৫] জাঅ[৬] ।
কাঅ বাক চিঅ জসু ণ সমাঅ[৭] ॥ ধ্রু ॥
আলে[৮] গুরু উএসই সীস ।
বাকপথাতীত কাহিব কীস ॥ ধ্রু ॥
জে তই[৯] বোলী[১০] তে তবি টাল ।
গুরু বোধ[১১] সে সীস[১২] কাল ॥ ধ্রু ॥
ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বি কসইসা[১৩] ।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ১৭খ]

পা. ১ শা. মণ গোএর। ২. শা. আলা জালা। ৩. শেষ ঈ-কারটি খুব স্পষ্ট নহে; পোথা পড়া যায়। ৪. শা. ইষ্টামালা; সু. টণ্টামালা; লিপিতে পদটির প্রথম ট স্পষ্ট; পরবর্তী যুক্তবর্ণটি সন্দেহাতীত নহে; টীকা হইতে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না; তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে ইণ্টামালা=ইষ্টক-মালা—pile of bricks; মনে হয় ইষ্টামালাই উদ্দিষ্ট। ৫ শা. বোল বা। ৬. শা. জায়। ৭. শা. সমায়। ৮. টীকা অলেঁ। ৯. টীকা তে জই। ১০. পুথিতে লী-এর আগে একটি বাড়তি এ-কার আছে; সু. বোলো। ১১. শুদ্ধপাঠ বোব ? টীকায় ব্যাখ্যা 'বচনদরিদ্র'। ১২. শা. সীসা। ১৩. শুদ্ধপাঠ কইসা; প্রথম স অকারণ।

অ ন্ব য়: যাহা মনগোচর (=মনস্পৃষ্ট) [তাহা] আলা জালা (=ইন্দ্রজাল-সদৃশ মিথ্যা)। আগম পুথি জপমালা [ইত্যাদিও তদ্রূপ]। অথবা আগমপুথি ইষ্টকমালা [স্বরূপ]। বল, কী করিয়া সহজকে বলা (ব্যাখ্যা করা) যায়, কায়-বাক-চিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না। অকারণেই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন [কারণ] বাকপথাতীতকে (=অনির্বচনীয়কে) কী প্রকারে কহিবেন। যতই বলা যায় ততই জটিল হয়। গুরু যেন বোবা হইয়া যান, শিষ্য কালা। কাহ্ন বলিতেছেন জিনরত্ন (=চতুর্থানন্দ) কিরূপ [যদি এই প্রশ্ন করা হয় তবে] কালার দ্বারা বোবাকে বোঝানোর মতো ব্যাপার হইবে।

টী কা টি প্প নী: জো<যঃ। মন গোঁএর=মনস্পৃষ্ট; <মনগোচর; চর্যায় অ/এ বিপর্যাস প্রচুর—সঅল/সএল, রঅনী/রএনী। আলা জালা=টীকায় অর্থ বিকল্পজাল; তিব্বতী অনুবাদে—ইন্দ্রজাল; অর্থাৎ মিথ্যামায়া; <অলকম্-জালক। পোথী—পুস্তিকা>পুত্থিআ>পুথি, পোথী; পোথা পাঠ হইলে<পুস্তক। ইষ্টামালা=ইষ্টমালা, জপমালা। কইসেঁ=কেমন করিয়া; * কদৃশেন>কইসেন >কইসেঁ। বোলবা=বলা; বোল (√ব্রূ)+অবা (<তব্য)। জাঅ <যাতি। জসু=যেখানে; যস্মিন অর্থে অপপ্রয়োগ; যস্য >জসু (অবহট্‌ঠ)। সমাঅ=প্রবেশ করে; <সমায়াতি। আলে=মিথ্যাই; <আলেন (আল=মিথ্যা)। উএসই=উপদেশ দেন; উপদিশতি >উঅইসই >উএসই। সীস <শিষ্য। কাহিব=কহিব; কথয়িতব্য >কহইঅব্ব >কহিব, কাহিব। কীস <কীদৃশ। জেতই=যতই; যৎ+তক (পরিমাণে) >যত্তক >জত্তক, জেত্তক >জত, জেত+ই। বোলী=উক্ত; বোল (ব্রূ)+ইঅ (<ক্ত)=বোলিঅ, >বোলী। তেতবি=ততই; তৎ+তক >তত্তক; দ্র. জেতই। বি < অপি। টাল=ভুলভ্রান্তি, জটিলতা; √টল্‌+ঘঙ্‌। বোব=বোবা; দেশী শব্দ। কাল=কালা, বধির; <কল্ল। জিণরঅণ=জিনরত্ন, অতীন্দ্রিয় সহজানন্দ; জিন=বুদ্ধ, অর্হৎ। কইসা=কেমন; <কীদৃশম্‌। সংবোহিঅ <সংবোধিত। জইসা <যাদৃশ। কালেঁ……জইসা=কালার দ্বারা বোবাকে বোঝানোর মতো: বস্তুত বোবাদ্বারা কালাকে বোঝানোই বেশি অর্থবহ এবং প্রসঙ্গের সহিত অধিক সঙ্গতিপূর্ণ; ৮ম পংক্তিতেও সেই ধরনের কথাই আছে; তিব্বতী অনুবাদেও সেইভাবে অর্থ করা হইয়াছে; তবে কি চরণটির শুদ্ধ-পাঠ—কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা ?

ব্যা খ্যা সং কে ত: সহজস্বরূপের অনির্বচনীয়তা, শাস্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ইহাকে উপলব্ধির ও ব্যাখ্যার চেষ্টার ব্যর্থতার কথা বলা হইয়াছে আলোচ্য চর্যায়।

অবিদ্যাচ্ছন্ন মনই জগতের সমস্ত কিছুকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করায়। মনই সমস্ত মিথ্যা মায়ার জন্মদাতা। শাস্ত্রাদিতে পরমসত্য সম্পর্কে যে-সমস্ত

ব্যাখ্যা আছে এবং আচার-অনুষ্ঠান বাহুল্যের মধ্য দিয়া সেই সত্যকে উপলব্ধির জন্য যেসমস্ত চেষ্টা করা হয় তাহা সবই ভুল, কারণ সে সমস্তই মনসৃষ্ট। সহজ-স্বরূপ অনির্বচনীয়। তাহা ব্যাখ্যাগম্য নহে। কায়বাক্‌চিত্ত সেখানে কিছুই প্রবেশ করে না। এই সহজস্বরূপকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য মিথ্যাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দান করেন। যাহা অনির্বচনীয় তাহা কি বলা যায়? যতই সেই চেষ্টা করা হয় ততই জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সহজস্বরূপের ব্যাখ্যার চেষ্টা মূককর্তৃক বধিরকে বোঝানোর মতো ব্যাপাব, নিষ্ফল প্রয়াস।

৪১

রাগ কহ্ন গুংজরী১ ॥ ভুসুকুপাদানাং ॥

আইএ ২অণুঅনা এ২ ৩জগ রে৩ ৪ভাংতিএঁ সো৪ পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি৫ জো চমকিই যারে৬ ৭কিং কং৭ বোড়ো খাই ॥ ধ্রু ॥
অকট ৮জোইআ রে৮ মা কর হথা লোনহা৯।
আইস সহাবেঁ১০ জই জগ বুঝষি১১ তুট বাষণা তোরা। ধ্রু ॥
১২মরু মরীচি গন্ধ[ব]নইরী দাপতিবিম্বু১২ জইসা।
বাতাবত্তেঁ সো দিঢ়১৩ ভইআ অপেঁ পাথর জইষ১৪ ॥ ধ্রু ॥
বাংঝিসুআ১৫ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেড়া।
বালুআতেলেঁ সসরসিংগে আকাশে১৬ ফুলিলা ॥ ধ্রু ॥
রাউতু ভণই কট ভুসুকু ভণই কট সঅলা অইস সহাব।
জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী ১৭পুচ্ছ তু১৭ সদ্‌গুরু পাব ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ১৮খ]

পা. ১ শা কহ্ন গুংজরী; সু কহ্ন গুংজরী। ২-২. অণুঅনাএ। ৩-৩. শা. জগরে। ৪-৪. শা. ভাংতি এসো। ৫. পুথিতে দেখিতে-র 'তে' কাটা। ৬. টীকানুসারে (সত্যেন) শুদ্ধপাঠ যাচেঁ/সাচেঁ? ৭-৭. পুথিতে কিং কং; শাস্ত্রীর সংশোধন কিংতং (কং); টীকানুসারে শুদ্ধপাঠ কিংতং অনুমিত। ৮-৮. শা. জোইআরে। ৯. শা. লোহ্না; সু. লোহ্না। ১০. শা. সভাবেঁ। ১১. সু. বুঝসি। ১২-১২. শা. মরুমরীচিগন্ধনইরীদাপতিবিম্বু; পুথির গন্ধনইরী টীকার গন্ধর্বনগর অনুসারে সংশোধিত; দাপতিবিম্বু-র শুদ্ধপাঠ দাপণপতিবিম্বু? ১৩. শা. দিঢ়। ১৪. শা. জইসা। ১৫. শা. বান্ধিসুআ; সু. বাংধিসুআ; নী. বাঁধিসুআ। ১৬. শা. আকাশ; পুথিতে আকাশে-র এ-কার উপরে লেখা, বাঁদিকে নয়। ১৭-১৭. শা. পুচ্ছতু।

অন্বয়: আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিতে প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্প দেখিয়া যে চমকিত হয় সত্যই কি কাহাকে (তাহাকে) বোড়াসাপ খায়। অকট

(মূর্খ) যোগী, হাত লবণাক্ত করিও না। জগৎকে এইভাবে যদি বুঝিতে পার তবে টুটে তোমার বাসনা। মরুমরীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণপ্রতিবিম্ব যেমন, বাতাবর্তে জলের দৃঢ় হইয়া পাথরের মতো হইয়া যাওয়া যেমন, বন্ধ্যাসুত যেমন খেলা করে, খেলে বহুবিধ খেলা, বালুকাতৈল, শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম [যেমন], রাউতু বলেন নিশ্চিতভাবে, ভুসুকু বলেন নিশ্চিতভাবে, সকলের (=জগৎসংসারের) স্বভাব (=স্বরূপ) তেমন (অর্থাৎ জগৎসংসার মিথ্যা, অস্তিত্বহীন)। যদি মূঢ় তুই [এখনও, এসব জানিবার পরও] ভ্রান্তিতে আছিস [তবে] সদ্‌গুরুচরণে জিজ্ঞাসা কর।

টী কা টি প্প নী : আইএ = আদিতে ; আদি > আই + এ (৭মী)। অণুঅনা <অনুৎপন্ন। ভাংতিএ = ভ্রান্তিতে ; ভ্রান্তি > ভাংতি + এঁ (করণ অধিকরণ)। সো < সঃ। পড়িহাই < প্রতিভাতি। রাজসাপ = রজ্জুসর্প ; রজ্জু > রজ্জ > রাজ। দেখি—*দৃক্ষিত্বা (=দৃষ্ট্বা) > দেক্‌খ্‌ইঅ > দেক্‌খ্‌ই > দেখি। চমকিই = চমৎকৃত > চমক্কিঅ > চমকিঅ, চমকিই। ষারে ? = ষাচে (= সাচেঁ) = সত্যই ; < সত্যেন। বোড়ো = বোড়াসাপ ; < বোড্র। খাই = খায় ; < খাদতি। অকট = মূর্খ, আকাট, অপভ্রংশ অক্কট ; সং অকৃন্ত (দ্র. EDB p1)। জোইআ = যোগীক, সম্বোধনে। মা = না। হথা = হাত ; হস্ত > হত্থ > হাথ > হথা (বিপর্যাস)। লোন্‌হা = লবণাক্ত ; লবণ > লোণ + আ > লোণা, মহাপ্রাণিত। আইস = এইরূপ ; < অবাদৃশ। সহাবেঁ < স্বভাবেন। বুঝষি < বুধ্যসি। তুট = তুটই < ত্রুট্যতে ; পুথিতে যদিও তুট আছে, ব্যাকরণ ও অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া তুটই পাঠই সঙ্গত ; তুট অনুজ্ঞার রূপ। বাষণা = বাসনা। তোরা = তোর। মরুমরীচি = মরুভূমির মরীচিকা ; এইটি এবং পরবর্তী কয়েকটি শব্দ জগৎসংসারের অস্তিত্বহীনতার উপমারূপে ব্যবহৃত। গন্ধবনইরী = গন্ধর্ব নগরী ; নগরী > নঅরী > নইরী। দাপতিবিম্বু = দাপণ পতিবিম্বু = দর্পণের প্রতিবিম্ব ; দর্পণ > দপ্পন > দাপন। বাতাবত্তেঁ = ঘূর্ণিবাতাসে ; < বাতাবর্তেন। ভই = < *ভবিত্বা (= ভূত্বা) > ভইআ > ভই। জইসা < যাদৃশ। বান্ধিসুআ = বন্ধ্যাসুত। জিম = যেমন ; < *যেমন্ত < *যিমন্ত। করই < করোতি। খেলই = খেলা করে ; < খেলতি। বালুআতেলেঁ < বালুকাতৈলেন। সসর সিংগে = শশকের শৃঙ্গে। আকাশে ফুলিলা = আকাশ-কুসুম ; ফুলিলা < *ফুলিত (= ফুল্ল) + ইল + আ। রাউতু = রাজপুত্র ; যোদ্ধা বা সেনাপতি। রাজপুত্র > রাঅউত্ত > রাউত > রাউতু ; ভুসুকু এবং রাউতু একই ব্যক্তি ; রাউতু সম্ভবত পদবী। কট = নিশ্চিতভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ; < কৃত (?)। সঅলা < সকল। তো < তব (৬ষ্ঠী) ; অচ্ছসি ক্রিয়াপদ অনুসারে তো কর্তৃকারক হওয়া উচিত ; সুতরাং অর্থ হইবে তুই ; না হইলে অচ্ছসি স্থানে অচ্ছই পাঠ গ্রহণ করিতে হয় এবং চরণটির অর্থ হয়, হে মূঢ, যদি তোমার ভ্রান্তি আছে তবে সদ্‌গুরুচরণে জিজ্ঞাসা কর ; তবে চর্যায় তু/তো

পার্থক্য সর্বদা বক্ষিত হয় নাই, দ্র. ৬ চর্যায় তো = তুই (কর্তা) এবং ১০ চর্যায় তো = তোকে (কর্ম)। পুচ্ছতু = ৫ সং চর্যা দ্র। পাব—পাদ>পাঅ>পাব (ব-শ্রুতি)।

ব্যা খ্যা স ং কে ত আলোচ্য চর্যায় শূন্যবাদীদেব মতের প্রকাশ লক্ষণীয়। শূন্যবাদীদেব মতে জগৎসংসারের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র। ভ্রান্তিবশতই তাহা কেবল সত্য বলিযা প্রতিভাত হয। জগৎসংসারের এই প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন কবিতে পারিলে বিষয়বাসনা, ভবমোহ দূর হইবে। জগৎ-সংসাবের এই অলীকত্ব কী ধরনের অতঃপর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বাবা তাহা বোঝানো হইযাছে—মবীচিকা, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, ঘূর্ণিবাত্যায় রচিত জলস্তম্ভ, বন্ধ্যাসুতেব খেলা, বালুকাতৈল, শশকেব শৃঙ্গ, আকাশকুসুম ইত্যাদি। পূর্বোক্ত এই বস্তুগুলি যেমন কার্যত অস্তিত্বহীন, ভবসংসাবও বস্তুত তাই। এত জানিযাও যদি এখনও ভ্রান্তিব নিবসন না হইযা থাকে তবে সদ্‌গুরুব চরণে আশ্রয় গ্রহণ কব। (গুরুব উপর এই নিভবশীলতা সহজিযাসুলভ।) আলোচ্য চর্যায় ব্যবহৃত জগতের অনস্তিত্বসূচক দৃষ্টান্তগুলি কিছু নূতন নহে। যোগবাশিষ্ঠ বামায়ণে ইহার প্রচুর ব্যবহাব দৃষ্ট হয। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি কৌতূহলোদ্দীপক :

কূর্মলোম-পটাচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গ-ধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্প কৃতশেখরঃ॥

৪২

বাগ কামোদ ॥ কাহ্নপাদানাং$_{১}$ ॥

চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
কান্ধবিয়োএ$_{২}$ মা হোহি বিসন্না॥ ধ্রু ॥
ভণ কইসে কাহ্ন$_{৩}$ নাহি।
ফরই অনুদিনং$_{৪}$ তৈলোএ পমাঈ$_{৫}$ ॥ ধ্রু ॥
মূঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।
ভাগতরঙ্গ কি সোষঈ$_{৬}$ সাঅর$_{৭}$ ॥ ধ্রু ॥
মূঢা অচ্ছন্তে লোঅ ণ$_{৮}$ পেখই$_{৯}$।
দুধ মাঝেঁ$_{১০}$লড় ণ চ্ছন্তেঁ$_{১০}$ দেখই ॥ ধ্রু ॥
ভব জাই ণ আবই এথু$_{১১}$ কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬০ক]

পা. ১. শা. কাহ্নুপাদানাং। ২ পুথিতে এই পদটির পর একটি দাঁড়ি চিহ্ন আছে, কিঞ্চিৎ বক্র, নী. এটিকে এ-কার ধরিয়া পরবর্তী মা-কে মো পড়িয়াছেন।

৩. শা. সু. কাহ্নু। ৪. সু. নী অনুদিনঁ। ৫. শা. সু. নী. পমাই। ৬. সু. সোসঈ. নী. সোষই। ৭. শুদ্ধপাঠ সাঅর; সাবঅব লিপি প্রমাদ; টীকা সাগরং। ৮ শা. সু. ন। ৯. পেথঅ লিখিয়া পেথই করা, শেষ ই-এর উপর বষামাত্রাব চিহ্ন আছে। ১০-১০. শা. লড ণচ্ছংতে, সু. নডণ চ্ছন্তেঁ (ন); নী. লড ণচ্ছন্তে। ১১. পুথিতে এসু-র পর একটি অস্পষ্ট র আছে।

অ ন্ব য়: চিত্ত সহজের দ্বারা শূন্য [হইয়া] সম্পূর্ণ। স্কন্ধবিযোগে বিষণ্ণ হইও না। বল, কী করিয়া কাহ্ন নাই। অনুদিন সে ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছে। মূঢ়রাই দৃষ্ট বস্তু নষ্ট দেখিয়া কাতর হয। তরঙ্গভঙ্গে কি সাগর শোষিত হয়? [সেই আনন্দস্বরূপ] আছেন, কিন্তু মূঢ় লোকেরা দেখিতে পায় না [যেমন] দুগ্ধ মধ্যে ননীর না থাকাই দেখায় (অর্থাৎ থাকে কিন্তু দেখা যায় না)। এখানে কোন অস্তিত্ব আসেও না যায়ও না, এইভাবে কাহ্নিল যোগী বিলাস করিতেছেন।

টী কা টি প্প নী: চিঅ<চিত্ত। সহজে<সহজেন, সহজেঁ প্রত্যাশিত রূপ। সংপুন্না<সম্পূর্ণ। কান্ধবিয়োএ<স্কন্ধবিয়োগেন, এখানেও বিযোএঁ প্রত্যাশিত ছিল; স্কন্ধবিয়োগের অর্থ মৃত্যু, কাবণ বৌদ্ধমতে সমস্ত শারীবিক ও মানসিক অবস্থা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচ স্কন্ধের সমবায়, এগুলি লুপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু। হোহি<*ভবহি, অনুজ্ঞা। বিসন্না<বিষণ্ণ। কইসে<কদৃশন+এন ;=কী প্রকারে। ফরই<ফুরই<স্ফুরতি। তৈলোএ<ত্রৈলোক্যে। পমাঈ<প্রমাপয়তি, <প্রমাতি। দিঠ<দৃষ্ট। নাঠ<নষ্ট। দেখি=দেখিয়া, *দৃক্ষিত্বা>দেক্‌খিঅ>দেখিআ, দেখি। ভাগ<ভগ্ন। সোষঈ<শুষ্যতি, শোষণ করে। অচ্ছন্তে=থাকিতে, √অচ্ছ+অন্ত্+এ; অসমা। পেথই<প্রেক্ষতে। মাঝেঁ<মধ্যেন। লড=দুগ্ধমধ্যস্থ স্নেহপদার্থ; নবনীত, ননী>লনী>লড়ী>লড় (?)। চ্ছন্তেঁ=অচ্ছন্তে। দেখই=দেখে, <*দৃক্ষতি। জাই—যাতি। আবই=আসে; আযাতি>আআই>আবই (ব-শ্রুতি)। এথু=এখানে; অত্র>এত্থ>এথু। কোই=কোঽপি। আইস<অবাদৃশ। কাহ্নিল=কৃষ্ণ+ইল (তুচ্ছার্থে?)।

ব্যা খ্যা স ং কে ত: আলোচ্য চর্যায় সহজবিলীন চিত্তের অবিনশ্বরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুসত্তার অসারত্ব প্রসঙ্গে বিজ্ঞানবাদীরা শূন্যবাদীদের সহিত একমত হইলেও বিজ্ঞানবাদীরা চিত্তকে অসৎ (অস্তিত্বহীন) বলেন নাই। তাঁহারা জগৎ-সংসারের শূন্যতা ব্যাখ্যা করিতে নেতিমূলক যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকেই শূন্যতা বলিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ক্রমে উপনিষদের ব্রহ্ম-ধারণার সহিত অনেকটা অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য পদটিতে বিজ্ঞানবাদীদের মত অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার আনন্দময় ব্রহ্মের মতো স্বরূপ বর্ণনা লক্ষ করা যায়। (দ্র. দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়।)

চর্যাকার বলিতেছেন, চিত্ত সহজে মগ্ন হওয়ায় প্রভাস্বরশূন্যতা প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং যদি স্কন্ধবিয়োগ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে তবুও বিষণ্ণ হইবার কিছু নাই, কারণ প্রভাস্বরশূন্যতায় পরিণত চিত্ত অবিনাশী। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে বাহ্য জগতে দেখা যাইবে না। তাই বলিয়া তিনি নাই একথা কিভাবে বলা যায়? তিনি অনুদিন ত্রৈলোক্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইবেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না বলিয়াই মূঢ় ব্যক্তিরা কাতর হয়। কিন্তু তাহারা জানে না যে তরঙ্গভঙ্গে যেমন সাগর বিনষ্ট হয় না, তেমনি দেহের মৃত্যুতে সব শেষ হইয়া যায় না। অবিনাশী সেই সহজবিলীন চিত্তকে হয়ত দেখা যায় না, কিন্তু সবকিছুই কি দেখা যায়? দেখা যায় না বলিয়াই কি তাহা নাই? দুধের মধ্যে ননী লুক্কায়িত থাকে, দেখা যায় না, তাই বলিয়াই কি তাহা নাই? তেমনি অবিনাশী সেই চিত্তকে দেখা না গেলেও তাহা আছে। বস্তুত ভবরূপ স্থূল অস্তিত্বের যাওয়া-আসা, জন্ম-মৃত্যু কিছুই নাই। তাহা মিথ্যা মায়া মাত্র। ভবসংসারের এই প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া যোগী কাহ্ন (পদকর্তা) আনন্দে আছেন।

৪৩

রাগ বঙ্গাল ।। ভুসুকুপাদানাং ।।

সহজ মহাতরু ফরিঅ[১] এ তেলোএ[২] ।
[৩]খসম সভাবে[৩] রে [৪]বাণত কা কোএ[৪] ।। ধ্রু ।।
জিম জলে পাণিআ টলিআ ভেউ[৫] ন জাঅ ।
তিম [৬]মরণ রঅণা রে[৬] সমরসে গঅণ সমাঅ ।। ধ্রু ।।
জাপু[৭] ণাহি অধ্যা[৮] [৯]তাসু পরেলা[৯] কাহি ।
[১০]আইঅনুঅনা রে[১০] জাম মরণ ভব ণাহি[১১] ।। ধ্রু ।।
ভুসুকু ভণই কট রাউতু ভণই কট সঅলা এহ সহাব ।
জাই ণ আবয়ি রে তংহি[১২] ভাবাভাব ।। ধ্রু ।।

[পুথির পৃষ্ঠা ৬১খ]

পা. ১. ফরিঅ-র পূর্বে একটি অসম্পূর্ণ ফ আছে; সু. তাই ফ্‌ফরিত্তা পাঠ ধরিয়াছেন; চিহ্নটি সম্ভবত নেওয়ারী যতিচিহ্ন, দাঁড়ি; দ্র. ৪৬থ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি; অবশ্য এখানে দাঁড়িও অপ্রয়োজনীয়; নী. (।) ফরিঅ। ২. নী. তৈলোএ; পুথিচিত্র অস্পষ্ট; তবুও 'তেলোএ'-ই আছে বলিয়া মনে হয়; তবে ৩০, ৪২ চর্যায় তৈলোএ। ৩-৩. শা. খসমসভাবে। ৪-৪. পুথি বাণতকাকোএ; সু. বাণতকা কোএ; নী. বাণত কাকোএ; শাস্ত্রীর পদবিভাগ বাণত কা কোএ শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; অবশ্য বাণত-এর ণ বর্ণটি সাধারণ ণ-এর

মতো নয়। ৫. শা. ভেড়, সু ভেড। ৬-৬. পুথি মরণঅঅণারে, টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন মরণ রঅণারে সুকুমার সেন কর্তৃক সমর্থিত। ৭. শা. জৎপু, সু. জাসু; টীকানুসারে তাহাই শুদ্ধপাঠ। ৮. প্রসঙ্গানুসারে অপ্যা/অপ্পা শুদ্ধ-পাঠ অনুমিত, 'অধ্যা'-র উপর খুব অস্পষ্ট প্প-এর মতো কিছু লেখা আছে, সু. অপ্পা। ৯-৯. শা. অধ্যাতা স্বপরেলা, লা উপরে লেখা। ১০-১০. শা. আই অনুঅণারে, সু. আই-অনুঅণারে। ১১. সু. নাহি। ১২. নী তঁহি, অর্থানু-সারে তঁহি প্রশস্ত।

অন্বয় সহজ-মহাতরু ত্রিলোকে ব্যাপ্ত। [সকলেরই] আকাশের মতো স্বভাব (অর্থাৎ শূন্যস্বভাব) [সুতরাং] কে কাহাকে বান্ধে (অর্থাৎ সকলেই মুক্ত)। জলে যেমন জল পড়িলে ভেদ করা যায় না, তেমনি মনরত্ন সমরস গগনে প্রবেশ করে (আর পৃথক করা যায় না)। যেখানে আত্ম বলিয়া কিছুই নাই [সেখানে] তবে স্ব-পর ভেদের কী প্রয়োজন। আদিতে অনুৎপন্ন [সুতরাং কোন কিছুরই] জন্ম-মৃত্যু-অস্তিত্ব নাই। ভুসুকু নিশ্চয় করিয়া বলেন, রাউতু নিশ্চয় করিয়া বলেন—সকলেরই এই স্বভাব। কেহই যায়ও না, আসেও না। কোন কিছুর অস্তিত্বও নাই, অনস্তিত্বও নাই।

টীকাটিপ্পনী. সহজ মহাতরু—সহজরূপ মহাতরু, সহজানন্দমগ্ন চিত্ত মহাতরুরূপে কল্পিত, রূপক অলংকার। ফরিঅ<ফুরিঅ<স্ফুরিত। তেলোএ =ত্রৈলোক্যে। খসম=গগনসম, প্রভাস্বরশূন্যতায় পরিণত চিত্ত চর্যায় গগনরূপে কল্পিত। সভাবে<স্বভাবে। বাণত বন্ধ (?), চর্যার পুথিতে উ এবং ত বর্ণ দুটির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে, এখানে ত যদি বস্তুত উ হয় তবে শুদ্ধপাঠ 'বাণউ কা কোএ'; ব্যুৎপত্তি—*বান্ধিত>বাণঅ>বাণউ, তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে পাঠ বাণত মুক কোত্র<বন্ধনাৎ মুক্ত কোঽপি। কা কোএ= কে কাহাকে; কা<কস্য, কোএ<কোঽপি। জিম<*জেমন্ত, *জিমন্ত। পাণিআ<পাণীয় (=জল)। টলিআ<টলিত্বা। ভেউ<ভেদ। জাঅ<যাতি। তিম<*তেমন্ত, *তিমন্ত। মরণঅঅণা=মণরঅণা=মনরত্ন। সমাঅ< সমায়াতি। জিম · সমাঅ—জলে জল পড়িলে যেমন তাহা অভেদে মিশিয়া যায়, তেমনি চিত্ত শূন্যে বিলীন (অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা, যাহা উপনিষদের ব্রহ্মধারণার সহিত প্রায় অভিন্ন, তাহার সহিত মিলিত) হইলে আর পৃথক করা যায় না। জাসু<যস্য (৩০ চর্যা দ্র.)। অধ্যা=অপ্যা=অপ্পা<আত্মা। স্ব পরেলা=আত্ম পর বিভেদ; পর+এলা (তু. একেলা)। আই<আদি। অনুঅনা<অনুৎপন্ন। জাম<জন্ম। ভব=অস্তিত্ব। ভুসুকু···কট—৪১ চর্যা দ্র.। সঅলা<সকল। সহাব<স্বভাব; দ্র. ২য় পংক্তিতে সভাব ব্যবহৃত হইয়াছে। আবয়ি<আয়াতি; এখানে ব এবং য়-শ্রুতি একত্রে প্রযুক্ত, ৬২ সং চর্যায় আবই। ভাবাভাব= অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব।।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : আলোচ্য চর্যায শূন্যতার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই গীতিটির মূল বক্তব্যের সহিত পূর্ববর্তী দুটি গীতিব বক্তব্যের যোগ স্পষ্ট।

সহজানন্দমগ্ন অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যতায় পরিণত গগনসম চিত্ত মহাতরুরূপে পবিকল্পিত। মহাতরু যেমন গগনে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া গগনের সহিত যেন একাত্ম হইয়া বিরাজ করে, প্রভাস্বব শূন্যতায পবিণত পারমার্থিক বোধিচিত্তও সেইরূপ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতার সহিত একাত্ম। তাহা মুক্ত। ভবসংসারের কোন বন্ধনই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। জলে জল পডিলে যেমন তাহাকে আর পৃথক করা যায় না, এই মুক্ত চিত্ত সেইরূপ পরম শূন্যতাব সহিত অপৃথক। মিথ্যাই মানুষ আত্মপব ভেদবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। যেখানে আত্ম বলিযাই কিছু নাই সেখানে এই ভেদেব আব কী প্রযোজন? সমস্ত কিছুই আদিতে অনুৎপন্ন, মিথ্যা মায়া মাত্র—সুতবাং তাগার আবাব জন্ম, মবণ, অস্তিত্ব ইত্যাদি চিন্তাব প্রয়োজন কী? পদকর্তা তাই নিশ্চয় কবিয়া বলিতেছেন—কিছুই যায়ও না আসেও না, অর্থাৎ জন্মমৃত্যু, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব কিছুই নাই। সকলই শূন্যস্বভাব।

দ্র. এই চর্যাটি ২৮ সং চর্যার মতো সমধ্রুবা জাতীয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্মেলক গেয়। তাই ৩য়-৪র্থ পংক্তির ব্যাখ্যাবন্তে পদস্য উত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যং লেখা। তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে অনুমিত—dhrubapada has been lost both in Sanskrit as well as Tibetan। অনুরূপ ব্যাপাব আছে ২৮ সং চর্যায়।সেখানেও ব্যাপারটি ভুল বোঝা হইয়াছে। অন্যান্য চর্যায় ৩য়-৪র্থ ধ্রুবপদ তাই ২য পদ বলিতে ৫ম-৬ষ্ঠ চরণ। কিন্তু এই দুটি চর্যায় পদগণনা রীতি ভিন্ন। এখানে স্বতন্ত্র কোন ধ্রুবপদ নাই। সব পদই ধ্রুবপদ। তাই ২য পদ বলিতে ৩য়-৪র্থ চরণ। আঙ্গিক প্রকবণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৪

রাগ মল্লারী ॥ কৌঙ্কণপাদানাং১ ॥

সুনে সুন মিলিআ২ জবেঁ
সঅল ধাম উইআ৩ তবেঁ ॥ ধ্রু ॥
আচ্ছহুঁ৪ চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ৫ অণুঅর বোহী ॥ ধ্রু ॥
বিতুনাদ৬ ণ হিঁএ৭ পইঠা।
অণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥ ধ্রু ॥
জথাঁ আইলেঁসি তথা জানী৮।
মাঝঁ৯ থাকী সঅল বি হণ১০ ॥ ধ্রু ॥
ভণই কঙ্কণ কলএল সাদেঁ।
সর্ব্ব বিচুরিল১১ তথতা১২ নাদেঁ ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬১খ-৬২ক]

পা. ১. নী. কোঙ্কণ ; ভণিতায় ও টীকারম্ভে কঙ্কণ। ২. শা.-নী. মিলিআ। ৩. শা. সু. উইআ। ৪. শা. আচ্ছ হুঁ ; সু. আচ্ছহুঁ, নী. আচ্ছহুঁ। ৫. শা. নিরোহ। ৬. = বিন্দু ; টীকাতে নাদ পূর্বে। ৭-৭. শা. ণহিঁ এ ; সু. ণ হিঁ এ। ৮. শা. জান। ৯. শা. মাসং ; সু. মাসঁ, কিন্তু শব্দকোষে মাসং, অর্থ মাঝে ; সংশয়ের অবকাশ থাকিলেও পুথিতে মাঝঁ পাঠই আছে মনে হয় ; স/ঝ লিপিগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। ১০. শা. সঅল বিহাণ ; সু. সঅল বিহণ। ১১. শা. বিচ্ছরিল। ১২. শা. তথতা।

অ ন্ব য় : শূন্যে যখন শূন্য মিলিত [হইল] তখন সকল ধর্ম উদিত [হইল]। চতুক্ষণ সংবোধিত [করিয়া] আছি। মধ্য-নিরোধ দ্বারা অনুত্তর বোধি [লাভ করিলাম]। বিন্দু নাদ হৃদয়ে প্রবিষ্ট [হয়] না। একটিকে দেখিয়া অন্যটি বিনষ্ট। যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ সে স্থানকে জান। মধ্যে থাকিয়া সকলকে হত্যা কর। কঙ্কণ বলেন, কলকল শব্দে সকল বিচূর্ণ হইল তথতা নাদে। (অথবা, কঙ্কণ কলকল শব্দে বলেন, সকল বিচূর্ণ হইল তথতা নাদে।

টী কা টি প্প নী : সুনে = শূন্যে, অর্থাৎ চতুর্থ শূন্যে। সুন = তৃতীয় শূন্য ; বোধিচিত্তের প্রকৃতি প্রভাস্বর রূপ প্রাপ্তির চারিটি স্তর শূন্যের চারিটি স্তর রূপে কল্পিত ; প্রথম তিনটি স্তর প্রকৃতিদোষযুক্ত হইলেও প্রথমাদিক্রমে অল্পে অল্পে দোষমুক্ত হইয়া চতুর্থ শূন্যে সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ হয় ; চিত্তের তৃতীয় শূন্য স্তরের চতুর্থ শূন্যে পরিণত হওয়া সুতরাং সহজানন্দ লাভ করা ; (দ্র. ধর্মমত অধ্যায় এবং ২৭ সং চর্যার 'বিরামানন্দ বিলক্ষণ সুধ' চরণের টীকা)। মিলিত্তা মিলিত। জবেঁ = যখন। সঅল < সকল। ধাম < ধর্ম, টীকায় সকল ধম বলিতে যুগনদ্ধফলোদয় অর্থাৎ সমরস বা সহজ মহাসুখের উপলব্ধি বোঝানো হইয়াছে। উইআ < উদিত। আচ্ছহুঁ = আচ্ছহুঁ = আছি ; √অচ্ছ্ + হুঁ (উত্তম, বর্তমান)। চউখণ < চতুঃক্ষণ ; চিত্ত যখন প্রথম শূন্য হইতে ঊর্ধ্বগ হইয়া চতুর্থ শূন্যের দিকে যায় তখন প্রতিটি স্তরের সহিত একটি 'ক্ষণ' বা মানসিক অবস্থা কল্পিত হয়—যথাক্রমে বিচিত্র, বিপাক, বিমর্দ ও বিলক্ষণ ; চতুর্থ শূন্যের উপলব্ধি তাই চারিটি ক্ষণ দ্বারা সংবোধিত হওয়া। সংবোহী < সংবোধিত। নিরোহেঁ < নিরোধেন। অনুঅর < অনুত্তর। মাঝ⋯ ⋯ বোহী—চরণটির ব্যাখ্যা টীকা হইতে স্পষ্ট নহে ; বুদ্ধদেব দুই চরম পন্থা অর্থাৎ চরম ভোগ ও পরম কৃচ্ছ্রসাধনের পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই বৌদ্ধদর্শনকে মধ্যমা প্রতিপদ বলা হয়, এই ধারণাই সহজিয়া বৌদ্ধদর্শনে শূন্যতা ও করুণার মিলিত মধ্যাবস্থা রূপে বিবর্তিত হইয়াছে ; শূন্যতা ও করুণার মিলিতাবস্থা এবং বোধিচিত্তলাভই বোধিসত্ত্বাবস্থায় উপনীত হইবার উপায় ; আলোচ্য চরণে তাই মধ্যপথে নিরুদ্ধ (অবরুদ্ধ, নিবিষ্ট) থাকিয়া অনুত্তরবোধি পরম সিদ্ধিলাভের কথা ব্যক্ত ; এই বক্তব্যের পুনরুক্তি ৮ম চরণে

'মাঝে থাকী সঅল বি হাণ' ; তান্ত্রিকতার প্রভাবে এই মধ্যপথ আবার বাম-দক্ষিণের দুই নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া মধ্যনাড়ী বা অবধূতিমার্গ অবলম্বনকে বোঝায় (৫ চর্যা দ্র.)। বিন্দুনাদ = দ্বৈতভাব। হিঁএ<হৃদয়ে। পইঠা<প্রবিষ্ট। বিন্দু · ·· পইঠা = বিন্দুনাদ অর্থাৎ দ্বৈতভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে না, চিত্ত দ্বৈতভাবমুক্ত। অণ, আণ<অন্য। চাহন্তে = চাহিতে ; √চাহ্ (চক্ষ)+ অন্ত্+এ অসমা.। বিণঠা<বিনষ্ট। অণ·· ·· বিণঠা = একটিকে দেখিয়া অন্যটি বিনষ্ট অর্থাৎ শূন্যতা দেখিয়া সংবৃতি বোধিচিত্ত বিনষ্ট। জথা<যত্র বা যতঃ। আইলেসি<আযাত+ইল্ল+এসি (অতীত, মধ্যম পুরুষ), আসিয়াছিলে। তথা<তত্র বা ততঃ। যথা·· ·জান যে স্থান হইতে আসিযাছ সেই স্থানকে জান, বিজ্ঞানের পরিণামের ত্রিজগতের উদ্ভব, সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে জান। থাকী<*থাক্কিত্বা. (২৯ সং চর্যা 'থাকিব' টীকা দ্র.)। হাণ = হত্যা কর। মাঝে · বিহাণ = টীকায চরণটির কোন ব্যাখ্যা নাই, তিব্বতী অনুবাদ হইতে ড. বাগচী কৃত সংস্কৃত ছায়া—'মধ্যে তিষ্ঠা সর্বম্ পরিত্যজ' (J. D L. XXX p 95) ; পরবর্তীকালে শান্তিভিক্ষু ও ড. বাগচীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত চর্যাগীতি-কোষে চরণটির সংস্কৃত অনুবাদ—'মধ্যে স্থিত্বা সকলং বিজহিহি' ; পরিত্যাগ করা, সকল কিছুর ঊর্ধ্বে উঠা, জয় করা, হত্যা করা ইত্যাদির তাৎপর্য প্রায় এক ; অন্য সকল পরিত্যাগ করিযা, সকল আসক্তি ধ্বংস করিযা মধ্যপথে নিরুদ্ধ থাক ; (৪র্থ চরণের ব্যাখ্যা দ্র.)। কলএল<কলকল। (তু. সএল<সকল ; চর্যার বানানে অ এ বিপর্যয় প্রায়শ।) সাদেঁ<শব্দেন। বিচুরিল<বি—*চুরিত (= চূর্ণ)+ইল্ল। তথতা = নির্বাণ, বোধিসত্ত্বাবস্থা। নাদেঁ<নাদেন। ভণই·· সাদেঁ = টীকানুসারে অর্থ, কঙ্কণ বলেন তথতানাদে অর্থাৎ বোধিসত্ত্বাবস্থালাভের ফলে সাকার নিরাকারাদির সমস্ত কলকল শব্দ (তর্কবিতর্ক) চূর্ণ হইল, অন্বয় অনুসারে অর্থ, কঙ্কণ কলকল শব্দে (সোচ্চারে) বলেন, তথতানাদে সকলই চূর্ণ হইল ; অবশ্য মর্মার্থে ইহাদের পার্থক্য সামান্যই।

ব্যাখ্যা সংকেত: আলোচ্য চর্যায় বিজ্ঞানবাদীদের মতানুসরণ করিয়া দ্বৈতমুক্ত বিশুদ্ধবিজ্ঞানই যে শূন্য এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানের উপলব্ধিই শূন্যের উপলব্ধি এবং তাহাই চরম সিদ্ধি। সংবৃতি বোধিচিত্ত প্রকৃতি-প্রভাস্বরতায় উন্নীত হইতে চারিটি স্তরের ভিতর দিয়া যায়। এই চারিটি স্তর শূন্যের চারিটি স্তর রূপে কল্পিত। চতুর্থ শূন্যেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। মধ্যপথ অবলম্বনের দ্বারা এই চতুর্থ শূন্যপথ বা অনুত্তর বোধি লাভ করা যায়। এই অবস্থায় বিকল্পাত্মক জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত চিত্ত সকল জ্ঞানের মূল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে জানিতে সক্ষম হয়। তখন সকল মোহ, পথবিপথে তর্কবিতর্ক, সব দূর হয়।

৪৫

রাগ মল্লারী ॥ কাহ্নুপাদানাং১

মণতরু২ পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
আসা বহল ৩পাতহ বাহা৩ ॥ ধ্রু ॥
বরগুরু বঅণে কুঠারেঁ ছিজঅ।
কাহ্ন ভণই তরু পুণ ন উইজঅ৪ ॥ ধ্রু ॥
বাঢ়ই৫ সো তরু সুভাসুভ পাণী।
ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী ॥ ধ্রু ॥
জো তরু ছেব ভেবউ ন জাণই৬।
সড়ি পড়িআঁ রে মূঢ়৭ তা ভব মাণই ॥ ধ্রু ॥
সু[ন] তরু[বর]৮ গঅণ কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬২খ-৬৩ক]

পা. ১. পদকর্তার নাম গীতারম্ভে নাই; ভণিতা হইতে প্রদত্ত। ২. শা. সু তরু। ৩-৩. শাস্ত্রীর সংশোধন: পাত ফলাহা, টীকা পত্রবহল ফলশ্চেতি। ৪. পুথিতে উইজডা/উইজগ; টীকা (উৎপদ্যতে) এবং অন্ত্যানুপ্রাসের জন্য উইজঅ প্রশস্ত। ৫. শা. সু. বাটই। ৬. পুথি জাইণ; লিপি বিপর্যয়। ৭. সু. মূট। ৮. পুথি সুতরু, টীকা সুনতরুবর; ছন্দের অনুরোধে সেই পাঠই প্রশস্ত।

অ ন্ব য়: মনতরু [স্বরূপ]। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার শাখা। আশা বহু পত্রবাহক (অথবা পাঠান্তরে, আশা বহু পত্র ও ফলবাহক)। শ্রেষ্ঠগুরুর বচন [রূপ] কুঠারে [এই তরু] ছেদন করিতে হয়। কাহ্ন বলেন, [যেন] তরু পুনরায় না উৎপন্ন হয়। সেই তরু বর্ধিত হয় শুভাশুভ জল [সেচনে]। বিদ্বজ্জনেরা সেই তরু ছেদন করেন গুরু-বচনে। যে (এই) তরুর ছেদন ভেদন জানে না, রে মূঢ়; সে পচিয়া গিয়া ভবকে মানিয়া লয়। শূন্য তরুবর, গগন কুঠার। ছেদন কর সেই তরু [যাহাতে] মূল ডাল না [থাকে]।

টী কা টি প্প নী: পাঞ্চ<পঞ্চ; আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত। ইন্দি<ইন্দ্রিয়। তসু<তস্য। সাহা<শাখা। আসা<আশা। বহল<বহুল। বাহা<বাহক। মন…বাহা=মন (সংবৃতি বোধিচিত্ত) তরুরূপে কল্পিত; পঞ্চেন্দ্রিয় সেই তরুর শাখা; আশা (কামনা, বাসনা) পত্র ফলবাহক। বঅনে<বচনেন। বরগুরু-বঅনে=শ্রেষ্ঠ গুরুর উপদেশে। কুঠারেঁ<কুঠারেণ; গুরু উপদেশই কুঠার রূপে কল্পিত। ছিজঅ<ছিদ্যতে; =ছেদন করা হয় (কর্মভাববাচ্য)। উইজঅ= উজায়, উদ্ভিন্ন হয়; উৎপদ্যতে>উব্বজই>উইজই>উইজঅ; শব্দটি উদ্‌বীজয়তি

হইতেও ব্যুৎপন্ন হওয়া সম্ভব। বাঢ়ই=বাড়ে; <বর্ধতে। সুভাসুভ=শুভাশুভ। পাণী—জলদ্বারা; করণকারক, কিন্তু কোন বিভক্তি নাই, সম্ভবত অন্ত্যমিলের জন্য; অথবা পান করিয়া অর্থে<*পাণিত্বা=পীত্বা। বাঢ়ই·পাণী=সেই মনরূপ তরু বর্ধিত হয় শুভাশুভের কামনা-বাসনারূপ জলসেচের দ্বারা। ছেবই=ছেদন করে; ছেদন্তি>ছেঅই>ছেবই (ব-শ্রুতি)। বিদুজন<বিদ্বজ্জন। পরিমাণী=<*পরিমাণিত=প্রমাণিত অর্থাৎ আদিষ্ট। ভেবউ=ভেদ>ভেঅ >ভেব (ব-শ্রুতি)+উ (অপি>ও>উ)। জাণই<জানাতি। সড়ি=পচিয়া; <ষটিত্বা; পচা, রুগ্ন বা ক্লিষ্ট হওয়া অর্থে √ষট্, দ্র. EDB p85); হিন্দিতে পচা অর্থে সড়া। পড়িআ<পতিত্বা। সড়ি পড়িআঁ যৌগিক ক্রিয়া। ভব=জগতের দুঃখময় অস্তিত্ব। মাণহ<মানয়তি। সুন কুঠাব=প্রকৃতি দোষযুক্ত প্রথম তিনশূন্য তরুস্বরূপ। গগন-কুঠাব। ছেবহ··ডাল=সেই তরুকে এমনভাবে ছেদন কর যেন মূল ডাল কিছুই না থাকে।

ব্যাখ্যা সংকেত: বাসনাবিক্ষুব্ধ অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তই সমস্ত ভবজ্ঞান ও দুঃখ বিপর্যয়ের মূল এবং সদ্‌গুরুর উপদেশে সেই চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া প্রকৃতি-প্রভাস্বর চিত্তে পরিণত করাই সাধনা ও সিদ্ধি—আলোচ্য চর্যায় এই তত্ত্ব ব্যক্ত।

বাসনাজড়িত অবিদ্যাচ্ছন্ন সংবৃতি বোধিচিত্ত তরুরূপে কল্পিত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সংবৃতি বোধিচিত্তের অঙ্গ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাই মনতরুর শাখা এবং আশা পত্র-ফল বাহকরূপে বর্ণিত। বৃক্ষ যেমন জল সেচনে বর্ধিত হয়, মনতরু সেইরূপ শুভাশুভের কামনারূপ জলসেচে বর্ধিত হয়। সাধনায় সিদ্ধির জন্য এই তরু অবশ্যই ছেদনীয়। সদ্‌গুরুর উপদেশ এবং প্রকৃতি-প্রভাস্বর গগনরূপ চিত্তই এই তরু-ছেদনের কুঠার। যিনি এই তরু ছেদনে অজ্ঞ তিনি জগতের দুঃখময় অস্তিত্বে আবদ্ধ। সুতরাং এই তরুকে ডালে মূলে এমনভাবে ছেদন করিতে হইবে যাহাতে আর যেন তাহা পুনরুজ্জীবিত না হয়।

৪৬

রাগ শবরী ॥ জয়নন্দীপাদানাং ॥

পেখু[১] সুঅণে অদশ জইসা।
অন্তরালে মোহ তইসা ॥ ধ্রু ॥
মোহ[২] বিমুক্কা জই মাণা[৩]।
তবেঁ তুটই অবণাগমণা ॥ ধ্রু ॥
নৌ[৪] দাঢ়ই নৌ তিমই ন চ্ছিজই।
পেখ মোঅ[৫] মোহে বলি বলি বাঝই[৭] ॥ ধ্রু ॥

ছাঅ মাআ কাঅ সমাণা।
বেণি পাখেঁ সোই বিণা৭ ॥ ধ্রু ॥
চিঅ তথাতা৮ স্বভাবে ষোহিঅ।
ভণই জঅনন্দি ৯ফুড অণ৯ ণ১০ হোই ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬৫খ-৬৭ক]

পা. ১. টীকা পেখই। ২. শা. সু. মোদ পাঠ করিয়া সংশোধিত পাঠ মোহ দিয়াছেন, হ অনেকটা দ-এর মতো লিখিত। ৩. টীকানুসারে মণা। ৪. টীকা নো। ৫. সু. লোঅ। ৬. সু. বাজ্‌ঝই। ৭ সু. বি [ণা] (বিণা[ণা]?)। ৮. সু. তথতা, তথাতা লিপিপ্রমাদ। ৯-৯. শা. ফুড়অণ। ১০. সু. ন।

অ ন্ব য: স্বপ্নে যেমন অদৃশ্য (অথবা টীকানুসারে স্বপ্নে এবং দর্পণে যেমন) [মিথ্যাবস্তু] দেখ, অন্তরে মোহও তদ্রূপ। যদি মন মোহবিমুক্ত [হয়] তবে গতাগতি দূর হয়। ইহাকে দাহ করা যায় না, ভিজানো যায় না, ছেড়াও যায় না। দেখ [লোকে] তবু বারবার মিথ্যা মোহে বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান। দুই পক্ষ বিহীন সেই [প্রভাস্বর চিত্ত।] চিত্ত তথতা স্বভাবে শোধিত হইলে স্ফুট (= অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত) হয়, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না।

টী কা টি প্প নী. পেখু = দেখ (অনুজ্ঞা), প্রেক্ষস্ব > পেখহু > পেখু, টীকায় পেখই = দেখে, < প্রেক্ষতি। সুঅণে < স্বপ্নে (স্বপনে)। অদশ - অদৃশ্য, যাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, অমূলক, টীকায় আদর্শ বা দর্পণ অর্থে গৃহীত। জইসা < যাদৃশ। অন্তবালে - আড়ালে, এখানে অন্তরে বা চিত্তে। তইসা < তাদৃশ। বিমুক্কা < বিমুক্ত। জই < যদি। মনা < মনঃ। তবে < তেব্বং হি (প্রাকৃত)। তুটই < ত্রুট্যতে। অবণাগমনা - আনাগোনা, যাতায়াত, জন্মমৃত্যু, ২১ সং চর্যা দ্র.। নৌ - কখনই না, নতু > নউ > নৌ। দাঢই = দগ্ধ হয়, দগ্ধ > দড্‌ঢ > দাঢ + ই (< তি)। তিমই = ভেজে; < তিম্যতে। ছিজ্জই = ছিন্ন হয়; ছিদ্যতে। পেখ = দেখ (অনুজ্ঞা), প্রেক্ষস্ব > পেক্‌খহ > পেখ। মোঅ - মিথ্যা, < মোঘ। বলিবলি = বারবার, বলী > বলি, সু. সেন অর্থ করিয়াছেন বলিহারী। বাঝই = বদ্ধ হয়; বাধ্যতে। বেণি = উভয়; < *দ্বীণি। ষোহিঅ < শোধিত। ফুড় < স্ফুট। অণ < অন্য। হোই = হয়, ভবতি > ভোদি > হোদি > হোই।

ব্যা খ্যা স ং কে ত: আলোচ্য চর্যায় চিত্তের দুটি রূপের বর্ণনা। অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রকৃতিদোষযুক্ত, সংবৃতি বোধিচিত্তই সমস্ত প্রকার মিথ্যাভবজ্ঞানের জন্মদাতা। অন্যদিকে প্রকৃতিপ্রভাস্বর পারমার্থিক বোধিচিত্তই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা মহাসুখময় সহজজ্ঞানস্বরূপ। আমাদের অন্তরের অবিদ্যামোহই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বজ্ঞান সৃষ্টি করে, মিথ্যা অস্তিত্বহীন বস্তুকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত করায়। সদ্‌গুরু উপদেশে মনকে মোহমুক্ত করিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যুর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের কোন

প্রভাব আর থাকে না। মোহমুক্ত মন (প্রকৃতিপ্রভাস্বর চিত্ত) অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে ভেজে না, অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন হয় না। মোহমুক্ত মন অবিনাশী, তবুও লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই মোহেই বদ্ধ হয়। ছায়া মায়া কায়া সমান; দুই পক্ষেই সেই একই বিজ্ঞান দুইভাবে প্রকাশিত। বিজ্ঞান যখন অবিদ্যাচ্ছন্ন তখন তাহা হইতেই ছায়া মাষা কায়া ইত্যাদির উদ্ভব। কিন্তু যখন তাহা অদ্বয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তখন তাহাই প্রকৃতিপ্রভাস্বর বিশুদ্ধবিজ্ঞানরূপ পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হয়। চর্যাকার তাই বলিতেছেন, চিত্ত অদ্বয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ তথতাদ্বারা শোধিত হইলে সব কিছুই স্ফুট হয়, অন্যথায় নয়।

আলোচ্য গীতিটির মোহমুক্ত মনের বর্ণনা গীতার আত্মার বর্ণনার অনুরূপ—

তু. নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২।২৩

৪৭

১[রাগ] গুড়্ডরী ॥ [ধাম]পাদানাং ॥১

কমল কুলিশ মাঝেঁ ভইঅ২ মিঅলী।
সমতা জোএঁ জলিঅ৩ চণ্ডালী ॥ ধ্রু ॥
ডাহ৪ ডোম্বীঘরে লাগেলি আগি।
সহষলি৫ লই বিঞ্চহুঁ পাণী ॥ ধ্রু ॥
ণউ৬ খর জালা ধুম৭ ণ৮ দিশই।
মেরুশিখর লই গঅণ পইসই ॥ ধ্রু ॥
ফাটই৯ হরিহর বাহ্ম ভরা১০।
ফীটা১১ হই ণবগুণ ১২শাসনপড়া১২ ॥ ধ্রু ॥
ভণই ধাম ফুড় ১৩লেহু রে১৩ জাণী১৪।
পঞ্চনালেঁ উঠি১৫ গেল পাণী ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬৫ক]

পা. ১-১. পুথিতে গুড়্ডরীপাদানাং, ভণিতা ও টীকা হইতে জানা যায় কবির নাম ধাম; রাগের নাম গুঞ্জরী লিপিপ্রমাদে গুড়্ডরী, [রাগ] ও [ধাম] লিপিতে বাদ গিয়াছে, পাদানাঃ লিখিয়া পাদানাং করা। ২. শা. ভইম; সু. ভই ম; পদটির শেষ বর্ণের সাদৃশ্য ম অপেক্ষা অ-এর সহিত বেশি। ৩. লি-এর ই-কারের বাঁ-দিকের দাঁড়ি নাই; কেবল মাথার উপর অর্ধবৃত্তাকার চৈতন। ৪. টীকা দাহ। ৫. টীকা সসহর; সু. সহষলি পাঠ করিয়া টীকানুসারে সসহর পাঠ দিয়াছেন; শুদ্ধপাঠ সসহর। ৬. শা. সু. নউ। ৭. সু. ধুম। ৮. শা. ন। ৯. নী. স্ফাটই; টীকা দাঢ়ই। ১০. সু. ভ [ড়ারা], তিব্বতী

অনুবাদে অর্থ মুনি, পণ্ডিত ; তদনুসারে শুদ্ধপাঠ ভড়া<ভট্ট। ১১. ফীটা/ ফীট্টা পাঠও সম্ভব, সু. ফীট্টা ; নী. ফীটা, ১২-১২. সু. শাসন-পড়া। ১৩-১৩. শা. লেঙ্গু রে। ১৪ সু. জানী। ১৫. শা. সু. উঠে ; পুথিতে ই-কার মাঝে মাঝে এ-কারের মতো।

অ ন্ব য : কমল কুলিশ মধ্যে হইল মিতালি। সমতা যোগে চণ্ডালী জ্বলিল। দাহন [যুক্ত] অগ্নি ডোম্বীঘরে লাগিল। শশধর লইয়া জল সিঞ্চন কর। খরজ্বালা নাই, ধূমও দেখা যায না। মেরু শিখর লইয়া গগনে প্রবেশ করে। [অগ্নি] হরিহর ব্রহ্মাঠাকুরকে ফাটায (পোড়ায়)। নবগুণ শাসনপট্টও ফাটিয়া গেল। ধাম বলেন, স্পষ্ট করিয়া জান, পাঁচটি নালে জল উঠিয়া গেল।

টী কা টি প্প নী : কমলকুলিশ=মহাযানী ধর্মমতের প্রজ্ঞা ও উপায বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলার স্থান গ্রহণ করে, বৌদ্ধতন্ত্রে কমলকুলিশ স্ত্রী ও পুং জননাঙ্গের প্রতীকরূপেও কল্পিত, আলোচ্য পদে কাযসাধনার ইঙ্গিত স্পষ্ট ; ৪ সং চর্যার টীকা দ্র.। ভইঅ<*ভবিত=ভূত। মিঅলী=মিতালি। সমতাজোএঁ= সমতা যোগের দ্বারা ; জোএঁ<যোগেন। জলিঅ<জ্বলিত। চণ্ডালী=নাভিস্থিত নির্মাণচক্রের সংবৃতি বোধিচিত্তরূপ চণ্ডালী (= তন্ত্রের কুলকুণ্ডলিনী)। ডাহ< দাহ ; দহনশক্তিযুক্ত। লাগেলি=লাগিল : ১৬ ও ১৭ চর্যা দ্র. ; -ইল যুক্ত ক্রিয়ারূপ বিশেষণ হিসাবে প্রযুক্ত, পরবর্তী আগি<অগ্নির সহিত লিঙ্গসৌষম্যে লাগেলি স্ত্রীলিঙ্গ। সহযলি=সসহর<শশধর ; প্রকৃতিপ্রভাস্বর বোধিচিত্ত। লই=লইয়া ; <*লভিত্বা (=লব্ধ্বা)। সিঞ্চহুঁ=সেচন কর (অনুজ্ঞা) ; সিঞ্চস্ব >সিঞ্চস্সু>সিঞ্চহু, সিঞ্চহুঁ, সিঞ্চহূঁ। পাণী<পানীয়। নউ<ন তু। খর =তীব্র। জালা=জ্বালা। দিশই<দৃশ্যতে। মেরুশিখর=তন্ত্রোক্ত দেহমেরু-শিখরে কল্পিত বিভিন্ন পদ্ম। গঅণ=মহাসুখ চক্র (=তন্ত্রের উষ্ণীষ কমল)। পইসই=প্রবেশ করে ; <প্রবিশতি। ফাটই<স্ফাটতি ; ফাটায় ; টীকায় দাঢ়ই=দাহন করে ; ৪৬ চর্যা দ্র. ; টীকানুসারে, হরি মূত্রনাড়ী ; হর= শুক্রনাড়ী ; এগুলি সন্ধ্যাভাষিত। ভরা=ভড়া<ভট্ট। ফীটা=প্রাকৃত ফিট্ট ধাতু হইতে ; বিদীর্ণ অর্থে ; টীকায় দগ্ধ ; ১২ ও ২১ চর্যা দ্র.। হই<*ভবিত (=ভূত)। নবগুণ=টীকানুসারে নবপবন ; নবগুণ=উপবীত ; নবগুণ বলিতে নবলক্ষণ অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি তপ এবং দান এই নবধা কুললক্ষণকেও বোঝায় ; আলোচ্য প্রসঙ্গে সেই অর্থ অসঙ্গত নহে ; অর্থাৎ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দগ্ধ বা বিদীর্ণ হইল। ফাটই…পড়া=অন্য অর্থে, হরিহর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ফাটিয়া গেল অর্থাৎ পুড়িয়া গেল ; এই লৌকিক চিত্রের তাত্ত্বিক তাৎপর্য—সমস্ত দ্বৈতজ্ঞান পুড়িয়া গেল ; সুতরাং উপবীত বা নবফলক বিশিষ্ট শাসনপট্ট অর্থাৎ তাহার প্রতিপত্তির উপাদানসমূহ পুড়িয়া গেল, নিষ্ফল হইল ; ব্রাহ্মণেরা শাসনপট্টের

জোরে নিষ্কর জমি ভোগ করিতেন : শাসনপট্ট পুড়িয়া গেলে করধার্য হইত ; তাই শাসনপট্ট তাঁহার প্রতিপত্তির উপাদান। শাসনপট্ট সাধারণত নয় ফলা বিশিষ্ট ধাতুপাত্রে লিখিত হইত, তাই নবগুণ। শাসনপড়া<শাসন পট্ট ; তাত্ত্বিক অর্থ—ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ, পূর্বে যাহাব শাসনে চর্যাকার ছিলেন। ফুড়<স্ফুট। লহু = লও ; <লভস্ব। জানী<*জানিত = (জ্ঞাত)। উঠে = উঠিয়া ; <উত্থিত্বা।

ব্যা খ্যা স ং কে ত : তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া উষ্ণীষকমলে শিবের সহিত মিলিত কবিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই সিদ্ধির জন্য তন্ত্রে কায়সাধনাব যে পদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে তাহাতে ইড়া, পিঙ্গলা এই দুই নাড়ীকে যুক্ত করিয়া মধ্যনাড়ী সুষুম্না পথে চালিত করিতে পারিলে শক্তি ক্রমে উর্ধ্বগা হয়। আলোচ্য গীতিটিতে বৌদ্ধরূপান্তরে তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি এবং প্রসঙ্গত সিদ্ধিলাভের বিষয় বর্ণিত।

কমল ও কুলিশের মধ্যে মিতালি হইল অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের ফলে নাভিস্থিত নির্মাণচক্রেব চণ্ডালী জাগ্রত (প্রজ্বলিত) হইল। সেই অগ্নি পরিশুদ্ধা অবধূতিকা ডোম্বীর গৃহেও লগ্ন হইল অর্থাৎ ক্রমে উর্ধ্বমুখী হইল। প্রকৃতি-প্রভাস্বর বোধিচিত্ত সেই আগুনে জল সিঞ্চন করে ; অর্থাৎ সেই আগুন মহা-সুখের সহিত বিলীন হইল। সেই আগুনের প্রখর জ্বালা বা ধূম দৃষ্ট হয় না। দেহমেরুর উপর কল্পিত বিভিন্ন পদ্মের মধ্য দিয়া ক্রমে এই অগ্নি উষ্ণীষকমলে উপনীত হয়। তখন হরিহর অর্থাৎ সমস্ত প্রকার দ্বৈতজ্ঞান এবং ব্রহ্ম বা আচাব-অনুষ্ঠান বিধিনিষেধ, বাহ্যিক প্রতিপত্তি ইত্যাদি সমস্ত নিষ্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পদকর্তা তাই বলিতেছেন এই অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার পদ্ধতিটি স্পষ্ট করিয়া জানিয়া লও। তাহা হইলে সংবৃতিবোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া পঙ্কনালে অর্থাৎ হরিহব ইত্যাদি দেহেন্দ্রিয়াদির এবং আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির বশ্যতা হইতে উঠিয়া যাইবে, মুক্ত হইবে।[১]

× ৪৯

রাগ মল্লারী ॥ ভুসুকুপাদানাং ॥

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ[১] দঙ্গালে[২] দেশ[৩] লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
অজি[৪] ভুসু[৫] বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী[৬] লেলী ॥ ধ্রু ॥

---

১. মূল পুথিতে অতঃপর একটি পাতা না থাকায় ৪৮ সং গীতিটি পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ হইতে এই গীতিটির সম্ভাব্যরূপ জানা যায়।

৭ডহি জো৭ পঞ্চপাটণ৮ ইন্দি৯ বিসঅ১০ ণঠা।
ণ জাণমি১১ চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা॥ ধ্রু॥
১২সোণ ত রুঅ১২ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
ণিঅ পরিবারে মহানেহে১৩ থাকিউ॥ ধ্রু॥
চউকোড়ি১৪ ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥ ধ্রু॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬৭ক]

পা. ১. নী. আদঅ। ২. টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন বঙ্গালে। ৩. পুথির পাঠ দ্রেশ সম্ভব; শুদ্ধপাঠ দেশ; টীকানুসারে শাস্ত্রীর সংশোধন ক্লেশ; তিব্বতী অনুবাদে দেশ; বাগচী দেশ পাঠগ্রহণের পক্ষপাতী তবুও বঙ্গাক্ষরে চর্যাগুলি উল্লেখে ক্লেশ রক্ষিত (দ্র. JDL XXX p 105 & 154); পরে শান্তিভিক্ষু সম্পাদিত চর্যাগীতিকোষে দেশ পাঠ গৃহীত। ৪.=আজি; টীকা. শা. সু. আজি। ৫.=ভুসুকু (টীকা)। ৬. টীকা চণ্ডালে (চণ্ডালেঁ?)। ৭-৭. টীকা দহিঅ। ৮. টীকা পাটন; পুথিতে ঘষামাজার চিহ্ন আছে, মনে হয় ধাটণ লিখিয়া ধ-কে প করা হইয়াছে। ৯. পুথি অস্পষ্ট; ইন্দি পড়া চলে; টীকা 'ইন্দ্রিয় বিষয়ঞ্চ'। ১০. সু. বিসআ; নী. বিসঅ; শা. বিসংজ্ঞা; পুথিতে স-এর পরে কী ছিল বুঝিবার উপায় নাই; সূত্রপ্রবেশ ছিদ্র বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ অংশ লুপ্ত। ৭-১০ চরণটিকে শাস্ত্রী 'ডহি জো পঞ্চধাট ণই দিবি সংজ্ঞা ণঠা' পড়িয়াছেন; শুদ্ধপাঠ মনে হয় দহিঅ পঞ্চপাটণ ইন্দিবিসঅ ণঠা। ১১. শা. জানমি। ১২-১২. টীকা সোনরুঅ। ১৩. শা. মহাসুহে। ১৪. নী. চউকোড়ি।

অন্বয়: বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মাখালে বাহিত [হইল]। অথবা, বজ্রনৌকা পদ্মাখালে পড়িয়া বাহিত [হইল]। অদ্বয় (নির্দয়) দঙ্গালদ্বারা (দস্যু দ্বারা) দেশ লুণ্ঠিত। আজ ভুসুকু বঙ্গালী হইল [কারণ] নিজ গৃহিণীরূপে চণ্ডালীকে লইল। অথবা, আজ ভুসুকু [তুই] বঙ্গালী হইলি, তোর গৃহিণীকে চণ্ডালে লইল। পঞ্চপত্তন দগ্ধ [হইল], ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ নষ্ট [হইল]। জানি না চিত্ত মোর কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট [হইল]। সোনারূপা আমার কিছুই থাকিল না। নিজ পরিবারে মহাসুখে থাকিলাম। চতুষ্কোটি ভাণ্ডার মোর নিঃশেষে লুণ্ঠিত। [এখন] জীবন্তে ও মৃতে (বাঁচা মরায়) কোন পার্থক্য নাই।

টীকাটিপ্পনী: বাজ<বজ্র। ণাব=নৌকা; <নৌ। পাড়ী=পাড়ি দিয়া; পার>পাড়+ঈ<ইত্বা; পাড়ী শব্দটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দুরূহ; ণাবপাড়ী একত্রে গ্রহণ করিয়া *ণাবপাটিকা বা নাববাটিকা হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করিয়া নৌবহর অর্থ করা চলে; টীকার ইঙ্গিত অনুসারে (প্রবেশিত=পতিত)>পড়ি পাঠ গ্রহণ করিলে চরণটির বাচ্যার্থ হয় বজ্রনৌকা পদ্মাখালে পড়িয়া বাহিত হইল।

পঁউআখালেঁ=পদ্মা অথবা পদ্মখালে। পদ্ম>পঁউঅ। বাহিউ<বাহিতঃ। তাত্ত্বিক অর্থে, বজ্রনৌকা=শূন্যতারূপ নৌকা। পদ্মাখাল=প্রজ্ঞাখাল। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনই ব্যঞ্জিত। অদয়=অদ্বয়; দ্বৈতজ্ঞানরহিত; অদয় শব্দটিতে নির্দয়েব ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। দঙ্গালে=দস্যুতে। লুড়িউ<লুণ্ঠিত>লুটিঅ> লুড়িউ। বঙ্গালী—আপাত অর্থে বেচারী; তাত্ত্বিক অর্থে অদ্বয়জ্ঞানধারী সহজ-সিদ্ধপুরুষ। ভইলী<* ভবত্তি (=ভূত)+ইল্ল+ঈ (স্ত্রী); বাঙ্গালীব সহিত লিঙ্গ সৌষম্যে। ঘরিনী=<গৃহিণী। চণ্ডালী=নৈরাত্মা; তন্ত্রের শক্তির বৌদ্ধতান্ত্রিক নামান্তব। চর্যাগীতিতে চণ্ডালী, শবরী ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে মহা-সুখকে অর্থাৎ শক্তি জাগ্রত হইবাব ফলকেও বোঝায় (দ্র. চর্যার ধর্মমত)। লেলী <*লভিত্ত (=লব্ধ)>লইঅ+ইল=লইল+ঈ (স্ত্রী); চণ্ডালীর সহিত লিঙ্গ সৌষম্যে। টীকানুসাবে চরণটিব অর্থ অন্য প্রকার হইতে পারে। বঙ্গালী= অদ্বয়জ্ঞানসম্পন্ন। চণ্ডালে=<চণ্ডালেন, চণ্ডালদ্বারা, প্রকৃতি প্রভাস্বরতা দ্বারা, লেলী=গৃহীতা, আজ ভুসুকু তুই অদ্বয়জ্ঞানসম্পন্ন হইলি কারণ তোর নিজগৃহিণীকে (=সংবৃতি বোধিচিত্ত) চণ্ডালে লইয়াছে (=প্রকৃতি প্রভাস্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে)। দহিঅ<* দহিত (=দগ্ধ)। পঞ্চপাটণ=পঞ্চপত্তন বা বন্দর, এখানে পঞ্চস্কন্ধ। ইন্দিবিসআ=ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ। ণঠা<নষ্ট। কঁহি= কোথায়, ৭ চর্যা দ্র.। গই-যাইয়া, ২ চর্যা দ্র.। পইঠা<প্রবিষ্ট। সোণ< স্বর্ণ, রুঅ<রূপা, রৌপ্য। ব্যঞ্জিত অর্থে, সোণ=শূন্যতা, অনস্তিত্ব; রুঅ= রূপ, অস্তিত্ব, ৮ চর্যা দ্র.। সোণরুঅ=জগতের অস্তিত্ব অনস্তিত্বের দ্বৈতজ্ঞান। কিম্পি=কিছুই<কিমপি, মধ্যাস্বরলোপ। থাকিউ=অবস্থিত; প্রাকৃত √থক্ক+ইত (কর্মভাববাচ্যে)। চউকোড়ি<চতুষ্কোটি। ভণ্ডার<ভাণ্ডার। লইআ<*লভিত্বা=লব্ধ্বা। সেস<শেষ। চউকোড়ি···সেস=চার কোটি টাকার ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইয়া শেষ; তাত্ত্বিক অর্থে, চতুষ্কোটি বিচারের ভাণ্ডার নিঃশেষিত; ফলে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত শূন্যতার পরমতত্ত্ব লব্ধ। ৩৭ চর্যার চৌকট্টি বিমুকার টীকা এবং দার্শনিক পটভূমি অধ্যায় দ্র.। জীবন্তে=জীবিতে, জীব+ অন্ত্+এ। মইলেঁ=মৃত>মঅ+ইল; মৃতে। বিশেষ=পার্থক্য।

ব্যাখ্যা সংকেত: সংবৃত্তি বোধিচিত্তের পারমার্থিক বোধিচিত্তে পরিণত হওয়া এবং তাহার ফল হিসাবে যে অবস্থার উদ্ভব তাহার বর্ণনা আছে আলোচ্য চর্যায়। গীতিটিতে নৌকা বাহিবার এবং চুরি ডাকাতি ইত্যাদি সমাজচিত্রের রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

শূন্যতা-রূপ নৌকা প্রজ্ঞারূপ পদ্মাখালে পারের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সহজ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাহিত হইল। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলনের মধ্য দিয়া অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধির পথে যাত্রা শুরু হইল। অদ্বয় জ্ঞানলাভের ফলে অবিদ্যাজনিত অবস্থা নিঃশেষিত হইল। আজ ভুসুকু সহজ সিদ্ধপুরুষ (অদ্বয়জ্ঞানসম্পন্ন—বঙ্গালী) হইয়াছেন।

তিনি নৈরাত্মারূপিণী শক্তিকে নিজ গৃহিণী করিয়াছেন। শক্তি জাগ্রত হওয়ায় তাহার রূপবেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহ নষ্ট হইল। সোনারূপা অর্থাৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বৈতজ্ঞান আর কিছুই রহিল না। নিজ পরিবারে অর্থাৎ চণ্ডালীর সহবাসে মহাসুখেই এখন চর্যাকারের অবস্থান। তিনি এখন চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পরমতত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যতার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এখন বাঁচা মরায় কোন পার্থক্য নাই।

রাগ রামক্রী শবরপাদানাং

৫০

গঅণত গঅণত তইলা বাড়্হী হেঞ্চে কুরাহী[১]।
কণ্ঠেঁ[২] নৈরামণি[৩] বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥ ধ্রু ॥
ছাড়ু[৪]ছাড় মাআ মোহা বিষমো[৫] দুন্দোলী[৬]।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ[৭] [৮]সুণ মেহেলী[৮] ॥ ধ্রু ॥
হেরি ষে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে[৯] সমতুলা।
[১০]ষুকড় এ সে রে[১০] কপাসু ফুলিটিলা[১১]। ধ্রু ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না[১২] বাড়ি তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী[১৪] রে অকাশ ফুলিআ[১৫] ॥ ধ্রু ॥
[১৬]কঙ্গুরিনা পাকেলা রে[১৬] শবরা শবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো[১৭] কিংপি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥ ধ্রু ॥
চারিবাসে [১৮]তা ভলা[১৮] রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো (দা)হ[১৯] কএলা [২০]কান্দশ সগুণ[২০] শিআলি ॥ ধ্রু ॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে [২১]দিধলি বলী[২১]।
হের সে শবরো[২২] ণিরেবণ ভঈলা[২৩] ফিটিলি ষবরালী[২৪] ॥ ধ্রু ॥

[পুথির পৃষ্ঠা ৬৮ক-খ]

পা. ১ শা. কুরাড়ী; সু. নী. কুরাঢ়ী। ২. শা. কণ্ঠে। ৩. লিপিকর প্রথমে ণৈরাণি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে ণি-কে ঘষিয়া ম করিয়া তারপর ণি লিখিয়াছেন। ৪ টীকা ছাড়। ৫ শা. বিষমে; সু. বিষমী। ৬ সু. দুন্দোলি। ৭. লিপিকর ণইআ লিখিয়া ণ-কে মাত্রাযুক্ত করিয়া ল করিয়াছেন। ৮-৮. শা. সুণমে হেলী। ৯ টীকা খসমে। শা. খঃসমে পাঠ করিয়াও টীকানুসারে খসমে লিখিয়াছেন। ১০-১০. শা. ষুকড়এ সেরে। ১১. = ফুটিলা। 'লি' লিপিপ্রমাদ। শা. ফুটি (লিটি)লা। ১২. টীকা জোহ্ন। ১৩. শা. বাড়ী।

১৪. শা. অন্ধারি। ১৫.=ফুলিলা। ১৬-১৬ শা. কঙ্গুরি না পাকেলা রে। সু. টীকানুসারে সংশোধিত পাঠ কুঙ্গুচিনা পাকেলারে। পদবিভাগ ও অর্থের জন্য টীকাটিপ্পনী দ্র. পুথির পাঠোদ্ধারে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ১৭. শা. সু. শবরো। ১৮-১৮. শা. ভাইলা। সু তাভলা পাঠ করিয়া সংশোধিত 'গড়িলা' পাঠ দিয়াছেন। টীকাতে খুব সম্ভব 'মড়িল' আছে। শা. সু. নী. টীকাতে 'গড়িল' পড়িয়াছেন। ১৯ টীকানুসারে (দগ্ধ্যা) 'দা' সংযোজিত। শা চ-কে পরবর্তী কএলা-ব সহিত যুক্ত করিয়া পদবিভাগ করিয়াছেন হক এলা। ২০-২০ লিপিকর সম্ভবত একটি স/শ বেশি লিখিয়াছেন। শুদ্ধপাঠ কান্দ সগুণ/শগুণ। ২১-২১. শা দিধ লিবলী। ২২ শা. সবরো। ২৩ শা. ভইলা। ২৪ সু. অব সলী।

অ ন্ব য়: গগনে গগনে তৃতীয় বাড়ী, কুঠার দ্বারা হানিয়া উৎপাটিত, কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জাগ্রতা। বিষম দ্বন্দ্বময় মায়ামোহ ছাড়। শবর শূন্য-নারীকে লইয়া মহাসুখে বিলাস করিতেছে। আমার সেই তৃতীয় বাড়ীকে গগন-সমতুল্য দেখি, সুন্দর (বা শুক্র) কার্পাস প্রস্ফুটিত। তৃতীয় বাড়ীর পার্শ্বে জ্যোৎস্না বাড়ী। অন্ধকার দূর হইল, আকাশে ফুল ফুটিল। কঙ্গুচিনা পাকিল, ওরে, শবর শবরী মত্ত হইল; দিনের পর দিন শবরের আর কোন চেতনা রহিল না, মহাসুখে (মত্ত) হইল। চাঁচাড়ি দিয়া সেই চারবাস (শব বহিবার চালি, তাত্ত্বিক অর্থে চতুর্থ বাড়ী) হইল; তাহাতে তুলিয়া শবরকে দাহ করিল, শকুন শৃগাল কাঁদে। ভবমত্তকে মারিল, দশদিকে বলি দেওয়া হইল, দেখ সেই শবর নির্বাণ (প্রাপ্ত) (নির্মূল) হইল, শবরালি ঘুচিয়া গেল।

টী কা টি প্প নী: গঅণত=গগনে। 'ত' অধিকরণে<ত্র, বা তসিল দ্র. ৩ চর্যা দুআরত। গগন শব্দের দুবার ব্যবহারে প্রথম দুই শূন্যকে বুঝাইতেছে। তইলা=তৃতীয়>তইঅ+লা (তু° পয়লা), অথবা তৃতীযে লগ্ন। তৃতীয শূন্যে লগ্ন বাড়ী। (দ্র. শূন্যতা ও করুণার তত্ত্ব, দার্শনিক পটভূমি অধ্যায়)। বাড়ী< বাটিকা। হেঞ্চে=হানিযা, হিত্য>হিচ্চ, হেচ্চ<হেঞ্চ। কুরাঢ়ী=কুঠার। কুঠারিকা>কুঠারী>কুহারী>কুরাহী (বিপর্যাস), পাঠান্তরে কুবাড়ী< কুঠারিকা। নৈরামণি=নৈরাত্মা, (৪৯ চর্যার চণ্ডালী ব্যাখ্যা দ্র.)। বালি< বালিকা। জাগন্তে=জাগ্রতা। জাগ (√জাগৃ)+অন্ত+এ। উপাড়ী—< উৎপাটিত। দুন্দোলী=দ্বন্দ্বময়, সমস্যা, <দুর্দোলিকা। মেহেলী=মহিলা, স্ত্রী, ১৩ চর্যার মেহেরী দ্র.। খসমে=গগন তুল্য। যুকড়>সুকর=সুন্দর, শুক্ল। সুকড়<সুকৃত অথবা শুক্ল>সুকল>যুকর>যুকড়। কপাসু=কার্পাস, মহাসুখ। তন্ত্রে 'ক'=মহাসুখ। চর্যাগুলিতে অনেক সময় গোপনীয়তার জন্য মহাসুখ অর্থে 'ক' দিয়া আরম্ভ কোন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ৯ পংক্তির কঙ্গুচিনা তু°। টীকায় কপাস-এর অর্থে বলা হইয়াছে 'ক' এর পার্শ্ববর্তী (পাস)

অর্থাৎ 'খ' = গগন, চতুর্থ শূন্য। ফুটিলা = স্ফুটিত + ইল্ল + আ। পাসেঁর = পার্শ্বস্থ, পাস + এর ষষ্ঠী। জোহ্ন = < জ্যোৎস্না। তাএলা < তদ্‌বেলা; সেই সময়ে; ফিটেলি—৬৭ চর্যার ফীটই দ্র.। অন্ধারি < *অন্ধকারিক। অকাশ < আকাশ। ফলিলা < *ফুল্লিত = (ফুল্ল) + ইল্ল + আ। কঙ্গুরিনা = কঙ্গুচিনা = ধান্য বিশেষ; এখানে মহাসুখ বা চতুর্থ শূন্য অর্থে প্রযুক্ত। কপাস টীকা দ্র.। পাকেলা = < পক্ব (পাক) + এল (ইল্ল) + আ। মাতেলা = মত্ত + ইল্ল + আ। কিম্পি = কিমপি। চেবই < চেতয়তি; বুঝিতে পারে। ভেলা = বিকল, ভোলা < বিহ্বল। চারিবাস = চতুর্থ আবাস, চতুর্থানন্দ ধাম। তাভলা, পদবিভাগ তা ভলা ধরিলে অর্থ, তাহা হইল। ভইলা > ভলা। তাভলা একটি পদ ধরিলে অর্থ, স্তব্ধ হইল, স্থির হইল, চঞ্চলতা দূর হইল। স্তব্ধ > তব্‌ভ > তাভ + ইল + আ। টীকার পাঠান্তর (সু) গড়িলা < গঠিত + ইল্ল + আ। বস্তুত টীকায় মডিলা আছে। মণ্ডিত + ইল্ল + আ। চঞ্চালী = দ্ব্যর্থক শব্দ; (১) বাঁশের চাঁচাড়ি, (২) চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদি। তঁহি < তস্মিন. বা *তহি। তোলি < তোলয়িত্বা। ডাহ কএলা = দাহ করিল। সগুণ শিআলী = শকুন, শৃগাল (বিষয় বাসনা সমূহ ?)। মারিল < মারিত + ইল্ল। ভবমত্তারে = ভবমত্তকে। ২যা চতুর্থীতে রে বিভক্তি লক্ষণীয়। দহদিহে < দশদিশে। দিধলি = দেওয়া হইল (?)। পুথি খণ্ডিত থাকায় শেষ অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ হইতে দত্ত বা দিল অর্থ পাওয়া যায়। বলী = বলি। নিরেবণ < নির্বাণ = নিশ্চল, নির্মল। ফিটিলি = বিদীর্ণ হইল, শেষ হইল। ষবরালী = শবর গিরি, < *শবর কাবিক।

ব্যাখ্যা সংকেত: শবর-শবরীর মিলিত জীবনযাত্রার একটি নিখুঁত চিত্রের মধ্য দিয়া তত্ত্ববর্ণনা লক্ষণীয়। তৎকালীন অন্ত্যজ জীবনের চিত্র হিসাবেও গীতিটি মূল্যবান। তত্ত্বের দিকে গীতিটির মধ্যে চিত্তের চতুর্থ শূন্যে উপস্থিতিতে মহাসুখলাভের কথা রূপকাকারে ব্যক্ত হইয়াছে।

চিত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রে চিত্তের চারিটি স্তর কল্পিত হইয়াছে,—শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি দিবারাত্রি ভেদে ১৬০ প্রকার প্রকৃতি-দোষযুক্ত। চতুর্থ শূন্য প্রকৃতি-প্রভাস্বর। প্রকৃতি-দোষযুক্ত প্রথম তিনটি স্তর আলোচ্য চর্যায় বাড়ীর রূপকে প্রকাশিত। গগন শব্দটির দুবার ব্যবহারে প্রথম দুটি শূন্যকে বোঝান হইতেছে; তারপর তৃতীয়ে সংলগ্ন বাটিকা। ইহাকেও উৎপাটিত করার কথা বলা হইয়াছে প্রকৃতি-প্রভাস্বর চতুর্থ শূন্যরূপ কুঠারের আঘাতে। এইরূপ করিতে পারিলেই কণ্ঠে অর্থাৎ সম্ভোগচক্রে নৈরাত্মা বালিকা জাগ্রত হন। সিদ্ধাচার্য শবরপাদ তাই উপদেশ দিতেছেন, বিষয় দ্বন্দ্বময় মায়ামোহ পরিত্যাগ করা উচিত। এই মায়ামোহই সাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ। এগুলি ত্যাগ করিতে পারায় শবর শূন্যতারূপী নারীকে লইয়া মহাসুখে বিলাস করিতেছেন। এই বিলাসের চিত্র রচনায় চর্যাকার বলিতেছেন: আমার তৃতীয়

বাটিকা গগনের সমতুল হইয়াছে, সেখানে সুন্দর কাপাস ফুল ফুটিয়াছে (অর্থাৎ তৃতীয় শূন্য চতুর্থ শূন্যে পরিণত হইয়াছে এবং কার্পাসের মত সুন্দর শুভ্র প্রভাস্বরতার বিকাশ ঘটিয়াছে।) তৃতীয় শূন্য চতুর্থ শূন্যেই সংলগ্ন, চতুর্থ শূন্য শুভ্র জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত গগনের মত, এই জ্যোৎস্নার উদয়ে সমস্ত ক্লেশান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। ক্লেশান্ধকার যেন আকাশকুসুমের মত অলীক বলিয়া এখন প্রতিভাত হইতেছে। (অথবা জ্যোৎস্নার উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত, চিদাকাশ কুসুমের ন্যায় প্রফুল্ল।) কঙ্গুচিনা (ধান্য বিশেষ) পাকিল, শবর-শবরী আনন্দে মত্ত হইল। তাত্ত্বিক অর্থে শবরী অর্থাৎ নৈরাত্মার সহিত মিলনে মহাসুখ লাভ হইল। (কঙ্গুচিনা = মহাসুখ)। দিনের পর দিন শবরের আর কোন চেতনা রহিল না। চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধন করিয়া শবর চতুর্থ বাসস্থান গঠন করিল। সেখানে তুলিয়া ভবমত্ততাকে দাহ করিল। (পরবর্তী পংক্তির দাহ শব্দের ব্যঞ্জনায় চারিবাস শব্দের অর্থ দাহ করিবার চালি বা খাটিয়া বলিয়া মনে হয়, টীকায় অবশ্য তাত্ত্বিক অর্থই প্রদত্ত হইয়াছে। চর্যাটির মধ্যে শবদাহ প্রথার চিত্রও লক্ষণীয়।) শকুন-শৃগালরূপ বিষয়-বাসনাসমূহ ক্রন্দন করিল। ভবমত্ত সংবৃতি বোধিচিত্তকে দশদিকে বলি দেওয়া হইল (ধ্বংস করা হইল), ফলে শবরের শবরালি (স্বভাব চাঞ্চল্য, ভবমোহ ইত্যাদি) ঘুচিয়া গেল। তিনি দ্বৈতজ্ঞানবিলুপ্ত নিশ্চল নির্বেদ অবস্থায় উপনীত হইলেন।

পরিশিষ্ট—১

কবিনামাবলী : প্রথম চরণের সূচী

১। আজদেব (আর্য্যদেবপাদ)

গীতিসংখ্যা ৩১ : জহি মণ ইন্দিঅ [প] বণ হো ণঠা।

২। কঙ্কণ (কৌঙ্কণপাদ)

গীতিসংখ্যা ৪৪ : সুনে সুন মিলিত্তা জবেঁ।

৩। কামলি (কম্বলাম্বরপাদ)

গীতিসংখ্যা ৮ : সোনে ভরিতী করুণা নাবী।

৪। কাহ্ন (কাহ্নপাদ, কৃষ্ণাচার্য্যপাদ, কৃষ্ণপাদ, কৃষ্ণবজ্রপাদ)

গীতিসংখ্যা ৭ : অলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।

,, ৯ : এবংকার দৃঢ় বাখোড মোড্ডিউ।

,, ১০ : নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।

,, ১১ : নাড়ি শক্তি দিঢ ধরিঅ খট্টে।

,, ১২ : করুণা পিহাড়ি খেলহুঁ নযবল।

,, ১৩ : তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী।

,, ১৮ : তিণিভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।

,, ১৯ : ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।

,, ২৪ : *

,, ৩৬ : সুন বাহ তথতা পহারী।

,, ৪০ : জো মণগোএর আলাজালা।

,, ৪২ : মণতরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।

,, ৪৮ : *

৫। কুক্কুরীপাদ

গীতিসংখ্যা ২ : দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।

,, ২০ : হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে।

৬। গুণ্ডরীপাদ

গীতিসংখ্যা : তিঅড্ডা চাপী জোইণি দে অঙ্কবালী।

৭। চাটিল (চাটিল্লপাদ)

গীতিসংখ্যা ৫ : ভবণই গহণগম্ভীর বেগেঁ বাহী।

৮। জয়নন্দীপাদ

গীতিসংখ্যা ৪৬ : পেখু সুঅণে অদশ জইসা।

৯। ডোম্বীপাদ
গীতিসংখ্যা ১৪ : গঙ্গা জউণা মাঝেঁ রে বহই নাই।

১০। ঢেণ্টণপাদ (ঢেণ্ঢণপাদ ?)
গীতিসংখ্যা ৩৩ : টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।

১১। তান্তি (তন্ত্রীপাদ)
গীতিসংখ্যা ২৫ : *

১২। তাড়কপাদ
গীতিসংখ্যা ৩৭ : অপণে নাহিঁ মো কাহেবি সঙ্কা।

১৩। দারিকপাদ
গীতিসংখ্যা ৩৪ : সুন করুণরি অভিনবারেঁ কাঅবাকচিঅ।

১৪। ধামপাদ
গীতিসংখ্যা ৪৭ : কমল কুলিশ মাঝে ভইঅ মিঅলী।

১৫। বিরুঅ (বিরুবাপাদ)
গীতিসংখ্যা ৩ : এক সে শুণ্ডিনী [নি] দুই ঘরে সান্ধঅ।

১৬। বীণাপাদ
গীতিসংখ্যা ১৭ : সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।

১৭। ভাদেপাদ (ভাবে)
গীতিসংখ্যা ৩৫ : এতকাল হাউ অচ্ছিলেসু মোহেঁ।

১৮। ভুসুকুপাদ
গীতিসংখ্যা ৬ : কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
,, ২১ : নিসিঅ অন্ধারী মুসার চারা।
,, ২৩ : জই তুম্হে ভুসুকু অহেহি জাইবেঁ
মারিহসি পঞ্চজণা।*
,, ২৭ : অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
,, ৩০ : করুণ মেহ নিরন্তর ফরিঅ।
,, ৪১ : আইএ অণুঅনা এ বাগ রে ভাংতিএঁ
সো পড়িহাই।
,, ৪৩ : সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ।
,, ৪৯ : বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালে বাহিউ।

১৯। মহিআ (মহীধরপাদ)
গীতিসংখ্যা ১৬ : তিনিএঁ পাটে লাগেলি রে অণহ
কসণ ঘণ গাজই।

২০। লুইপাদ

গীতিসংখ্যা ১ : কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

,, ২৯ : ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।

২১। শবরপাদ

গীতিসংখ্যা ২৮ : উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।

,, ৫০ : গঅণত গঅণত তইলা বাড়হী হেঞ্চে কুরাড়ী।

২২। শান্তিপাদ

গীতিসংখ্যা ১৫ : সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেতেঁ

অলকখ লকখণ ন জাই।

,, ২৬ : তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।

২৩। সরহপাদ

গীতিসংখ্যা ২২ : অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।

,, ৩২ : নাদ ন বিন্দু রবি ন সসিমণ্ডল।

,, ৩৮ : কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।

,, ৩৯ : সুইনা হথ বিদারস রে। ণিঅমণ তোহোরেঁ দোসেঁ।

* পুথি খণ্ডিত বলিয়া কাহ্নপদের ২৪ ও ৪৮ সংখ্যক গীতি এবং তান্তিপাদের ২৫ সংখ্যক গীতির মূলরূপ পাওয়া যায় নাই। তাই প্রথম চরণ দেওয়া গেল না। ২৩ সংখ্যক গীতির শেষ দিক খণ্ডিত।

শব্দসূচী

[মূল গীতিতে উল্লিখিত, পদকর্তাদের নাম বাদে, অন্যান্য শব্দাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী। শব্দের পার্শ্বের বন্ধনীভুক্ত শব্দ সম্ভাব্য পাঠ/পাঠান্তর। পরবর্তী সংখ্যাদুটি যথাক্রমে গীতি ও পংক্তি নির্দেশক।]

অ

আ

ই

ইঅণা (গঅণা) ৩৯/৯, ইন্দি ৪৫/১, ৪৯/৫, ইন্দিঅ ৩১/১ ইন্দিআল ৩০/৫, ইন্দিবিসআ ৪৯/৫, ইন্দিজানী ৩৪/৭, ইষ্টা (টষ্টা) মালা ৪০/২ ।

ঈ

ঈচ্ছন্দ্রেঁ (স্বচ্ছন্দেঁ) ৩৯/১০ ।

উ

উআস ৭/৪, উআরি ১২/৪ উআবেঁ ৩২/৭, উইআ ৪৪/২, উইঅঅ ৪৫/৪, উইত্তা ৩০/৩. উএথী ১৬/৭, উএসই ৪০/৫, উএসঁ ১২/৪, উচ্ছলিআঁ ১৯/৩, উছারা ১৪/৩, উজ্জা অ ৩৮/৯, উজুবাট ১৫/৩, ১৫/৮, ৩২/১০, উজোলি ৩০/৮, উজ্জ ৩২/৩, উজ্জু ৩২/৩, উঞ্চলপাঞ্চল ২১/৯, উঞ্চা ২৮/১, উঠি—২১/৮, ৪৭/১০, উদকচান্দ ২৯/৮, উপাডী ৮/৫, ৫০/২, উপাযেঁ ৩৮/৪, উবেসেঁ ৮/৩, উভিল ৪/১০, উমত ২৮/৩, ২৮/১৩, উম্মত্তো ১৯/১০, উলাস ৩০/৬, উলোলেঁ ৩৮/৮, উহ ১৫/৭, ২১/৭, ২৯/৪, ২৯/১০, উহ্লসিউ ২৭/২ ।

এ

এ ৬/৮, ২০/৯, ২৮/৬. ৩০/৯, ৩৩/৬, ৩৯/৬, ৪১/১, ৪৩/১, এক ৩/১, ৩/৯, ১০/৫, একাকারেঁ ১১/৪, একু ২/১০, ১৫/৪, ৩৪/৭, একুমণা ২৩/২, একে ২৮/১২, একেলী ২৮/৬, একেলেঁ ৩৯/১০, এড়িএউ ১/৭, এত ১০/৯, এতকাল ৩৫/১, এথু ১৬/১০, ২০/৪, ২০/১০, ২২/৭, ২৭/৮. এবংকার ৯/১, এবেঁ ৩৫/২, ৩৫/৩, এষা ১১/৮, এষু ৩৭/৯, এস্থু ৪২/৯, এহ ৪৩/৭, এহু ২৬/৯ ।

ও

ওডিআণে ৬/৪ ।

ক

কইসণ ২২/৪, কইসণি ১৮/৩, কইসে ২৯/৬, ৪২/৩, কইসেঁ ৮/৪, ২৮/ ৪, ৪০/৩, কএলা ৩৫/১০, ৫০/১২, কংথা ২২/৮, ৩৭/২, কঙ্গুরিনা ৫০/৯, কট ৪১/৯, ৪৩/৭, কণ্ঠ ১৮/৮, কণ্ঠে ২৮/১০, ৫০/২, কণ্ডহার ১৩/৯, কণ্টারা ১৫/৪, কদিনি ২৩/৬, কপালী ১০/১১, কপাস্থ ৫০/৬, কবড়ী ১৪/৯, কবালী ১১/১০, কমল ৪/২, ৪/৪, ২৭/১, ২৭/৬, ৪০/১, কমলিনি ২৭/৬, কর ৩৮/৩, ৪১/৩, করঅ ২১/২, করই ৪১/৭, করউ ২২/৮, করণক ১/৭, করণ্ড ১৯/২, করহকলে ১৭/৭, করহা ১৭/৭, করহুঁ ৪/২, করি ৩/৩, ৩/১০, ১৩/৩, ৩৬/৬, ৩৮/৩, করিঅ ১৩, করিঅই ১/৫, করিআ ১২/৮, ৩৪/৭, করিণা ৯/৫, করিণরে ৯/৫, করিব ৭/১, ৩৬/৯, করিবে ১০/৩, করিহ ২ /১০, করুণ ৩০/১, করুণরি ৩৪/১, করুণা ৮/১, ১২/১, ১৩/২, ৩১/৩, করেই ১৪/২, ১৪/৯, কর্ণ ২৮/৬, কলএল ৪৪/৯, কলা (কাল) ২১/৭, কলিআঁ ২১/৬, কলে ১৭/৭, ক(স)ইসা (কইসা) ৪০/৯, কসণ

গুম্ফা ১৫/১০, গুরু ১/৪, ৩৯/২, ৪০/৫, ৪০/৮, ৪৫/৩, ৪৫/৬, গুরুবাক ২৮/১১, গুঞ্জী ২৮/৩, গুহাডা ২৮/৩, গেল ২/৫, ৪৭/১০, গেলা ৭/৭, ১৫/২, ৩৬/৫, গেলি ৩৭/২, গেলী ৮/৪, গো ২০/৩, গোঅর ৭/৪, ৪০/১, গোহালী ৩৯/৯।

ঘ

ঘড়িযে ২/৭, ঘড়ুলী ২/৯, ঘণ ১৬/১, ঘণ্টা ১১/৫, ঘর ৩২/১, ঘরপং ২/৩, ঘরিণী ২৮/০, ৪৯/৪, ঘরে ৩/১, ১১/৯, ৮৭/৩, ঘরেঁ ৪/৭, ঘলিলি ১০/১২, ঘাট ১৫/১০, ঘাণ্টে ২/২, ঘাবেঁ ৩৯/৮, ঘালি ৪/৭, ঘিণ ৩১/৭, ঘিণি ৬/১, ঘুণ্ড ৩৯/২, ঘুমই ২৬/৩, ঘোরিঅ ৩৬/৮, ঘোলই ১৬/৪, ঘোলিউ ১২।৬।

চ

চউকোড়ি ৪৯/৯, চউখণ ৪৪/৩, চউদিস ৮/৭, চউশঠী ২/৭, চউষট্‌ঠি ১২/১০, চকা ১৮/৭, চঙ্গত্রা ১০/৯, চঞ্চল ১/২, ২১/৬, চঞ্চালী ৫০/১১, চটাবিউ ২৬/৬, চড়ি ১০/৬, চড়িলা ১৪/১০, চড়িলে ৫/৭, চণ্ডালী ৪৭/২, ৪৯/৪, চন্ঢ়িলে ৮/৭, চন্দসুজ্জ ১৪/৭, চমকিই ৪১/২, চমণ ১/১০, চরঅ ২১/৮, চরণে ১১/৫, চগা ২/৯, চলিআ ১৯/৪, চলিল ১৫/১০, চাটিল ৫/৩, চান্দ ২৯/৮, চান্দকান্তি ৩১/৫, চান্দরে ৩১/ , চান্দসুজ্জ ৪/৮, চান্দে ৩০/৮, চাপিউ (পিচিউ) ১৭/৭, চাপী ৪/১, ৮/৯, চাব ২১/১১, চাবা ২১/১, চাবিবাসে ৫০/১১, চাল ৫/১০, চালিঅ ২৭/৫, চালিউঅ ২৭/৩, চাহঅ ৮/৭, ৩৬/১০, চাহন্তে ৩১/৮, ৪৪/৬, চাহি ২০/৩, চিঅ ১৩/৯, ৩১/৬, ৩৪/১, ৩৫/৬, ৩৯/৭, ৪০/৭, ৪২/১, ৪৬/৯, ৪৯/৬, চিঅরাঅ ২২/২, ৩৫/৩, ২৫/১০, চিথিল ৫/২, চিত্তা ১৬/৬, ৩৪/৩, চিহ্ন ৬/৫, ২৯/৫, চীঅ ১৬/৩, ৩৮/৩, চীঅণ ৩/২, চীএ ১/২, চীরা ৪/১ , চুম্বী ৪/৪, চুরিল ৪৪/১০, চেঅণ ৩৬/৫, চেবই ৩৪/৮, ৩৬/৩, ৫০/১০, চোরে ২/৬, চৌকড়্‌হি ৩৭/৪, চৌদীস ৬/২, চোব ৩৩/৮, চৌরি ২/৪, চৌসঠ্‌ঠী ১০/৫, চ্ছন্তেঁ ৪২/৮, চ্ছাড়ি ৩২/৩, চ্ছাড়ী ৬/৮, ১৫/৯, চ্ছিজই ৪৬/৫, চ্ছিণালী ১৮/১০ চ্ছুপই ৬/৫।

ছ

ছই ১০/২, ছডগই ৯/৭, ছন্দা ১৪/৮, ছাঅ ৪৬/৭, ছাইলী ২৮/৭, ছাড ৫০/৩, ছাড়অ ৬/৪, ১৯/১০, ছাড়ি ১০/১০, ছাড়িঅ ৩১/৭, ছাড়ু ৫০/৩, ছান্দক ১/৭, ছার ১১/৭, ছিজঅ ৪৫/৩, ছুধ ৯/৮, ছেব ৪৫/৭, ছেবই ৪৫/৬, ছেবহ ৪৫/১০, ছোই ১০/২।

জ

জ ২৬/৯, জঅ ১৯/৩, জই ৫/৯, ২৩/১, ৪১/৪, ৪১/১০, ৪২/৬, ৪৬/৩, জইষ ৪১/৬, জইসনে ৩৭/৫, জইসা ২২/৫, ৪০/১০, ৪১/৫, ৪৬/১, জইসো ১৩/৭, ১৩/৮, ২২/৫, ৩৭/৪, জইসোঁ ১৩/৭, জউণা ১৪/১, জউতুকে ১৯/৬, জগ ৩৯/৬, ৩৯/১০, ৪১/১, ৪১/৪, জণ ১৮/৪, জথাঁ ৪৪/৭, জল ৩৯/৬, জলিঅ ৪৭/২, জলে ৪৩/৪,

ঝ

ট

ঠ

ড

ণ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

১১/৭, লাউ ১৭/১, লাগ ১০/৪, লাগি ১৬/৬, লাগেলি ১৬/১, ১৭/১, ২৮/৫, ৪৭/৩, লাঙ্ক ৩২/৪, লাঙ্গা ৩৬/৪, লাহু ১/৮, লীড়ে ১৮/২, লীলে ১৪/২, লীলেঁ ২৭/১০, ৩৪/৬, লুড়িউ ৪৯/২, লেই ১৪/৭, লেপ ৪/৫, লেমি ১০/১২, লেলী ৪৯/৪, লেহু ৩২/৩, লেহুঁ ১২/১০, লেহু ৪৭/৯, লো ১০/১১, ১৪/৩, ১৮/৪, লোঅ ৫/৪, ৫/৯, ১৮/৮, ২২/২, ৪২/৭, লোআচারা ৩১/৭, লোউ ৩২/৫, লোড়িব ২৮/১৪, লোন্হা ৪১/৩।

শ

শক্তি ১১/১, শবরা ৫০/৯, শবরি ৫০/৯, শবরো ২৮/৩, ৫০/৪, ৫০/১২, ৫০/১৪, শশী ১১/৬, শাখি ৩৬/৯, শাসন ৪৭/৮, শিআলি ৫০/১২, শিথর ৪৭/৬, শুণ্ডিনীণি (শুণ্ডিনী) ৩/১, শূণ ৪২/১, শূন ১৩/২, ৩৫/৫।

ষ

ষঅ ৩৮/৮, ষম ৩৩/৯, ষবরালী ৫০/১৪, ষষহর ২৭/৩, ২৭/৫, ষহজে ২৭/৪, ষাৱে (ষাচে) ৪১/২, ষামায় ৩৩/৪, ষারা ৩০/৯, ষিআলা ৩৩/৯, ষিকই ৪৭/৪, ষিহে ৩৩/৯, ষুকড় ৫০/৬, ষে ২৬/৩, ৫০/৫, ষো ৩৩/৮, ষোহিঅ ৪৬/৯।

স

স ২৬/৪, সঅ ১৫/১, ১৬/২, সঅল ১/৫, ৯/৭, ১৮/৫, ৩১/৯, ৩৬/৬, ৪৪/২, ৪৪/৮, সঅলা ৩৬/২, ৪১/৯, ৪৩/৭, সঅলাহুত্তর ৩৪/৮, সএল ১৬/২, ১৬/৭, ১৭/৮, সএঁ ২৬/১০, সগাঅ (সমাঅ) ৪/৬, সগুণ ৫০/১২, সঙ্কা ২২/৭, ৩৭/১, সঙ্গা ৮/১০, সজে ১৯/৯, সচরাচর ২২/৯, সড়ি ৪৫/৮, সৎগুরু ১৪/৪, সদ্‌গুরু ৮/৬, ১২/২, ২১/১০, ২৩/৬, ৩৫/২, ৩৮/২, ৪১/১০, সদ্‌ভাবে ১০/৭, সন্তারে ৩৭/৭, সন্ধি ২৮/১৪, সপরবিভাগা ৩৬/৩, সবরী ২৮/১, ২৮/২, ২৮/৬, সবরো ২৮/৩, ২৮/৭, ২৮/৮, ২৮/১৩, ২৮/১৪, ৫০/১০, সববই ৩৫/৫, সভাবে ৪৩/২, সম ১০/৩, সমতা ৪৭/২, সমতুলা ৫০/৫, সমরস ১৭/৫, সমরসে ৪৩/৪, সমাঅ ৪৩/৪, সমাইউ ২/১০, সমাণা ৪৬/৭, সমায় ৪০/৪, সমাহিঅ ১/৫, সমুদারে ১৫/৫, সমুদে ৩৫/৪, সম্বেঅণ ১৫/১, সরবর ১০/১৩, সরুঅ ১৫/১, সরুআ ৩০/৪, সরুই ৩/৯, সর্ব্ব ৪৪/১০, সসর ৪১/৮, সসহর ১৮/৬, সসি ১৭/১, ৩২/১, সহজ ৯/৪, ১৯/১০, ২৮/৪, ৩০/৪, ৩৬/৪, ৩৭/৩, ৩৭/৬, ৪০/৩, ৪৩/১, সহজানন্দ ২৭/১০, সহজে ৩/৩, ৪২/১, সহজেঁ ৩৮/৬, ৩৯/৬, সহবলি ৪৭/৪, সহাব ৪১/৯, ৪৩/৭, সহাবে ৯/৭, ৩২/২, সহাবেঁ ৪১/৪, সহি ১৭/৩, সংকেলিউ ১৫/৯, সংঘারা ২০/৮, সংতাপে ১৬/৯, সংপুন্না ৪০/১, সংবেঅণ ২৬/১০, সংবোহিঅ ৪০/১০, সংবোহী ৪৪/৩, সংবোহেঁ ২৯/২, সংসার ৩৩/৩, সংসারা ১৫/৩, সংহার ১৪/৭, সাঅর ৪২/৬, সাঙ্কম ৫/৩, সাঙ্কমত ৫/৭, সাজ ১০/৩, সাজে ১০/১০, ৩২/৮, সাচ ২৯/৮, সাণে ১/৯, সাধু

হ

নির্দেশিকা

[কেবল আলোচনা অংশের বিশিষ্ট শব্দাবলী। * চিহ্নিত পৃষ্ঠাঙ্ক পাদটীকা নির্দেশক।]